ন্যায়তত্ত্ব

পরিক্রমা

ন্যায়তত্ত্ব পরিক্রমা

ঈশ্বর ও জগৎ

কালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্যাপিরাস
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন
কলিকাতা-৭০০০০৪

প্রচ্ছদ : শমীন্দ্র ভৌমিক

প্যাপিরাস-এর পক্ষে অরিজিৎ কুমার -প্রকাশিত।
ডি. বি. প্রিন্টার্স-এর পক্ষে রাধাবল্লভ মণ্ডল -মুদ্রিত
এবং সরস্বতী বাইণ্ডিং ওয়ার্কস-এর পক্ষে
দিলীপ সিংহ -গ্রন্থিত।

ভূমিকা

যে বাড়ীতে ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনা হয় তাহার ত্রিসীমানায় নাকি কাকচিলরাও ঘেঁসিতে সাহস করে না—এইরূপ একটি বিশ্বাস অনেকেরই আছে। অনেকেই ভাবেন ন্যায়শাস্ত্র শুধু দুরূহই নহে নীরসও বটে। অনেকের এই বিশ্বাসকে হঠাৎ অমূলক বলা যায় না, যদিও আমার বিশ্বাস যে এই বিশ্বাস অমূলক। ন্যায়শাস্ত্রকে দুরূহ বলিব কিনা তাহা আমি জানি না। কিন্তু ইহা যে নীরস নহে তাহা আমি বলিবই। শুধু তাহাই নহে, আমার বিশ্বাস ন্যায়দর্শন রসে ভরপুর। ন্যায়াচার্যগণের মূল গ্রন্থগুলি পাঠ করিতে বসিলে সহজেই অনুভব করা যায় যে তাঁহারা শুষ্ক পাণ্ডিত্যের অধিকারীমাত্র ছিলেন না। তাঁহারা রসিক ছিলেন। তাঁহারা শুধু দার্শনিকই ছিলেন না, তাঁহারা কবিও ছিলেন। তাঁহাদের কবি-মানস তাঁহাদের শব্দচয়নে, বাক্যগঠনে, উপমা-নির্বাচনে, এক কথায় তাঁহাদের রচনার সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। ন্যায়দর্শন নীরস নহে, রসে ভরপুর—যদিও এই রস আস্বাদন করিতে হইবে মননের সাহায্যে, রসনার সাহায্যে নয়। এই বিশ্বাসেই—আর এই বিশ্বাসকে প্রমাণ করিবার জন্যও বটে—আমি এই গ্রন্থ লিখিয়াছি। নবদ্বীপে মহামহোপাধ্যায় চণ্ডীচরণ তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট ন্যায়দর্শনের কিছু কিছু কথা শুনি। তাহার পর পণ্ডিত শ্রীবামদেব তর্কবেদান্ততীর্থ মহাশয়ের নিকট ব্যাপ্তিপঞ্চক মাথুরী, সিদ্ধান্তলক্ষণ জাগদীশী প্রভৃতি কয়েকটি গ্রন্থ অধ্যয়ন করি। পরে পণ্ডিত শ্রীঅনন্তকুমার ন্যায়-তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট কিছু গ্রন্থপাঠ ও বিস্তর আলোচনা করি। তাহার পর আমি ন্যায় পড়িতেছি, না ন্যায় আমায় পড়াইতেছে তাহা নির্ণয় করিবার জন্য কিছু-দিন পড়াশুনা ছাড়িয়া দিই। এবং টের পাই যে ন্যায়ের আকর্ষণ দুর্নিবার। আর ন্যায় পড়িব না বলিলেই ন্যায় পড়া বন্ধ হয় না। আবার পড়িতে বসিতে--এমন কি লিখিতেও বসিতে হয়। তাই লিখিয়া চলিয়াছি। প্রথম খণ্ড মুদ্রিত হইল। দ্বিতীয় খণ্ডও প্রায় সমাপ্তির পথে। আশা আছে তিন খণ্ডে শেষ করিব—তাহার পর অদ্বৈত তত্ত্ব ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনের তত্ত্বগুলির আলোচনা করিব। তবে এই আশা কতদূর ফলবতী হইবে, এমন-কি কি আকারে ফলবতী হইবে তাহা জানি না।

এই গ্রন্থরচনার কার্যে আমাকে যাঁহারা উৎসাহ দিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকেই আমি ধন্যবাদ দিই—বিশেষ করিয়া দিই অধ্যাপক শ্রীসাধনকুমার ভট্টাচার্য, অধ্যাপক

শ্রীননীলাল সেন, অধ্যাপক শ্রীপ্রাণকুমার সেন, অধ্যাপক শ্রীপতিতপাবন দাস এবং কবি শ্রীশিবদাস চক্রবর্তীকে। এই ভূমিকা আমি কেবল ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিবার জন্যই লিখিতেছি না—কৃতজ্ঞতা এবং ঋণ স্বীকারের জন্যও লিখিতেছি। উপরে যে আচার্যগণের নাম করিয়াছি, তাঁহাদের ঋণ শোধ করিবার মত নহে। পণ্ডিত শ্রীঅনন্তকুমার তর্কতীর্থ মহাশয় আবার তাঁহার আশীর্বাদের জন্য আমাকে নূতন করিয়া অপরিশোধ্য ঋণের বন্ধনে বাঁধিয়াছেন। এইরূপ অপরিশোধ্য ঋণের বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন শ্রীরাসবিহারী দাস মহাশয়ও—কেবল পরিচিতি লিখিয়া দিয়াছেন বলিয়া নহে, দর্শনে অনুরাগ জন্মাইয়া দিয়াছেন বলিয়া। আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ—তাহাও এই প্রসঙ্গে স্বীকার করিতেছি।

কলিকাতা
২০।৮।৫৬

লেখক

আশীর্বাদ

অধ্যাপক শ্রীমান্ কালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'ন্যায়তত্ত্ব পরিক্রমা' পাঠ করিয়া আনন্দিত হইলাম। গ্রন্থকারের প্রতিভা ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত বহু-পূর্বেই আমার পরিচয় হইয়াছিল এবং আশা করিয়াছিলাম যে, এই সকল প্রতিভা-বান্ যুবক অধ্যাপকই পুনরায় ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রকে তাহার যোগ্য আসনে প্রতি-স্থাপিত করিবে। গ্রন্থখানি আকারে বৃহৎ না হইলেও বিষয় বিবেচনায় ইহা গৌরবের অধিকারী হইয়াছে। সাধারণ শিক্ষিত বাঙ্গালীসমাজ যাহাতে জীব জগৎ ও ঈশ্বর প্রভৃতি তত্ত্বগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে সেইদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াই তদুপযোগী রীতি ও ভাষায় গ্রন্থখানি সুনিবদ্ধ হইয়াছে। ভাষাকে সরল করিতে গেলে প্রতিপাদ্য তত্ত্বকেও অবশ্যই কিছুটা সরল করিয়া লইতে হয়। এইরূপ করিতে গেলে তত্ত্বগত অংশবিশেষের পরিহার অনিবার্য হইয়া পড়ে। এই সরলতার কার্য্যে গ্রন্থকার বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন।

এই গ্রন্থে কার্যকারণভাব, অবয়বাবয়বিভাব, পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদ অতি-শয় সাফল্যের সহিত আলোচিত হইয়াছে। ঈশ্বরানুমানবিচারে আমরা গ্রন্থকারের জ্ঞানগাম্ভীর্যের সবিশেষ পরিচয় পাই। উক্ত বিষয়ে পশ্চিমদেশীয় দার্শনিক মতবাদের সহিত ন্যায়মতের যে তুলনামূলক বিচার করা হইয়াছে তাহা পণ্ডিতমাত্রেরই প্রীতিপ্রদ ও সমাদরযোগ্য হইয়াছে। ইহার দ্বারা দর্শনের ছাত্রগণ বিশেষভাবে উপকৃত হইবেন। এইরূপ একখানি গ্রন্থের অতিশয় প্রয়োজন ছিল। শ্রীমান্ কালী-কৃষ্ণবাবু সেই প্রয়োজন সাধন করিয়া বাঙ্গালীমাত্রেরই শ্রদ্ধাভাজন হইলেন। তিনি বাংলাভাষায় এইরূপ তত্ত্বসমৃদ্ধ আরও গ্রন্থ রচনা করিবেন বলিয়া আশায় রহিলাম। আমি সর্বান্তঃকরণে তাঁহার নিরাময় সুদীর্ঘ জীবন ও উত্তরোত্তর বিদ্যা-সম্পদের বিবৃদ্ধি কামনা করি। ইতি ১৬।৮।৫৬ খ্রী

আশীর্বাদক

শ্রীঅনন্তকুমার ভট্টাচার্য

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ

পরিচিতি

বর্তমানে আমাদের দেশে দর্শনের যে রকম অবস্থা তাহাতে মনে হয় শুধু দর্শন পড়িলে বা পড়াইলেই দার্শনিক বুদ্ধি বা মনোভাবের উন্মেষ হয় না—যাহাদের এরকম স্বাভাবিক বুদ্ধি আছে, তাহারাও দার্শনিক বিষয়ে যথেষ্ট অধ্যয়ন ও চিন্তনের দ্বারা অনেক সময়ে সে বুদ্ধির সদ্ব্যবহার করেন না। যাহারা দর্শন বিষয়ে কিছু পড়াশুনা করেন, তাঁহাদের অনেকেই আবার শুধু পাশ্চাত্ত্য দর্শনের সঙ্গেই সমধিক পরিচিত, ভারতীয় দর্শনে ব্যুৎপন্ন হইবার দুরূহ প্রয়াসে পরাঙ্মুখ। অথচ আমার মনে হয় দর্শনে আমাদের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে হইলে পাশ্চাত্ত্য দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় দর্শনের যথেষ্ট পঠন-পাঠন এদেশে হওয়া আবশ্যক।

আমি কলিকাতায় আসিয়া যে কয়জন মুষ্টিমেয় বুদ্ধিমান ও বিচারশীল, বিদ্যোৎসাহী ও অধ্যবসায়ী তরুণ অধ্যাপকের সহিত পরিচিত হইয়া এদেশে দর্শনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হইয়াছি, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাদের অন্যতম। ইনি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র ও অধ্যাপক। পাশ্চাত্ত্য দর্শনে তাঁহার যথেষ্ট জ্ঞান আছে এবং তিনি অনেক বৎসর ধরিয়া ন্যায় ও অন্যান্য ভারতীয় শাস্ত্রের অনেক দুরূহ গ্রন্থ অধ্যয়ন ও আলোচনা করিয়াছেন। ন্যায়তত্ত্ব পরিক্রমা—প্রথম 'খণ্ড' তাঁহার অধ্যয়ন ও ভাবনার প্রাথমিক ফল। এই পুস্তকে তিনি ঈশ্বর ও জগৎ সম্বন্ধে ন্যায়-দর্শনের অনেক জটিল কিন্তু মূল্যবান্ বিষয় যথাসম্ভব স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আনুষঙ্গিক আরও অনেক বিষয়ের বিচারও ইহাতে রহিয়াছে। মনোযোগপূর্বক পাঠ করিলে আমার বিশ্বাস, বুদ্ধিমান পাঠক ভারতীয় দর্শনের এমন কি পাশ্চাত্ত্য দর্শনেরও অনেক মূল্যবান কথা জানিতে ও বুঝিতে পারিবেন এবং দর্শন পদার্থটি কি তাহাও টের পাইতে পারিবেন। বাংলা ভাষায় দার্শনিক পুস্তকের বহু প্রচার নিতান্ত কাম্য। এই পুস্তক ও তাহার রচয়িতা বিদ্বৎসমাজে সমাদৃত হইলে আমি অতিশয় আনন্দলাভ করিব।

শ্রীরাসবিহারী দাস

উৎসর্গ

আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

ও

আচার্য গিরিশচন্দ্র বসুর

পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে

সূচীপত্র

ন্যায়তত্ত্ব পরিক্রমা

প্রথম খণ্ড। প্রথম অধ্যায়

ঈশ্বর ও জগৎ

খোকা মাকে শুধায় ডেকে,
"এলেম আমি কোথা থেকে,
কোন্‌খানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে।"

সকল খোকাই মাকে ডাকিয়া এইরূপ কঠিন প্রশ্ন করে কিনা জানি না। তবে অনেক খোকা যে করে তাহা ঠিক। এবং ইহাও ঠিক যে, কেবল খোকারাই এইরূপ প্রশ্ন করে না। মানুষ যখন জীবনের প্রান্তসীমায় আসিয়া পৌঁছায়, যখন তাহার শৈশবের স্মৃতি বিস্মৃতির মায়ালোকে আচ্ছন্ন হইতে থাকে, তখনও সে এই প্রশ্ন করে। অবশ্য, কখনও সে এই প্রশ্নের সকলসংশয়চ্ছেদি সদুত্তর পায় কি না তাহা জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে। এমন কি ইহাও জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, মানুষের এই প্রশ্ন করা উচিত কি না। কিন্তু এই বিষয়ে কোন সন্দেহেরই অবকাশ নাই যে, সকল মানুষই এই প্রশ্ন করে। আমি কোথা হইতে আসিলাম, তুমি কোথা হইতে আসিলে, এই বিশাল বিশ্ব কোথা হইতে আসিল, সংসার-মহীরুহের বীজ কি ইত্যাদি প্রশ্ন সকল দেশের, সকল কালের, সকল মানুষই করিয়া থাকে— না করিয়া পারে না। তাই, এই প্রশ্নকে আমরা মৌলিক প্রশ্ন বলিতে পারি। এবং যেহেতু সকলের সকল সন্দেহের নিরাস করিতে পারে, এমন কোন উত্তর এই প্রশ্নের পাওয়া যায় না, সেইহেতু আমরা এই প্রশ্নকে চিরপ্রশ্নও বলিতে পারি। এখন, অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, এইরূপ প্রশ্নই দর্শনের সামগ্রী, বা দার্শনিকগণ এইরূপ প্রশ্নেরই উত্তর লাভের চেষ্টা করিয়া থাকেন। অনেকের এই বিশ্বাস সত্য কি ভ্রান্ত তাহা লইয়া বর্তমানে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। এখানে কেবল এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, দর্শন সম্পর্কে অনেকেই এই বিশ্বাস পোষণ করেন, এবং অনেক উচ্চাঙ্গের দর্শনে এইরূপ প্রশ্নের

সংসার-মহীরুহের বীজ কি ?

এই প্রশ্নটি একটি মৌলিক এবং দার্শনিক প্রশ্ন।

উত্তর পাইবার চেষ্টা করা হয়। অবশ্য এই সকল উচ্চাঙ্গের দর্শনে এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে একরূপ কথা বলা হয় না। যেমন, সংসার-মহীরুহের বীজ নির্ণয় প্রসঙ্গে জড়বাদী দর্শনে যাহা বলা হয়, মায়াবাদী বা শূন্যবাদী দর্শনে তাহা বলা হয় না। আবার, ঈশ্বরবিশ্বাসী দর্শনে যাহা বলা হয়, তাহার সহিত জড়বাদী বা মায়াবাদী কাহারও কথাই মিলে না। শুধু তাহাই নহে— ঈশ্বরবিশ্বাসী দর্শনগুলিও একভাবে ঈশ্বর কল্পনা করে না, এবং সেইজন্য তাহারাও সকলে একরূপ কথা বলে না। এইসব দেখিয়া শুনিয়া কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, এই প্রশ্ন প্রকৃতই কোন প্রশ্ন নহে— অর্থাৎ যেরূপ প্রশ্নের সর্ববাদী-সম্মত উত্তর মিলে, বা যেরূপ প্রশ্নের উত্তরের মূল্য ব্যবহারের কষ্টি-পাথরে যাচাই করিয়া লওয়া যায়. সেইরূপ কোন প্রশ্ন নহে। কিন্তু একথা এখন থাক। আসল কথা হইল এই যে, সংসার-মহীরুহের বীজ প্রসঙ্গে নানা মুনির নানা মত, এবং এই নানাত্ব এমনই যে, এই সকল মতের যে কোন এক ব্যাপক মতের সাহায্যে সমন্বয় সাধন করিতে পারা যাইবে তাহা মনে হয় না। সত্য কথা বলিতে কি, এই প্রসঙ্গে যে দার্শনিক মতানৈক্য তাহা কেবল এই প্রসঙ্গ বা প্রশ্ন-ঘটিতই নহে। বিভিন্ন দর্শনে বিভিন্ন অনুভূতি-চক্রে আরোহণ করিয়া বা বিভিন্ন অনুভবকে অবলম্বন করিয়া দার্শনিক সমস্যার আলোচনা করা হয়। সেইজন্য যদিও অনেক সময় মনে হয় যে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দর্শনাচার্যগণ একই সমস্যার সমাধানকল্পে একই ভাষায় তর্কবিতর্ক করিতেছেন, তথাপি প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা তাহা করেন না। তাই যে কোনও মৌলিক প্রশ্ন সংক্রান্ত দার্শনিক মতভেদকে কোন এক নবীন ও ব্যাপক দর্শনের সাহায্যে চিরতরে দূর করিবার আশা, শূন্যে সৌধ-নির্মাণের আশার ন্যায়ই দুরাশা। এইজন্য আক্ষেপ করিয়া কোন লাভ নাই। দর্শনকে বিজ্ঞানের মতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার প্রয়াসেরও কোন প্রয়োজন নাই। প্রয়োজন হইল দর্শনের এই বৈশিষ্ট্যটিকে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দর্শনকে দর্শনের মত করিয়া আলোচনার। বিভিন্ন প্রকারের দর্শনের মধ্যে কোন্‌টি সত্য, আর কোন্‌টি মিথ্যা, কোন্‌টি গ্রাহ্য আর কোন্‌টি ত্যাজ্য, ইত্যাদি প্রশ্ন দর্শনের কোন সহৃদয় ছাত্রেরই করা উচিত নহে। তাঁহার কর্তব্য হইল, যে অনুভূতি-চক্রে আরোহণ করিয়া দর্শনাচার্যগণ কথাবার্তা বলিয়া থাকেন, সেই অনুভূতি-চক্রে প্রবেশ করা, বা ভিন্ন ভিন্ন দর্শনের কেন্দ্রস্থিত তথা আধারস্বরূপ অনুভবকে যথাসাধ্য নিজের করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা। এবং এইজন্য যদি তিনি সংসার-মহীরুহের বীজ প্রসঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন দর্শনে যে ভিন্ন ভিন্ন কথা বলা হয় তাহার

ভিন্ন ভিন্ন দর্শনে ইহার ভিন্ন ভিন্ন উত্তর দেওয়া হয়।

কিন্তু সেইজন্য আক্ষেপ করিবার বা দর্শনকে বিজ্ঞানের ছাঁচে গড়িবার কোনও প্রয়োজন নাই।

বিশ্লেষণ করেন, তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত অল্প আয়াসে সাফল্য লাভ করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয়। তাই ন্যায়দর্শনের তত্ত্বগুলির পরিক্রমণ উদ্দেশ্যে আমরা প্রথমেই এই দর্শনে সংসার-মহীরুহের বীজ প্রসঙ্গে যাহা বলা হয় তাহারই ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিব।

ন্যায়মতে সংসার-মহীরুহের বীজ ঈশ্বর। তিনিই জগতের স্রষ্টা বা নিমিত্ত কারণ। কথাটির একটু বিশদ বিশ্লেষণ প্রয়োজন। ন্যায়মতে কারণ তিন প্রকার—সমবায়ী, অসমবায়ী ও নিমিত্ত। যে কারণে সমবেত হইয়া কার্য উৎপন্ন হয়, বা উৎপন্ন হইয়া যে কারণে কার্য সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান থাকে, সেই কারণকে সেই কার্যের সমবায়ী কারণ বলে। যেমন পট বা কাপড়ের সমবায়ী কারণ তন্তু বা সুতা। এইরূপ ঘটের সমবায়ী কারণ 'কপাল' বা খাপ্‌রা। কথাটিকে আরও একটু খুলিয়া বলিতে হয়। গুণ-বিশিষ্ট, ক্রিয়া-বিশিষ্ট, ইত্যাদি পাঁচ প্রকার বিশিষ্ট বুদ্ধির উপপত্তির জন্য ন্যায়দর্শনে সমবায় নামক এক প্রকার পদার্থের কল্পনা করা হয়। যেমন শ্বেতপদ্ম। শ্বেত ও পদ্ম অত্যন্ত ভিন্ন। শ্বেত একটি বর্ণের বা গুণের নাম, পদ্ম একটি দ্রব্যের নাম। পদ্ম মাত্রই শ্বেত নয় এবং শ্বেতদ্রব্য মাত্রই পদ্ম নয়। শ্বেতবুদ্ধি এবং পদ্মবুদ্ধিও অত্যন্ত ভিন্ন। অন্ধকার ঘরে আমার পদ্মবুদ্ধি হইতে পারে, কিন্তু শ্বেতবুদ্ধি হয় না। এইরূপ, শ্বেতবুদ্ধি হইলেই যে পদ্মবুদ্ধি হইবে এমন কোনও কথা নাই। অতএব শ্বেত ও পদ্ম, গুণ ও গুণী, অত্যন্ত ভিন্ন। সুতরাং নৈয়ায়িক সমস্যা হইল এই যে, তাহা হইলে এক-বিশিষ্ট-অপর, বা শ্বেত-বিশিষ্ট-পদ্ম, বা শ্বেতপদ্ম-বুদ্ধি কেমন করিয়া হয়। এই সমস্যার সমাধানকল্পে ন্যায়াচার্যগণ যাহা বলিয়া থাকেন তাহার সারমর্ম এইরূপ: বিশিষ্ট বুদ্ধি কোনও না কোনও সম্বন্ধের জন্যই হইয়া থাকে। সম্বন্ধই বিশিষ্টধীর জনক। যেমন, দণ্ডীপুরুষ বা দণ্ড-বিশিষ্ট-পুরুষ। দণ্ড ও পুরুষ অত্যন্ত ভিন্ন। তথাপি আমাদের দণ্ডীপুরুষবুদ্ধি হয়। কারণ উহারা উভয়েই সংযোগ নামক সম্বন্ধে উভয়ের সম্বন্ধী। তাই, অর্থাৎ সংযোগ নামক সম্বন্ধের সাহায্যেই আমাদের দণ্ডীপুরুষবুদ্ধি হয়। অতএব গুণবিশিষ্ট ইত্যাদি বুদ্ধিও এইরূপ কোনও সম্বন্ধকে অবলম্বন করিয়াই হইয়া থাকে। কিন্তু এই সম্বন্ধ সংযোগাদি সম্বন্ধ হইতে পারে না। সুতরাং ইহা একটি নূতন সম্বন্ধ— দ্রব্য, গুণ প্রভৃতি পদার্থ হইতে একটি অতিরিক্ত পদার্থ। এই পদার্থান্তরের নাম সমবায়। সমবায় সম্বন্ধের বলেই আমাদের গুণ-বিশিষ্ট ইত্যাদি বুদ্ধি হয়। সংক্ষেপে, যে সম্বন্ধে গুণ প্রভৃতি গুণী

ন্যায়মতে কারণ তিন প্রকার—সমবায়ী, অসমবায়ী ও নিমিত্ত এবং ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ।

যে সম্বন্ধে গুণ প্রভৃতি গুণী প্রভৃতিতে বর্তমান থাকে সেই সম্বন্ধকে সমবায় সম্বন্ধ বলে।

প্রভৃতিতে আশ্রিত হয় সেই সম্বন্ধকে সমবায় সম্বন্ধ বলে ; এবং গুণ প্রভৃতি গুণী প্রভৃতিতে সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান থাকে বলিয়াই আমাদের গুণ-বিশিষ্ট ইত্যাদি পাঁচ প্রকার বিশিষ্ট বুদ্ধি হইয়া থাকে। এই পাঁচ প্রকারের মধ্যে এক প্রকার, অর্থাৎ গুণ-বিশিষ্ট-গুণী-বুদ্ধি লইয়া আমরা আলোচনা করিলাম। আমরা দেখিলাম যে গুণ, যেমন শ্বেতবর্ণ, সমবায় সম্বন্ধে দ্রব্যের, যেমন পদ্মের, আশ্রিত বলিয়াই আমাদের গুণ-বিশিষ্ট-গুণী যেমন শ্বেতপদ্ম-বুদ্ধি হয়। অবশিষ্ট চারি প্রকারের মধ্যে অবয়বী-বিশিষ্ট-অবয়ব-বুদ্ধিই বর্তমানে প্রাসঙ্গিক। তাই আমরা বর্তমানে তাহার কিছু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব।

কার্য দ্রব্য অবয়বী, এবং ইহার সমবায়ী কারণ অবয়ব।

ন্যায়মতে অবয়বী অবয়ব-অতিরিক্ত। কথাটির কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন, এবং সেইজন্য আমার পরিহিত কাপড়টিকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া আমরা প্রথমেই অবয়ব ও অবয়বী বলিতে কি বুঝা হয় তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিতে পারি। আমার এই কাপড়টি সূতা দিয়া তৈয়ারী। সূতাই ইহার অংশ। সূতা হইতে কখনও ইহাকে বিযুক্ত করা যায় না। এবং সূতার নাশ না হইয়া যদি ইহার নাশ হয় তাহা হইলে ইহা সূতাতেই বিলয়প্রাপ্ত হইবে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, সূতার সহিত কাপড়টির বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্তমান। এইরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকার হেতু কাপড়টি অবয়বী এবং সূতা তাহার অবয়ব। এইরূপ, যে টেবিলের উপর আমি লিখিতেছি, সেই টেবিলের চারিটি পায়া, দুইটি দেরাজ, এবং অন্যান্য অংশ আছে। ইহারা তাহার অবয়ব এবং টেবিলটি একটি অবয়বী। লিখিবার সময় আমি মধ্যে মধ্যে মুখ তুলিতেছি এবং উন্মুক্ত গবাক্ষপথে পার্কের বকুল গাছটি দেখিতে পাইতেছি। এই গাছটি অবয়বী, এবং তাহার শাখা, কাণ্ড, ফল, মূল, পুষ্প, পল্লব প্রভৃতি তাহার অবয়ব। এইরূপ, আমি বা তুমি বা গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ মহাশয় এক একটি অবয়বী এবং আমাদের হাত, পা, চোখ, নাক, কাণ প্রভৃতি আমাদের অবয়ব। সংক্ষেপে, কাপড় অবয়বী—সূতা অবয়ব, ঘট অবয়বী—'কপাল' অবয়ব, টেবিল অবয়বী— তাহার পায়া, দেরাজ ইত্যাদি অবয়ব, দেহ অবয়বী— হাত, পা ইত্যাদি অবয়ব।

অবয়ব ও অবয়বী বলিতে কি বুঝা হয়?

অবয়বী এবং অবয়ব বলিতে কি বুঝা হয় তাহা আমরা দেখিলাম। এখন অবয়বীকে অবয়ব-অতিরিক্ত বলিতে কি বুঝা হয় তাহা দেখা যাউক। অবয়বীকে অবয়ব-অতিরিক্ত বলিতে বুঝা হয় যে অবয়বীর একটি নিজস্ব সত্তা আছে। অবয়বগুলি স্বতন্ত্রভাবে বা সমগ্রভাবে অবয়বী নহে। অবয়বী এক, অবয়ব বহু ;

অবয়বী আশ্রিত, অবয়ব আশ্রয় ; অবয়বীর ব্যবহার একরূপ, অবয়বের ব্যবহার অন্যরূপ ; অবয়বী কার্য, অবয়ব কারণ। যেমন, যে সূতাগুলি দিয়া আমার কাপড়টি নির্মিত, সেই সূতাগুলি স্বতন্ত্রভাবে বা সমগ্রভাবে এই কাপড়টি নহে। সূতা অনেক, কিন্তু কাপড় এক ; সূতার সাহায্যে একপ্রকার প্রয়োজন নির্বাহ করা হয়, কাপড়ের সাহায্যে নির্বাহ করা হয় অন্যরূপ প্রয়োজন ; সূতা কারণ, কাপড় কার্য ; সূতা আশ্রয়, কাপড় আশ্রিত ; কাপড়টি সূতার কাপড়, সূতা-কাপড় নহে। গুণ ও গুণী যেরূপ অত্যন্ত ভিন্ন, সূতা ও কাপড়, অর্থাৎ অবয়ব ও অবয়বীও সেইরূপ অত্যন্ত ভিন্ন। ইহাই অবয়বীকে অবয়ব-অতিরিক্ত বলার অর্থ।

ন্যায়মতে অবয়বী অবয়ব-অতিরিক্ত।

অবয়বী অবয়ব-অতিরিক্ত, এই ন্যায়মতটি কিন্তু সর্ববাদিসিদ্ধ নহে। অনেকে, বিশেষ করিয়া বৌদ্ধ দর্শনাচার্যগণ, পৃথক অবয়বী স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে অবয়ব-পুঞ্জই অবয়বী। পৃথক অবয়বী, বা সংক্ষেপে অবয়বী বলিয়া কিছু নাই। তাঁহারা বলেন যে, অবয়ব-অতিরিক্ত অবয়বী মানিতে হইলে সকল অবয়বে যে এক অবয়বী বর্তমান রহিয়াছে, তাহা বলিতে হয়। কিন্তু তাহা বলিতে পারা যায় না। কারণ, একই আধারে বিরুদ্ধ ধর্ম আধেয় হইতে পারে না। যেমন, গোত্ব এবং অশ্বত্ব। ইহারা অত্যন্ত ভিন্ন। ইহাদের আধারও অত্যন্ত ভিন্ন। গোত্বের আশ্রয় গো এবং অশ্বত্বের আশ্রয় অশ্ব। এখন, যাহাকে অবয়বীতে বিশ্বাসী দার্শনিকগণ এক অবয়বী বলেন তাহা যে বিরুদ্ধ ধর্মের আধার হইতে পারে, বা হইয়া থাকে তাহা বুঝিবার জন্য তেমন কোন বিশেষ বিচারের প্রয়োজন হয় না। যেমন, কোনও বৃক্ষের শাখা যখন আন্দোলিত হইতে থাকে, তাহার কাণ্ডদেশ যে তখন অচল পর্বতসম দাঁড়াইয়া থাকে, ইহা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। সেইরূপ কোনও বৃক্ষের মূলদেশ আবৃত থাকিলেও, তাহার শাখাদেশ অনাবৃত থাকে, বা থাকিতে পারে। এইরূপ, ইহার এক অংশ রক্তবর্ণ হইলেও, অপর অংশের অরক্ত হইতে কোন বাধা নাই। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, তথাকথিত বৃক্ষ নামক অবয়বীতে সকম্পত্ব ও অকম্পত্ব, আবৃতত্ব ও অনাবৃতত্ব, রক্তত্ব ও অরক্তত্ব প্রভৃতি বিরুদ্ধ ধর্মের অধ্যাস হইতে পারে। সুতরাং গো এবং অশ্ব যেমন এক নহে, ঠিক তেমনই বৃক্ষটিও এক নহে। অবয়ব-অতিরিক্ত অবয়বী বলিয়া কিছুই নাই। যাহাকে অবয়বী বলা হয়, তাহা প্রকৃতপক্ষে অবয়বপুঞ্জ মাত্র।

বৌদ্ধগণ ইহা মানেন না। তাঁহাদের মতে অবয়বী অবয়ব-পুঞ্জমাত্র।

ন্যায়াচার্যগণ এই বৌদ্ধমত গ্রহণ করেন না। বিশেষ বিচারপূর্বক তাঁহারা ইহার

খণ্ডন করেন। কিন্তু অবয়বী-নিরাকরণ প্রসঙ্গে বৌদ্ধাচার্যগণ যে সূক্ষ্ম বিচার করিয়া থাকেন এবং তাহার উত্তরে ন্যায়াচার্যগণ যাহা বলেন তাহার ইঙ্গিতমাত্রই এখানে দেওয়া যাইতে পারে, —সম্যক্ আলোচনা করিতে চাহিলে একটি বিপুল কলেবর গ্রন্থ রচনা করিতে হয়। বৌদ্ধমতের কিঞ্চিৎ আভাস আমরা দিয়াছি। এখন আমরা ন্যায়াচার্যগণের মোট কথাটি কি তাহা দেখিবার চেষ্টা করিব। ন্যায়াচার্যগণের মতে অবয়ব-অতিরিক্ত অবয়বী না মানিলে 'সর্বাগ্রহণ প্রসঙ্গ' হয়, বা কোন কিছুই যে জানিতে পারা যায় না এইরূপ অসম্ভব কথা বলিতে হয়। কারণ, অবয়বী যদি অবয়ব-অতিরিক্ত না হয়, তাহা হইলে ইহা পরমাণুপুঞ্জই হইবে, এবং সেইজন্য ইহার, বা ইহার গুণকর্মাদির কোন লৌকিক প্রত্যক্ষ হইতে পারিবে না। ইহার প্রত্যক্ষ হইবে না—কারণ, পরমাণু অতীন্দ্রিয় এবং অতীন্দ্রিয় পদার্থের কোন লৌকিক প্রত্যক্ষ হয় না। ইহার গুণকর্মাদির কোন প্রত্যক্ষ হইবে না। কারণ, আশ্রয় দ্রব্যের প্রত্যক্ষ না হইলে আশ্রিত গুণ-কর্মাদির কোন প্রত্যক্ষ হয় না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, অবয়ব-অতিরিক্ত অবয়বী স্বীকার না করিলে ঘট, পট প্রভৃতি দ্রব্যের এবং তাহাদের গুণকর্ম প্রভৃতির কোন লৌকিক প্রত্যক্ষ জ্ঞান যে হইতে পারে, তাহা বলিতে পারা যায় না। কিন্তু আমাদের সকলেরই ঐরূপ জ্ঞান হয়, এবং সেই জন্যই অবয়ব-অতিরিক্ত অবয়বী স্বীকার না করিলে আমাদের নিস্তার নাই। অবয়বী স্বীকার না করিলে ঘট, পট প্রভৃতি দ্রব্যের প্রত্যক্ষ জ্ঞানেরই যে উপপত্তি হয় না তাহা নহে। তাহাদের যে কোনরূপ জ্ঞানই হইতে পারে না তাহাই বলিতে হয়। কারণ, অনুমানাদি প্রমাণের সাহায্যে আমরা যে জ্ঞান অর্জন করিয়া থাকি, তাহা প্রত্যক্ষমূলক। ঘট, পট প্রভৃতি পদার্থের যদি কোন প্রত্যক্ষ না হয়, তাহা হইলে কাহার লৌকিক প্রত্যক্ষ হইবে? এবং কোন কিছুই যদি লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয় না হয়, তাহা হইলে অনুমিতি প্রভৃতিরও কিছুই বিষয় হইতে পারে না। সংক্ষেপে অবয়ব-অতিরিক্ত অবয়বী স্বীকার না করিলে 'সর্বাগ্রহণ প্রসঙ্গ' হয়।

অবয়ব-অতিরিক্ত অবয়বী স্বীকার না করিলে কোন কিছুই যে জানিতে পারা যায় না তাহা বলিতে হয়।

অবয়বী-সাধন প্রসঙ্গে ইহাই ন্যায় দর্শনের মূল কথা। কথাটিকে আমরা দৃষ্টান্তের সাহায্যে বুঝিবার চেষ্টা করিতে পারি। এই উদ্দেশ্যে আমার পরিহিত কাপড় নামক অবয়বীটিকে গ্রহণ করা যাউক। এই কাপড় নামক অবয়বী যদি অবয়ব-অতিরিক্ত না হয় তাহা হইলে ইহা সূতার সমষ্টিমাত্র বা তন্তুপুঞ্জ মাত্রই হইবে। এখন, এই তন্তুপুঞ্জের কোনও তন্তুই নিরবয়ব

কাপড়টি যদি তন্তুপুঞ্জ মাত্রই হয়, তাহা হইলে ইহা পরমাণু-পুঞ্জই এবং ইহার কোন সহজ প্রত্যক্ষ হইতে পারে না।

নহে। তাহাদের প্রত্যেকেরই অবয়ব আছে। সুতরাং তন্তু নামক প্রথম স্তরের অবয়বগুলি তাহাদের নিজ নিজ অবয়ব বা দ্বিতীয় স্তরের অবয়বপুঞ্জই হইবে। সেই দ্বিতীয় স্তরের অবয়বগুলি আবার তৃতীয় স্তরের অবয়বপুঞ্জ হইবে। এইরূপে চলিতে চলিতে আমাদের নিরবয়ব অবয়ব বা পরমাণুতেই উপস্থিত হইতে হইবে। এবং যেহেতু কোনও স্তরেই অবয়বী নাই, বা কোথাও অবয়ব-অতিরিক্ত কোনও দ্রব্যের উৎপত্তি হয় না, সেই হেতু আমার কাপড়টি, বা তোমার কুম্ভটি বা এইরূপ যে-কোন দ্রব্য পরমাণুপুঞ্জ ব্যতীত আর কিছুই হইবে না। এখন পরমাণুরা অতীন্দ্রিয়। তাহাদের সহিত আমাদের কাহারও কোনও ইন্দ্রিয়ের লৌকিক সন্নিকর্ষ হয় না। তুমি কখনও কোন বহ্নিপরমাণু দেখ নাই, আমিও কখনও কোন জলপরমাণুর আস্বাদ গ্রহণ করি নাই। এইরূপ, তুমি বা আমি কখনও কোন ক্ষিতিপরমাণুর যে গন্ধ গ্রহণ করিব এরূপ আশা রাখি না। সংক্ষেপে, পরমাণুরা সহজতঃ প্রত্যক্ষের অবিষয়। তাহাদের কোনও প্রত্যক্ষ আমাদের কাহারও হয় না। তাই আমার কাপড়টি যদি পরমাণুপুঞ্জই হয়, তাহা হইলে আমি যে কাপড় পরিধান করিয়া রহিয়াছি তাহা তুমি বা কেহই দেখিতে পাইবে না। ইহার জন্য সামাজিক কোনও হৈ হৈ ব্যাপার ঘটিবার আশঙ্কা নাই। কারণ, যদিও আমার কাপড়টি নিজে দৃশ্য হয় বলিয়াই তোমার বা আমার লজ্জানিবারণ তথা সমাজের মুখরক্ষা করিতে পারে, তথাপি বর্তমান প্রসঙ্গে আমিও অদৃশ্য থাকিব এবং তুমি বা সমাজের অন্যান্য সভ্যগণও অদৃশ্য থাকিবে। সুতরাং আমি কাপড় পরিয়াছি কিনা তাহা কাহারও জানিবার সুযোগ হইবে না, বা আমাকে কেহ দেখিতে পাইতেছেন কিনা ইত্যাদি শরম-বিজড়িত চিন্তাও আমার থাকিবে না। অতএব সামাজিক কোন গোলযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু সামাজিক গোলযোগ না ঘটিলেও দার্শনিক গোলযোগ অবশ্যই ঘটিবে। কারণ, আমি যে কাপড় পরিধান করিয়াছি তাহা আমি দেখিতেছি, তুমিও দেখিতেছ, এবং আরও পাঁচজনে দেখিতেছে। অতএব কাপড়টি প্রত্যক্ষের অবিষয়, ইহাও পরমাণুর ন্যায় অতীন্দ্রিয় ইত্যাদি অসম্ভব কথা আমরা কি করিয়া বলিব? যাঁহারা অবয়বী স্বীকার করেন না, তাঁহারাও এইরূপ ভয়াবহ কথা বলিতে সাহস পান না। তাই তাঁহারা অবয়বী স্বীকার না করিলেও ঘটপটাদির ন্যায় দ্রব্যের সহজ প্রত্যক্ষ যে হইতে পারে, তাহা দেখাইবার চেষ্টা করেন। তাঁহারা বলেন যে, পরমাণু অতীন্দ্রিয় হইলেও পরমাণুপুঞ্জ অতীন্দ্রিয় নহে। যেমন, দূরস্থ একটি কেশ প্রত্যক্ষের অবিষয় হইলেও কেশপুঞ্জ প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে। দুর্বল দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন

বৌদ্ধমতে কেশপুঞ্জ দর্শনের ন্যায়, পরমাণুপুঞ্জের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।

ব্যক্তি ছোট হরফের ছাপা বই পড়িতে না পারিলেও বড় হরফে ছাপা বই পড়িতে পারে। এক কণা বালুকা আমার টেবিল ক্লথের উপর থাকিলে আমি তাহা নাও দেখিতে পারি, কিন্তু অনেক বালুকণা বা একটি ছোট-খাট বালুস্তূপ যদি সেখানে থাকে, তাহা হইলে দর্শনের ছাত্র হইলেও আমি তাহা না দেখিয়া পারি না। এইরূপ একটি বা দুইটি পরমাণু আমি দেখিতে পাই না। কিন্তু স্তূপীকৃত পরমাণু বা পরমাণুপুঞ্জ আমার প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে। অতএব পরমাণু অতীন্দ্রিয় হইলেও এবং অবয়ব-অতিরিক্ত অবয়বী না থাকিলেও ঘটপটাদির ন্যায় পদার্থের সর্বজনসিদ্ধ প্রত্যক্ষের অপলাপ করিতে হয় না। অবয়বীতে অবিশ্বাসী দার্শনিককে অদৃশ্য কাপড় পরিধানও করিতে হয় না, বা লজ্জা নিবারণের জন্য নিজেকে এবং সমাজের সকল সভ্যকে অদৃশ্য করিয়া দিতেও হয় না। সংক্ষেপে, বৌদ্ধ দর্শনাচার্যগণের মূল কথা হইল এই যে পরমাণু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ না হইলেও পরমাণুপুঞ্জের প্রত্যক্ষ হইতে পারে, এবং অবয়বী অস্বীকার করিলেও সর্বাগ্রহণ প্রসঙ্গ হয় না।

কিন্তু ইহা গ্রহণ করা যায় না। কারণ, একটি কেশের সহিত দূরস্থ বা নিকৃষ্ট চক্ষুর যেরূপ সম্বন্ধ একটি পরমাণুর সহিত কোন ইন্দ্রিয়ের সেরূপ সম্বন্ধ নহে।

ন্যায়াচার্যগণ বৌদ্ধগণের এই কথা মানেন না। তাঁহারা বলেন যে, হীনদৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির কেশপুঞ্জ দর্শনের ন্যায় পরমাণুপুঞ্জের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ের নিজ নিজ বিষয় আছে। তাহাতেই তাহাদের প্রবৃত্তি হইতে পারে।[১] অবিষয়ে তাহাদের কোন প্রবৃত্তিই সম্ভব নহে। পরমাণুমাত্রই প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ের অবিষয়। এইজন্য যেমন একটি পরমাণুর কোন প্রত্যক্ষ হয় না, পরমাণুপুঞ্জেরও ঠিক তেমনই কোন প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। অর্থাৎ আমাদের বহিরিন্দ্রিয় পাঁচটি। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক্। ইহাদের প্রত্যেকেরই নিজ নিজ বিষয় আছে এবং কেবল

১। সাম্প্রতিক স্নায়ুবিজ্ঞানে স্নায়ুর বিশেষ উত্তেজকতা নামে একটি নিয়মের কথা বলা হয়। এই নিয়মের কথা জার্মাণ স্নায়ুবিজ্ঞানী মুলারই প্রথমে বলেন। এই নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ই বিশেষ বিশেষ বিষয় গ্রহণ করিয়া থাকে। তবে স্বীয় বিষয় (বস্তু) ভিন্ন কোন বিষয় যদি অস্বাভাবিক উপায়ে কোনও ইন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করিতে পারে তাহা হইলে ঐ বিষয় স্ব স্বরূপে গৃহীত হইবে না। যেমন, আমাদের ত্বকে উষ্ণতাগ্রাহী ও শৈত্যগ্রাহী কূপ আছে। উষ্ণতাগ্রাহী কূপ উত্তেজিত হইলে উষ্ণতারই বোধ হয়। এইরূপ শৈত্যগ্রাহীর ক্ষেত্রেও। কিন্তু যদি ন্যূনাধিক ৪৮ সেঃ উষ্ণ উত্তেজকের সাহায্যে শৈত্যগ্রাহী কূপকে উত্তেজিত করা হয়, তাহা হইলে শৈত্যেরই বোধ হয়। অর্থাৎ বিষয় স্ব স্বরূপে গৃহীত হয় না। ইহা হইতে মনে হইতে পারে যে, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের নিজ নিজ বিষয়েই প্রবৃত্তি হয় এই নিয়মের কোন উপপত্তি নাই। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। বরং সাম্প্রতিক স্নায়ুবিজ্ঞান এই নিয়মকেই সমর্থন করে। শৈত্যগ্রাহী কূপ শৈত্যই গ্রহণ করে। চক্ষু রূপই গ্রহণ করে। অবশ্য স্নায়ুবিজ্ঞান-বোধের বিষয় বোধ বা স্নায়ুতন্ত্র-নিরপেক্ষ কিনা এই দার্শনিক প্রশ্ন উত্থাপন করে। কিন্তু প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের নিজ নিজ বিষয়েই প্রবৃত্তি হয়, এই নিয়মের বিরোধিতা না করিয়া সমর্থনই করে।

স্ববিষয়েই তাহাদের প্রবৃত্তি হইতে পারে। যেমন, চক্ষুর বিষয় রূপ, কর্ণের শব্দ, নাসিকার গন্ধ, জিহ্বার রস এবং ত্বকের স্পর্শ। চক্ষুর কেবল রূপেই প্রবৃত্তি হয়, কর্ণের হয় শব্দে, নাসিকার গন্ধে, জিহ্বার রসে এবং ত্বকের স্পর্শে। রূপভিন্নে চক্ষুর কখনও প্রবৃত্তি হয় না, বা রূপভিন্ন কখনও চক্ষুর গ্রাহ্য হয় না। মৃদু মলয় সমীরণই বলি আর উগ্র কালবৈশাখী ঝড়ই বলি, ইহারা কেহই চক্ষুর দ্বারা গৃহীত হয় না। বায়ু রূপহীন এবং স্বভাবতঃই চক্ষুর অবিষয়। তাহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ কখনও হইতে পারে না। এইরূপ, কর্ণপথে ঘ্রাণ লইবার চেষ্টা, বা নাসিকাপথে শব্দ গ্রহণের চেষ্টা, কৌতুক-রস সৃষ্টি করিবার চেষ্টা ভিন্ন আর কিছুই নহে। সংক্ষেপে, প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ের নিজ নিজ বিষয়েই প্রবৃত্তি হইতে পারে। নিজের অবিষয়ে কাহারও কোন প্রবৃত্তি হয় না। অবশ্য, ইন্দ্রিয় যদি পটু থাকে, তাহা হইলে তাহার বিষয়ের পটু প্রত্যক্ষ হয়, এবং ইন্দ্রিয় যদি অপটু থাকে, তাহা হইলে তাহার বিষয়ের মন্দ বা অপটু প্রত্যক্ষ হয়। এই জন্য নিকৃষ্ট চক্ষুর অধিকারী একটি কেশ দেখিতে পান না; বা দূরস্থ একটি কেশ কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু কেশ যে চক্ষুর বিষয় তাহা সত্য। একটি কেশের প্রত্যক্ষ সম্ভব না হইলেও কেশ-গুচ্ছের প্রত্যক্ষ হইতে পারে। কিন্তু পরমাণু কোনও ইন্দ্রিয়ের বিষয় নহে। ইন্দ্রিয় উৎকৃষ্টই হউক আর নিকৃষ্টই হউক, পটুই হউক আর অপটুই হউক, কোন প্রতিবন্ধক থাকুক বা না থাকুক, কোনও পরমাণু কখনও তাহার বিষয় হইবে না। তাই কেশপুঞ্জের প্রত্যক্ষের ন্যায় পরমাণুপুঞ্জেরও যে প্রত্যক্ষ হয় বা হইতে পারে, ইহা আমরা বলিতে পারি না, বা এইভাবে সর্বাগ্রহণ প্রসঙ্গের উদ্ধারও করিতে পারি না। অর্থাৎ, একটি কেশের সহিত দূরস্থ বা নিকৃষ্ট চক্ষুর যেরূপ সম্বন্ধ, একটি পরমাণুর সহিত, কোনও ইন্দ্রিয়েরই সেইরূপ সম্বন্ধ নাই। সেইজন্য যে ভাবে কেশপুঞ্জের প্রত্যক্ষ হয় সেইভাবে যে পরমাণুপুঞ্জের, বা ঘট, পট প্রভৃতি পদার্থের প্রত্যক্ষ হয়, তাহা বলা যায় না। ঘট, পট প্রভৃতি পদার্থের প্রত্যক্ষের উপপত্তি করিতে হইলে বলিতে হয় যে, পরমাণু হইতে পরমাণু-অতিরিক্ত দ্রব্যের বা অবয়বীর উৎপত্তি হয়। পরমাণু অদৃশ্য হইলেও সেই দ্রব্যান্তর বা অবয়বী প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে। অবয়বী-স্বীকৃতির দ্বারাই আমরা আমাদের লজ্জা নিবারণ করিতে পারি, বা ঘট, পট প্রভৃতি পদার্থের যে প্রত্যক্ষ হয় তাহা বুঝিতে পারি।

বৌদ্ধাচার্যগণ অবশ্য সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন। অবয়বী স্বীকার না করিলেও ঘট, পট প্রভৃতি পদার্থের প্রত্যক্ষ যে হইতে পারে বা হইয়া থাকে, ইহা দেখাইবার জন্য তাঁহারা বিশেষ চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাই তাঁহারা বলেন যে, পরমাণুপুঞ্জ হইতে দ্রব্যান্তর বা অবয়বী উৎপন্ন হয়, ইহা না বলিয়া দৃশ্য পরমাণুপুঞ্জ উৎপন্ন হয়,

ইহা বলিলেই চলে। সত্য কথা বলিতে কি, দৃশ্য দ্রব্যান্তর উৎপন্ন হয়, ইহা বলা অপেক্ষা দৃশ্য পরমাণুপুঞ্জ উৎপন্ন হয়, ইহা বলা অনেক সহজ। কারণ, যাঁহারা দৃশ্য দ্রব্যান্তর উৎপন্ন হয় বলিবেন তাঁহাদের দুইটি সর্বথা নূতন পদার্থ যে উৎপন্ন হয় তাহা বলিতে হইবে। অর্থাৎ, তাঁহাদের দৃশ্যত্ব এবং অবয়বী যে উৎপন্ন হয় তাহা বলিতে হইবে। কিন্তু দৃশ্য পরমাণুপুঞ্জ উৎপন্ন হয় বলিলে আর দুইটি সর্বথা নূতন জিনিষের যে উৎপত্তি হয় তাহা বলিতে হয় না। কারণ, পরমাণুপুঞ্জ আগেও ছিল, নূতন উৎপন্ন হইল দৃশ্যত্ব ধর্মটি। অতএব, অদৃশ্য পরমাণুপুঞ্জ হইতে দৃশ্য অবয়বী উৎপন্ন হয় অপেক্ষা দৃশ্য পরমাণুপুঞ্জ উৎপন্ন হয় এই কল্পনা অনেক লঘু। এবং সকল দর্শনাচার্যই স্বীকার করেন যে লঘু কল্পনাই আদরণীয়। পরমাণু নিত্য, নিরবয়ব, উৎপাদবিনাশহীন, ইত্যাদি কথা বলিয়াও বৌদ্ধাচার্যগণকে নিরস্ত করিতে পারা যাইবে না। কারণ, তাঁহারা ক্ষণভঙ্গবাদী। তাঁহাদের মতে সকল ভাব পদার্থই জলধর বা দীপসন্ততির ন্যায় ক্ষণিক, উৎপত্তির পরক্ষণেই বিনাশশীল। অতএব, পরমাণুও ক্ষণিক। তাহারও উৎপাদ এবং বিনাশ আছে। অদৃশ্য পরমাণুপুঞ্জ হইতে দৃশ্য পরমাণুপুঞ্জ উৎপন্ন হইতে পারে। এবং সেইজন্যই ঘট পট প্রভৃতি পদার্থের প্রত্যক্ষের উপপত্তির জন্য অদৃশ্য পরমাণু হইতে দৃশ্য অবয়বীর উৎপত্তির কল্পনার কোনও প্রয়োজন নাই। যাহাকে অবয়বী বলা হয় তাহা প্রকৃতপক্ষে পরমাণুপুঞ্জই। ঘটই বল, আর পটই বল, আর নর্তকীর স্ব্রূলতাই বল সবই নিত্য উৎপাদবিনাশশীল পরমাণুপুঞ্জ। পরমাণুপুঞ্জ-অতিরিক্ত কোন অবয়বী নাই।

বৌদ্ধমতে অদৃশ্য পরমাণুপুঞ্জ হইতে দৃশ্য পরমাণুপুঞ্জ উৎপন্ন হয়।

এইরূপ বৌদ্ধমতের বিরুদ্ধে ন্যায়াচার্যগণ বলিয়া থাকেন যে, ক্ষণভঙ্গবাদ সকলের অঙ্গীকৃত নহে। যাহা সৎ তাহাই যে দীপসন্ততির ন্যায় ক্ষণিক তাহা বলা যায় না। উপরন্তু অদৃশ্য পরমাণুপুঞ্জ হইতে দৃশ্য পরমাণুপুঞ্জের উৎপত্তি হয় এই কথাটির অর্থ কি? দৃশ্য পরমাণুপুঞ্জকে আমরা পরমাণুপুঞ্জ বলিব কেন? একই সময়ে পরমাণুকে দৃশ্য এবং অদৃশ্য, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং অতীন্দ্রিয় বলিলে কি মহাব্যাঘাত বা বিরোধ হয় না? বস্তুতঃ, দৃশ্য পরমাণুপুঞ্জে নিশ্চয়ই কিছু বিশেষ জন্মায়—কিন্তু সেই বিশেষটি কি? অবশ্যই দৃশ্যত্ব, অর্থাৎ মহৎপরিমাণ, উদ্ভূতরূপ প্রভৃতির আশ্রয় হওয়া। অতএব এই বিশেষই অবয়বী। পরমাণুসমূহের বিলক্ষণ বা বিজাতীয় সংযোগকে যে এই বিশেষ বলিব তাহা হইবে না। কারণ, পরমাণুগুলি অতীন্দ্রিয় বলিয়া তাহাদের সংযোগও অতীন্দ্রিয় হইবে, দৃশ্যত্বলাভ করিবে

কিন্তু এরূপ কথা বলা যায় না। দৃশ্য পরমাণুপুঞ্জকে পরমাণুপুঞ্জ মাত্র বলা যায় না।

যাহাকে দৃশ্য পরমাণুপুঞ্জ বলা হয় তাহাতে নিশ্চয়ই কিছু বিশেষ জন্মায় এবং তাহাই অবয়বী।

না। আর, অনেক পরমাণু মহত্ত্বাদি ধর্মের আশ্রয়, এই কল্পনা অপেক্ষা পরমাণু-অতিরিক্ত এক দ্রব্যান্তর বা অবয়বী ইহাদের আশ্রয় এই কল্পনা অনেক সহজ বা লঘু। উপরন্তু, আমাদের সকলেরই একটি ঘট বা একটি পটে এক বুদ্ধি হয়। আমরা দেখি একটি ঘট, একটি পট, একটি বৃক্ষ, একজন মানুষ ইত্যাদি। এখন, ঘট প্রভৃতি যদি পরমাণু-সংহতি মাত্রই হয় তাহা হইলে আমাদের এই বুদ্ধিকে ভ্রম বলিতে হয়। কারণ, কোনও একটি ঘট প্রকৃতপক্ষে একটি দ্রব্য নহে। ইহা অসংখ্য পরমাণুর সমুদায় মাত্র। অতএব, ঘট প্রভৃতি দ্রব্যে আমাদের নানা বুদ্ধি হওয়াই উচিত।

বৌদ্ধ মত মানিলে একটি ঘটে এক বুদ্ধিকে ভ্রম বলিতে হয়।

কিন্তু তাহা যখন কাহারও হয় না, তখন অবয়ব-অতিরিক্ত অবয়বী স্বীকার করাই বুদ্ধিমানের কাজ। এই সার্বজনীন বুদ্ধিকে যে ভ্রম বলিবে তাহা হইবে না। কারণ, সার্বজনীন ভ্রম কি কখনও ভ্রম হইতে পারে? আর, তাহা ছাড়া, ভ্রম হইতে হইলে যথার্থ প্রধান-বুদ্ধি থাকিতে হয়।[২] আমার তখনই রজ্জুতে সর্প ভ্রম হইতে পারে, যখন সর্পবুদ্ধি নামক যথার্থ প্রধান বুদ্ধি আমার থাকে। আমি যদি কখনও সত্যকারের সাপ না দেখিয়া থাকি, যদি আমার কখনও অভ্রান্ত সর্পবুদ্ধি না

কিন্তু তাহা বলা যায় না।

হয়, তাহা হইলে রজ্জুতে আমার কদাচ সর্পভ্রম হইতে পারে না। এখন, ঘট প্রভৃতি পদার্থে এক বুদ্ধিকে যদি ভ্রম বা গৌণ এক বুদ্ধি বলিতে চাহ, তাহা হইলে কোথায়, কখন, কি ভাবে মুখ্য এক বুদ্ধি হয় বা হইল তাহা তোমায় দেখাইতে হইবে। কিন্তু তুমি কোনও রূপেই তাহা দেখাইতে পার না। কারণ, তোমার মতে পরমাণু ও তাহার সমুদায় ভিন্ন আর কিছুই নাই। পরমাণু অতীন্দ্রিয় বলিয়া তাহাতে মুখ্য এক বুদ্ধি হইতে পারে না। আর, পরমাণুপুঞ্জ বস্তুস্থিতিতে এক নহে বলিয়া তাহাতেও মুখ্য এক বুদ্ধি হইতে পারে না। তুমি যে বলিবে যে, স্পর্শ প্রভৃতিতে যে এক বুদ্ধি হয় তাহাই প্রধান এক বুদ্ধি, তাহাও হইবে না। কারণ, নিরাশ্রয় স্পর্শাদির কোনও প্রত্যক্ষ হইতে পারে কিনা, তাহা সন্দেহ করা যাইতে পারে। উপরন্তু, আমাদের ঘট প্রভৃতিতে যে এক বুদ্ধি হয়, তাহা স্পর্শাদির বুদ্ধির মত নহে, কিন্তু রজ্জুতে সর্প-বুদ্ধির মত তাহা কে বলিল? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে তুমি যে বলিবে যে, তথাকথিত

২। কোনও স্থাণুতে যখন পুরুষবুদ্ধি হয়, তখন স্থাণুকে বলা হয় তত্ত্ব এবং পুরুষকে বলা হয় প্রধান। অযথার্থ জ্ঞানের বিশেষণাংশে বা বিধেয়াংশে যাহা ভাসমান হয় তাহাকে প্রধান আখ্যা দেওয়া হয়। ইহাই 'প্রধান'এর প্রাচীন সংজ্ঞা। এরিষ্টটলের ন্যায়ের সিদ্ধান্তের বিধেয়াংশকে major term বা প্রধান পদ বলা হয়। প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে ব্যবহৃত পরিভাষার সহিত এরিষ্টটলের পরিভাষার এই ব্যাপারে কিছু সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ইহার হেতু কি বা ইহার কোনও ঐতিহাসিক মূল্য আছে কিনা তাহা সুধীগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

এক অবয়বী বিরুদ্ধ ধর্মের আধার হইয়া থাকে, এবং সেইজন্য প্রকৃতই এক নহে, তাহা হইবে না। কারণ, যাহাকে এক অবয়বী বলা হয় তাহা বিরুদ্ধ ধর্মের আধার হয় না। তুমি বলিয়া থাক যে, বৃক্ষ নামক এক অবয়বীটি আবৃতত্ব ও অনাবৃতত্ব নামক দুইটি বিরুদ্ধ ধর্মের একই সময়ে আধার হইয়া থাকে। কিন্তু তোমার এই কথা অযথার্থ। বৃক্ষটিকে যখন অর্ধাবৃত আছে বলিয়া বলা হয়, তখনও প্রকৃতপক্ষে বৃক্ষরূপ অবয়বীটি দুইটি বিরুদ্ধ ধর্মের আধার হয় না। কারণ, বৃক্ষরূপ অবয়বীটির প্রতীতি হয়। ইহা যদি অনাবৃত না হইত, তাহা হইলে ইহার প্রতীতি হইতে পারিত না। অতএব, অবয়বীটি অনাবৃতত্ব ধর্মেরই আধার, আবৃতত্ব ধর্মের নহে। এখন, তুমি হয়ত বলিবে যে অর্ধাবৃত বৃক্ষে অবয়বীর একাংশেরই প্রতীতি হয়, সর্বাংশের হয় না, এবং সেইজন্য অবয়বী যুগপৎ আবৃতত্ব ও অনাবৃতত্ব নামক ধর্ম দুইটির আধার হইতে বাধ্য। তোমার এইরূপ কথার উত্তরে বলিতে হইবে যে, অর্ধাবৃত বৃক্ষে যখন অনাবৃত অংশের সহিত চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হওয়ার ফলে, অবয়বীর জ্ঞান হয় তখন অবয়বীর একাংশের জ্ঞান হয় না। কারণ, অবয়বীর কোন অংশ নাই। তুমি অবশ্য অবয়বী সম্পর্কে অংশ কথাটি ব্যবহার কর, এবং তাহার পর জিজ্ঞাসা করিয়া থাক যে, অবয়বী তাহার কোনও একটি অবয়বে কি সর্বাংশ লইয়াই থাকে, অথবা একদেশ লইয়া থাকে। এখন, এইরূপ প্রশ্নের আকাঙ্ক্ষিত উত্তর পাইতে মোটেই পরিশ্রম করিতে হয় না। কারণ, আমরা কেহই বলিতে পারি না যে, অবয়বী তাহার একটি অবয়বে সর্বাংশ লইয়া থাকে। কোনও একটি অবয়বেই যদি অবয়বী সর্বাংশ লইয়া থাকিত, তাহা হইলে অন্য অবয়বগুলির কোন প্রয়োজন থাকিত না। এইরূপ, আমরা বলিতে পারি না যে, অবয়বী তাহার একটি অবয়বে তাহার একদেশ লইয়া থাকে। কারণ তাহা হইলে অবয়ব-অতিরিক্ত অবয়বী স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন থাকে না। তাই তুমি এইরূপ প্রশ্ন করিয়া অবয়বী যে অলীক তাহা বুঝাইতে চাহ। কিন্তু তোমার এই প্রশ্ন কোন প্রশ্নই নহে। অবয়বী সম্পর্কে সর্বাংশ, একদেশ প্রভৃতি কথার কোন প্রয়োগই হইতে পারে না। অবয়বী এক, তাহার কোনও অংশ নাই। সেইজন্য কোনও অবয়বে অবয়বীর সর্বাংশই বিদ্যমান না, একাংশ বিদ্যমান এইরূপ প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। প্রকৃত কথা এই যে, অবয়বী এক। তাহার অবয়বগুলি তাহার অংশ হইলেও অবয়বী নিজে নিরংশ। অবয়বগুলি তাহার এক একটি দেশ, কিন্তু অবয়বী নিজে একদেশ নহে এবং এই একদেশগুলিও কেহই অবয়বী

অবয়বী যুগপৎ আবৃতত্ব ও অনাবৃতত্ব নামক দুইটি বিরুদ্ধ ধর্মের আধার, সুতরাং এক নহে এই বৌদ্ধমত গ্রাহ্য নহে।

কারণ, বৃক্ষটির অর্ধাবরণ দশাতেও অবয়বী অনাবৃতই থাকে।

নহে। শুধু তাহাই নহে,—অবয়বীর স্বভাবই এই যে, ইহা তাহার গৃহীত অবয়বগুলির সহিত গৃহীত হয়। প্রতীত অবয়বের সহিত প্রতীত হওয়াই অবয়বীর স্বভাব। বৃক্ষের অনাবৃত অংশ যখন প্রতীত হয়, তখন বৃক্ষরূপ এক অবয়বীটি সম্পূর্ণরূপে গৃহীত হয়। অপ্রতীত অবয়বের অপ্রতীতি অবয়বীর অপ্রতীতির কারণ হইতে পারে না। কোনও একটি অবয়ব অপ্রতীত থাকিলেও, অবয়বী যে অপ্রতীত রহিয়াছে তাহা বলা যায় না। তাহা বলা চলিত যদি অবয়বী অবয়ব-অতিরিক্ত না হইত। অবয়বী অবয়ব-অতিরিক্ত অথচ প্রত্যেক অবয়বেই পরিসমাপ্ত। এই জন্যই সকল অবয়বের প্রতীতি না হইলেও কোনও একটি অবয়বের প্রতীতির দ্বারাই অবয়বীর প্রতীতি হইতে পারে। অতএব, বৃক্ষের অনাবৃত অংশের সহিত যখন চক্ষুর সন্নিকর্ষ হয়, তখনই অবয়বীর উপলব্ধি হইয়া যায়। অবয়বীকে আবৃতত্বের আশ্রয় বলিবার কোনও হেতু থাকে না। ইহা অবশ্য সত্য যে, অনাবরণ দশায় আমরা যেরূপ বুঝিতে পারি যে অবয়বীটি এইরূপ স্থূল বা দীর্ঘ, অর্ধাবরণ দশায় আমরা সেইরূপ কোনও বুদ্ধির অধিকারী হইতে পারি না। কিন্তু ইহার উপপত্তি করিবার জন্য অবয়বীটি আবৃত রহিয়াছে এইরূপ কথা বলিবার কোনও প্রয়োজন নাই। কোনও অবয়বী এইরূপ স্থূল বা দীর্ঘ এইরূপ বুঝিতে হইলে যে তাহার সকল অবয়বের সহিত পরিচিত হইতে হয়, এইরূপ বলিলেই কাজ মিটিয়া যায়। অর্থাৎ পরিমাণ-সামান্য-বিশেষ প্রভৃতির অভিব্যঞ্জক হইল ভূয়োবয়ব-ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ। অর্ধাবরণ দশায় ইহা না থাকায় পরিমাণ-সামান্য-বিশেষ প্রতীত হয় না। সুতরাং, এইজন্য অবয়বী যে আবৃত রহিয়াছে ইহা বলিবার কোনও প্রয়োজন নাই।

অবয়বী নিরংশ, অনাবৃত অবয়বের প্রতীতির সহিতই ইহার প্রতীতি হইয়া থাকে।

এইরূপ সকম্পত্ব ও অকম্পত্ব যে যুগপৎ একই অবয়বীতে বিদ্যমান থাকে ইহাও বলা উচিত হইবে না। কারণ, বৃক্ষের শাখাদেশ যখন আন্দোলিত হইতে থাকে তখন তাহার কাণ্ডদেশ অকম্পিত থাকিতে পারে। কিন্তু তাহার অর্থ এই নহে যে, বৃক্ষ নামক অবয়বীটি একই সঙ্গে কাঁপিতেছে এবং কাঁপিতেছে না। আসলে এইরূপ স্থলে বৃক্ষ নামক অবয়বীটি কাঁপিতেছে না। অবয়বের গতি অবয়বীর গতি বুঝায় না। তুমি যখন হাত নাড়িতে থাক তখন তোমার হাতই নড়ে, তুমি নড় না। অবশ্য তুমি যদি চলিতে থাক, তাহা হইলে তোমার হাতও চলিতে থাকিবে। কিন্তু তোমার হাত চলিতে থাকিলেই যে তুমিও চলিতে থাকিবে, তাহা নহে। অতএব, কোনও বৃক্ষের শাখাদেশ মাত্র যদি আন্দোলিত হইতে থাকে, তাহা হইলে বৃক্ষ নামক অবয়বীটি যে কম্পিত হইতেছে তাহা বলা

এইরূপ সকম্পত্ব ও অকম্পত্ব নামক দুইটি বিরুদ্ধ ধর্মের আধারও অবয়বী কখনও হয় না।

যায় না, এবং তাহার কাণ্ডদেশে কোন কম্পন নাই বলিয়া অবয়বীটি যে যুগপৎ সকম্পত্ব ও অকম্পত্বের আশ্রয় ইহাও বলিতে হয় না। অতএব অবয়বী বিরুদ্ধ ধর্মের আধার হইয়া থাকে এইরূপ কথার কোনও অর্থ নাই। আমাদের অবয়বীতে যে এক বুদ্ধি হয় তাহা যথার্থ এক বুদ্ধি। এবং সেইজন্যই অবয়বীকে অবয়ব-সমষ্টি মাত্র বলা যায় না। সংক্ষেপে, অবয়ব-অতিরিক্ত অথচ অবয়বসমূহে নিরবচ্ছিন্নরূপে সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান এক অবয়বী স্বীকার করাই আমাদের উচিত। ইহাই অবয়বী অবয়ব-অতিরিক্ত, এই ন্যায় মতের সারমর্ম।

অবয়বীকে অবয়ব-অতিরিক্ত বলাই কর্তব্য।

আমরা দেখিলাম যে, ন্যায়াচার্যগণের মতে অবয়বী অবয়ব-অতিরিক্ত। গুণ ও গুণী, ক্রিয়া ও ক্রিয়াবান্, জাতি ও ব্যক্তি যেমন অত্যন্ত ভিন্ন, অবয়ব ও অবয়বীও তেমনই অত্যন্ত ভিন্ন। অথচ আমাদের অবয়বী-বিশিষ্ট-অবয়ব-বুদ্ধি হইয়া থাকে; বা অবয়বী যে অবয়বে রহিয়াছে, এইরূপ বুদ্ধি হয়। ইহার উপপত্তির জন্য ন্যায়াচার্যগণ বলেন যে, গুণ যেমন গুণীতে সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান থাকে, অবয়বীও তেমনই অবয়বে সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান থাকে। সংক্ষেপে, ন্যায়মতে অবয়বী অবয়ব-অতিরিক্ত এবং অবয়বে সমবায় সম্বন্ধে আশ্রিত। এখন ন্যায়মতে কার্যদ্রব্য মাত্রই সাবয়ব। নিত্য পদার্থ বা যাহার কোন উৎপাদ ও বিনাশ নাই তাহা কার্য হইতে পারে না। যেমন গগন। গগনের উৎপাদও নাই, বিনাশও নাই। বৈদান্তিকগণ অবশ্য গগনকে নিত্য বলিয়া মনে করেন না। তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সংভূতঃ (তৈঃ ২।১) ইত্যাদি শ্রুতিবলে তাঁহারা গগনকে জন্য পদার্থ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ন্যায়াচার্যগণের মতে গগন নিত্য। তাহার উৎপাদও নাই, বিনাশও নাই। কিন্তু যাহা কার্যদ্রব্য তাহা এইরূপ হইতে পারে না। তাহার উৎপাদও থাকে, বিনাশও থাকে। যেমন ঘট। কুম্ভকার মৃত্তিকা হইতে ঘট নির্মাণ করেন, এবং আমি বা তুমি মুদ্গরাঘাতে তাহাকে ধ্বংস করিয়া ফেলি। এইরূপ অন্যান্য ক্ষেত্রেও। যে সকল ভাবপদার্থ কালের নিয়ত-সম্বন্ধী নহে, তাহারা কিছুকাল কালের সম্বন্ধী এবং কিছুকাল কালের অসম্বন্ধী। এইরূপ পদার্থকেই কার্য বলা হয়। ভাবকার্যমাত্রই উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইয়া থাকে। অবয়ব-সংযোগের ফলেই কার্যদ্রব্যের উৎপত্তি হয় এবং অবয়বের বা তাহার সংযোগের বিনাশ ঘটিলে কার্যদ্রব্যের বিনাশ ঘটে। যেমন কাপড়। সুতার সংযোগের ফলেই ইহার উৎপত্তি হইয়া থাকে; এবং সুতার বা তাহার সংযোগের নাশ হইলেই ইহাও নষ্ট হইয়া যায়। অর্থাৎ অবয়ব-সংযোগ এবং সেই সংযোগের নাশ— ইহারা কার্যদ্রব্যের

অবয়বী অবয়বে সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান থাকে এবং অবয়ব সংযোগের ফলেই উৎপন্ন হয়।

উৎপাদ ও বিনাশের হেতু। সুতরাং কার্যদ্রব্য যদি নিরবয়ব হইত, তাহা হইলে তাহার উৎপাদও থাকিত না, বিনাশও থাকিত না। সংক্ষেপে, কার্যদ্রব্য মাত্রই সাবয়ব। ইহারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবয়বে সমবেত হইয়া উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যতক্ষণ বর্তমান থাকে ততক্ষণ নিজ নিজ অবয়বেই সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান থাকে, এবং অবয়বের নাশ না হইয়া যদি ইহাদের নাশ হয় তাহা হইলে নিজ নিজ অবয়বেই ইহারা বিলীন হয়। অতএব প্রত্যেকটি কার্যদ্রব্যেরই সমবায়ী কারণ তাহার অবয়ব। কাপড়ের সমবায়ী কারণ সুতা, ঘটের কপাল, বৃক্ষের শাখা, কাণ্ড প্রভৃতি, টেবিলের পায়া, দেরাজ ইত্যাদি, আমার বা তোমার দেহের হাত, পা ইত্যাদি। এখন, কার্যদ্রব্যের সমবায়ী কারণ যেমন তাহার অবয়ব, কার্যগুণ প্রভৃতির সমবায়ী কারণ যে গুণী প্রভৃতিতে তাহারা সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকে সেই গুণী প্রভৃতি। যেমন, শ্বেতপদ্মের শ্বেতবর্ণের সমবায়ী কারণ পদ্ম, উৎক্ষিপ্ত লোষ্ট্রের উৎক্ষেপণের সমবায়ী কারণ লোষ্ট্র।

অতএব অবয়বই অবয়বীর সমবায়ী কারণ।

সমবায়ী কারণ কাহাকে বলে তাহা আমরা দেখিলাম। এখন, দেখা যাউক জগৎ নামক কার্যদ্রব্যের সমবায়ী কারণ ঈশ্বর কেন নহেন। অবয়বই অবয়বীর সমবায়ী কারণ। সুতরাং কোনও কার্যদ্রব্যের মাত্র একটি সমবায়ী কারণ থাকিতে পারে না; বা ঈশ্বর জগতের সমবায়ী কারণ হইতে পারেন না। এখন, তর্কের খাতিরে যদি একাধিক ঈশ্বর আছেন ইহা স্বীকারও করা যায়, তাহা হইলেও ঈশ্বরকে জগতের সমবায়ী কারণ বলা যাইবে না। কারণ, কেবল একাধিক ঈশ্বর থাকিলেই চলিবে না। তাহাদের পরস্পর সংযুক্তও হইতে হইবে। কিন্তু এইরূপ সংযোগ অসম্ভব। ঈশ্বর বিভু বা সর্বব্যাপী। কোনও বিভু পদার্থের অপর কোনও বিভু পদার্থের সহিত সংযোগ হইতে পারে না। এইরূপ সংযোগ স্বীকার করিলে নিত্য সংযোগ স্বীকার করিতে হয়। নিত্য সংযোগ মীমাংসাচার্যগণের সম্মত হইলেও ন্যায়দর্শনে নিত্য সংযোগ স্বীকার করা হয় না। ন্যায়াচার্যগণের মতে সংযোগ তিন প্রকার— উভয় কর্মজ, অন্যতর কর্মজ এবং সংযোগজ। দুইটি মেষের সংযোগ উভয় কর্মজ। শ্যেন এবং শৈলের সংযোগ শ্যেনের কর্মজ। এবং কপাল ও তরু সংযোগে যে তরু ও কুম্ভ সংযোগ ঘটে, তাহা সংযোগজ সংযোগ। এখন, এই তিন প্রকার সংযোগের মধ্যে শেষেরটিকে উপেক্ষা করা যায়। কারণ ইহা সাক্ষাৎভাবে কর্মজন্য না হইলেও কর্মজন্য। অতএব আমরা বলিতে পারি যে, গতিশীল হইতে পারে না এমন দুইটি দ্রব্য কখনও সংযুক্ত হইতে পারে না। সুতরাং দুইটি দ্রব্যই যদি

ঈশ্বর জগতের সমবায়ী কারণ নহেন।

বিভু হয়, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে কোনও সংযোগ (অর্থাৎ নিত্য সংযোগ) থাকিতে পারে না। অতএব একাধিক ঈশ্বর থাকিলেও তাহাদের মধ্যে সংযোগ ঘটার কোনও সম্ভাবনা না থাকায় ঈশ্বর জগতের সমবায়ী কারণ হইতে পারেন না। আসল কথা হইল এই যে, ঈশ্বরকে জগতের সমবায়ী কারণ হইতে হইলে ঈশ্বরকে জগতের অবয়ব হইতে হইবে, বা জগৎকে ঈশ্বরে সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান থাকিতে হইবে। কিন্তু জগৎ ঈশ্বরে সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান নহে। তাহা যদি হইত তাহা হইলে আমরা জগৎকে ভাঙিতে ভাঙিতে ঈশ্বরে পৌঁছাইতে পারিতাম। কিন্তু তাহা আমরা পারি না। জগৎকে ভাঙিতে ভাঙিতে আমরা ক্ষিতি, অপ্‌ প্রভৃতি পরমাণুতেই পৌঁছাই। এবং ঈশ্বর অণু নহেন, বিভু; সুতরাং জগৎকে ভাঙিতে ভাঙিতে ঈশ্বরে পৌঁছাইবার আশাও আমরা রাখিতে পারি না। অতএব ঈশ্বর জগতের সমবায়ী কারণ নহেন।

সমবায়ী কারণ কাহাকে বলে এবং ঈশ্বর যে কেন জগতের সমবায়ী কারণ নহেন তাহা আমরা দেখিয়াছি। এখন, আমরা অসমবায়ী কারণ কাহাকে বলে এবং ঈশ্বর যে কেন জগতের অসমবায়ী কারণ নহেন তাহা দেখিবার চেষ্টা করিতে পারি। প্রত্যেকটি কার্যদ্রব্যের সমবায়ী কারণ একাধিক। এইজন্য কোনও কার্যদ্রব্যের সমবায়ী কারণ থাকিলেই যে কার্যদ্রব্যের উৎপত্তি হইবে তাহা নহে। কার্যদ্রব্যটির উৎপত্তি হইতে হইলে তাহার সমবায়ী কারণগুলিকে একত্র হইতে হইবে বা পরস্পর মিলিত হইতে হইবে। অতএব কোনও কার্যদ্রব্যের প্রতি তাহার অবয়বগুলি যেমন কারণ, সেই অবয়বগুলির পরস্পর মিলনও তেমনই কারণ। এইরূপ কারণকেই অসমবায়ী কারণ বলে। দৃষ্টান্তের সাহায্যে কথাটিকে কিছু পরিষ্কার করা যাউক— তাহার পর অসমবায়ী কারণ সম্পর্কে আরও কথা বলা যাইবে। আমার পরিহিত কাপড়টির সমবায়ী কারণ সূতা। এই সূতাগুলি যদি পরস্পর বিযুক্ত থাকিত, যদি তাহারা পরস্পর মিলিত না হইত তাহা হইলে আমার এই কাপড়টির উৎপত্তি হইত না। অতএব সূতাগুলি যেমন এই কাপড়টির কারণ, সেইরূপ তাহাদের পরস্পর সংযোগও ইহার কারণ। এই কারণটি কাপড়টির কারণ বলিয়া তাহার সম্বন্ধী এবং কাপড়ের সমবায়ী কারণে (অর্থাৎ সূতাতে) বর্তমান থাকে বলিয়া তাহারও সম্বন্ধী। মোট কথা হইতেছে এই যে, সূতাগুলির পরস্পর সংযোগ নামক কারণটি কার্য (কাপড়) যেখানে সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান থাকে সেইখানেই (সূতাতে) সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান থাকে এবং এইরূপ কারণকে অসমবায়ী কারণ বলে। আবার, আমার এই কাপড়টি শ্বেতবর্ণ।

সমবায়ী কারণে আসন্ন কারণকে অসমবায়ী কারণ বলে, এবং গুণ ও কর্মভিন্ন পদার্থ অসমবায়ী কারণ হইতে পারে না।

এই শ্বেতবর্ণের সমবায়ী কারণ কাপড়টিই। কিন্তু যে সূতা দিয়া কাপড়টি নির্মিত হইয়াছে সেই সূতাগুলি যদি শ্বেতবর্ণের না হইত তাহা হইলেও এই কাপড়টি শ্বেতবর্ণের হইতে পারিত না। অতএব সূতার রূপও কাপড়ের রূপের কারণ। এই কারণকেও অসমবায়ী কারণ বলা হয়। এখন এই স্থলে, কার্য যেখানে সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান থাকে, সেখানে কিন্তু কারণও সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান থাকে না। তাহা হইলে এখানকার সম্বন্ধটির রূপটি কি? একটু বিবেচনা করিলেই দেখা যাইবে যে, কাপড়ের রূপের সমবায়ী কারণ (কাপড়টি) যেখানে সমবায় সম্বন্ধে থাকে সেইখানে (কাপড়ের সমবায়ী কারণ সূতাগুলিতে) এই কারণটি (সূতার রূপ) সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান থাকে। অতএব এই কারণটিকেও আমরা সমবায়ী কারণে আসন্ন কারণ বলিয়া ধরিতে পারি। সংক্ষেপে, কোনও কার্যের সমবায়ী কারণে আসন্ন কারণকেই সেই কার্যের অসমবায়ী কারণ বলে।[৩] এই আসত্তি কখনও সমবায়, কখনও স্ব-সমবায়ি-সমবেতত্ব। কাপড়টির অসমবায়ী কারণ সমবায়ী কারণে সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান থাকে, এবং কাপড়ের রূপের অসমবায়ী কারণ সমবায়ী কারণে স্ব-সমবায়ী-সমবেতত্ব সম্বন্ধে থাকে। অন্যরূপে প্রকাশ করিয়া বলা যায় যে, যে

অতএব ঈশ্বর জগতের অসমবায়ী কারণ নহেন।

কারণ কার্যের সমবায়ী কারণে, অথবা সমবায়ী কারণ যেখানে সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান থাকে সেখানে, সেই কারণকে সেই কার্যের অসমবায়ী কারণ বলে, এবং গুণ ও কর্ম ভিন্ন পদার্থ অসমবায়ী কারণ হইতে পারে না। সুতরাং, ঈশ্বর জগতের অসমবায়ী কারণ হইতে পারেন না।

সমবায়ী ও অসমবায়ী কারণ কাহাকে বলে তাহা আমরা দেখিলাম, এবং ঈশ্বর যে কেন জগতের সমবায়ী বা অসমবায়ী কারণ হইতে পারেন না তাহাও

সমবায়ী ও অসমবায়ী ভিন্ন কারণকে নিমিত্ত কারণ বলে।

আমরা দেখিলাম। এইবার আমরা নিমিত্ত কারণ কাহাকে বলে এবং ঈশ্বরকে জগতের নিমিত্ত কারণ বলার অর্থ কি তাহা দেখিবার চেষ্টা করিতে পারি। প্রত্যেক কার্যেরই সমবায়ী এবং অসমবায়ী কারণ ভিন্ন অন্য কারণ থাকে। যেমন, আমার এই কাপড়টির সমবায়ী কারণ সূতাগুলি এবং অসমবায়ী কারণ তাহাদের সংযোগ। কিন্তু ইহারাই কেবল কাপড়টির কারণ নহে। ইহার অন্য কারণও আছে। তন্তুবায়, তুরী প্রভৃতিও ইহার কারণ। এইরূপ ঘটের সমবায়ী কারণ কপালদ্বয় এবং অসমবায়ী কারণ তাহাদের সংযোগ। কিন্তু ইহারাই

৩। তুরীতন্তুসংযোগভিন্নত্বং ইত্যাদি অবশ্য নিবেশ্য ব্যাবৃত্তি নিবেশের কোন প্রয়োজন এই স্থলে অনুভব করিলাম না।

কেবল ঘটের কারণ নহে। কুম্ভকার, দণ্ড প্রভৃতিও ইহার কারণ। এইরূপ অন্যান্য ক্ষেত্রেও। অতএব ইহা বলা যায় যে, প্রত্যেক কার্যেরই সমবায়ী ও অসমবায়ী কারণ ভিন্ন অন্য কারণ থাকে। শুধু তাহাই নহে। এমনও অনেক কার্য আছে যাহার সমবায়ী ও অসমবায়ী কারণ অপ্রসিদ্ধ। যেমন ধ্বংস। ধ্বংসের কোনও অবয়ব নাই, বা অভাব সমবায় সম্বন্ধে কোথাও থাকে না। সুতরাং ইহার কোনও সমবায়ী কারণ থাকিতে পারে না; এবং এইজন্যই ইহার কোনও অসমবায়ী কারণও থাকিতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া ইহার যে কোনও কারণ নাই তাহা নহে। ধ্বংসের কোন ধ্বংস না থাকিতে পারে, ইহা অবিনাশী হইতে পারে, কিন্তু ইহা অনাদি নহে। ইহার উৎপত্তি সহজ অনুভবসিদ্ধ। তাই যদিও ইহার সমবায়ী এবং অসমবায়ী কারণ নাই, তথাপি ইহার অন্যপ্রকার কারণ আছে। সেই কারণের নাম নিমিত্ত কারণ। সংক্ষেপে সমবায়ী এবং অসমবায়ী কারণ ভিন্ন কারণকে নিমিত্ত কারণ বলে। সমবায়ী কারণের নাশ হইলে কার্যের নাশ হয়। যেমন, সূতাগুলিকে যদি ভস্মীভূত করা হয় তাহা হইলে কাপড়টিও ভস্মে পরিণত হইবে। এইরূপ অসমবায়ী কারণের নাশ হইলেও কার্যের নাশ হয়। যেমন, কাপড়টির সূতাগুলিকে নষ্ট না করিয়া যদি কাপড়টিকে টানিয়া টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলা হয়, তাহা হইলেও কাপড়টি নষ্ট হইবে। বস্তুতঃ, এমনও অনেক কার্য আছে যাহাদের সাক্ষাৎ অবয়ব নিত্য— যেমন দ্ব্যণুক বা দুইটি পরমাণু হইতে উৎপন্ন অবয়বী। ইহার নাশ হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার আশ্রয় বা অবয়ব নিত্য বলিয়া আশ্রয় বা অবয়ব নাশের জন্য যে ইহার নাশ হয় তাহা বলা যায় না। অতএব অসমবায়ী কারণের নাশে যে কার্যের নাশ হয় তাহা আমাদের বলিতে হয়।

নিমিত্ত কারণের নাশ, কার্যের নাশ বুঝায় না।

এইখানেই নিমিত্ত কারণের একটি বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়। সমবায়ী বা অসমবায়ী কারণের নাশ, কার্যের নাশ বুঝায়। কিন্তু নিমিত্তকারণের নাশ কার্যের নাশ বুঝায় না।[8] কুম্ভকারের মৃত্যুর পরেও ঘটকে বিদ্যমান থাকিতে দেখা যায় এবং কাপড় কিনিবার সময় আমরা তন্তুবায়ের জন্মপত্রিকা বিচার করিয়া দেখি না। নিমিত্ত কারণের নাশের অর্থ কার্যের নাশ নহে।

এই নিমিত্ত কারণ দুই প্রকার— সাধারণ ও অসাধারণ : কতকগুলি নিমিত্ত কারণ সকল কার্যেরই নিমিত্ত কারণ। ইহাদের সাধারণ নিমিত্ত কারণ বলে। আবার প্রত্যেকটি কার্যব্যক্তিরই বা এক জাতীয় কার্যের এমন অনেক নিমিত্ত কারণ থাকে যাহারা অন্য কার্য-ব্যক্তির বা অন্য জাতীয় কার্যের নিমিত্ত কারণ হয় না।

৪। অপেক্ষাবুদ্ধি প্রভৃতি কয়েকটি ক্ষেত্র বাদে।

এইরূপ নিমিত্ত কারণকে অসাধারণ নিমিত্ত কারণ বলে। প্রত্যেক কার্যেরই আটটি সাধারণ নিমিত্ত কারণ আছে— ইহা অধিকাংশ ন্যায়াচার্যের সিদ্ধান্ত। এই সাধারণ নিমিত্ত কারণগুলি হইল— ঈশ্বর, তাঁহার জ্ঞান, ইচ্ছা ও কৃতি, দিক্, কাল, অদৃষ্ট ও প্রাগভাব। প্রতিবন্ধকের সংসর্গাভাব নামক নবম সাধারণ নিমিত্ত কারণটি প্রাচীন ন্যায়াচার্যগণের দ্বারা স্বীকৃত হইত। নব্যনৈয়ায়িক মণিকারের মতে প্রতিবন্ধকের অত্যন্তাভাবই নবম সাধারণ নিমিত্ত কারণ। সংক্ষেপে ন্যায়মতে সাধারণ নিমিত্ত কারণ আটটি বা নয়টি এবং অসাধারণ নিমিত্ত কারণ কার্যভেদে অনেকবিধ।

নিমিত্ত কারণ দুই প্রকার— সাধারণ ও অসাধারণ।

ঈশ্বর প্রভৃতি সাধারণ নিমিত্ত কারণ।

নিমিত্ত কারণ কাহাকে বলে তাহা আমরা দেখিলাম। এখন ঈশ্বরকে কেন জগতের নিমিত্ত কারণ বলা হয় তাহা দেখা যাউক। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, ঈশ্বর জগতের সমবায়ী বা অসমবায়ী কারণ হইতে পারেন না। কপাল যেরূপ ঘটের কারণ, বা সূতা যেরূপ বস্ত্রের কারণ, ঈশ্বর সেইরূপ জগতের কারণ নহেন। এইরূপ কপাল-সংযোগ যেরূপ ঘটের কারণ, বা সূতার পরস্পর মিলন যেরূপ বস্ত্রের কারণ, ঈশ্বর জগতের সেরূপ কারণও নহেন। অতএব কুম্ভকার যেরূপ ঘটের কারণ বা তন্তুবায় যেরূপ বস্ত্রের কারণ, ঈশ্বর সেইরূপ জগতের কারণ। কুম্ভকার ঘটের সমবায়ী কারণগুলিকে মিলিত করিয়াই ঘটের কারণ হন। তন্তুবায়ও বস্ত্রের সমবায়ী কারণগুলিকে মিলিত করিয়াই বস্ত্রের কারণ হন। সেইরূপ ঈশ্বরও জগতের সমবায়ী কারণগুলিকে মিলিত করিয়াই জগতের কারণ হন। কিন্তু জগতের সমবায়ী কারণ কি? জগৎ বলিতে আমরা যাহা বুঝিয়া থাকি তাহাতে নয় প্রকার দ্রব্য দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন— ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, কাল, দিক্, আত্মা এবং মন। এই নয় প্রকার দ্রব্যের মধ্যে শেষের পাঁচ প্রকার নিত্য। তাহাদের উৎপাদও নাই, বিনাশও নাই। সুতরাং তাহাদের কারণ সংক্রান্ত কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। এই প্রশ্ন কেবল উঠিতে পারে প্রথম চারি প্রকারের দ্রব্যের ক্ষেত্রে। কারণ, এই চারি প্রকারের যে সকল দ্রব্য আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, তাহারা অনিত্য। তাহাদের উৎপত্তি ও বিনাশ সহজ অনুভবসিদ্ধ। এখন এই সকল অনিত্য দ্রব্যগুলিকে ভাঙিতে ভাঙিতে আমরা নিরবয়ব অবয়বে বা পরমাণুতে পৌঁছাইতে পারি। ক্ষিতি, অপ্, তেজ এবং মরুৎ— এই চারি প্রকার পরমাণুই জগতের

ঈশ্বর জগতের সমবায়ী কারণ ক্ষিত্যাদি পরমাণুকে মিলিত করিয়াই জগতের কারণ হইয়া থাকেন।

উপাদান কারণ। ঈশ্বর ইহাদের মধ্যে সংযোগ ঘটাইয়াই এই জগৎ নির্মাণ করিয়া থাকেন।

অর্থাৎ পরমেশ্বরের সৃষ্টির ইচ্ছা হয়। তাহার ফলে প্রথমেই পবন পরমাণুতে কর্ম উৎপন্ন হয়। এই কর্মবশে দুইটি দুইটি করিয়া পরমাণুতে সংযোগ উৎপন্ন হয়। তাহার পর দ্ব্যণুকের উৎপত্তি হয়। তাহার পর তিনটি তিনটি করিয়া দ্ব্যণুকে কর্মের উৎপত্তি হয় এবং তাহার ফলে তাহারা সংযুক্ত হয় ও ত্র্যণুকের উৎপত্তি হয়। এইরূপে চতুরণুক ইত্যাদি ক্রমে মহাবায়ুর উৎপত্তি হয়। তাহার পর বায়ুতে জল পরমাণুতে কর্মের উৎপত্তি হয় এবং দ্ব্যণুকাদি ক্রমে মহাজলরাশির উৎপত্তি হয়। অতঃপর সেই মহাজলরাশিতে পৃথিবী পরমাণু হইতে দ্ব্যণুকাদি ক্রমে মহাপৃথিবীর উৎপত্তি হয়। সেই জলেই আবার তেজ পরমাণু হইতে মহাতেজোরাশির উৎপত্তি হয়। এইরূপে সমুৎপন্ন চারিটি মহাভূত হইতে পরমেশ্বরের ইচ্ছামাত্রে পার্থিবাদি পরমাণু-সহকৃত তৈজস অণু হইতে মহানদণ্ডের উৎপত্তি হয়। তাহাতে চতুর্বদন, অতিশয় জ্ঞান, ঐশ্বর্য, বৈরাগ্যসম্পন্ন, সর্বপ্রাণীর কর্ম-বিপাক-সুজ্ঞাত, সকললোক-পিতামহ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়া প্রজাসৃষ্টির কার্যে নিযুক্ত হন।

সৃষ্টি-বিধি।

ইহাই ন্যায়দর্শনে সংসার-মহীরুহের বীজ কি এই প্রশ্নের উত্তর। সহজেই বুঝা যায় যে, এই উত্তর সর্ববাদিসিদ্ধ নহে। বিচারমুখে ইহাকে স্থাপন করা প্রয়োজন। ন্যায়াচার্যগণ কিভাবে তাহা করিয়া থাকেন, তাহা আমরা পরবর্তী কয়েকটি অধ্যায়ে আলোচনা করিয়া দেখিব।

আকর-গ্রন্থপঞ্জী

(ক) সমবায় সম্বন্ধ— ভাষা পরিচ্ছেদ, একাদশ কারিকা মুক্তাবলী সহ।

(খ) অবয়ব ও অবয়বী—(১) ন্যায়সূত্র— ২. ১. ৩৩— ২. ১. ৩৬ এবং ৪. ২. ৪— ৪. ২. ১৫— ভাষ্য, বার্তিক, টীকা এবং ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের টিপ্পনী সহ।

(২) ন্যায়লীলাবতী (চৌখাম্বা সংস্করণ)—পৃ., ১২০—১৩১ কণ্ঠাভরণ, প্রকাশ ও প্রকাশবিবৃতি সহ।

(৩) ভাষা পরিচ্ছেদ—৩৭, দিনকরী, রামরুদ্রী ও শ্রীপঞ্চানন শাস্ত্রিকৃত মুক্তাবলী-সংগ্রহ সহ।

(গ) ত্রিবিধ কারণতা—ভাষা পরিচ্ছেদ ১৬—১৮, দিনকরী, রামরুদ্রী ও মুক্তাবলী-সংগ্রহ সহ।

(ঘ) সৃষ্টি-বিধি—প্রশস্তভাষ্য।

প্রথম খণ্ড। দ্বিতীয় অধ্যায়

কার্য ও কারণ

ঈশ্বরকে জগতের নিমিত্ত কারণ বলিতে কি বুঝা হয়, তাহা আমরা দেখিয়াছি। এখন ন্যায়াচার্যগণ কিরূপে বিচারমুখে ঈশ্বরের নিমিত্ত কারণতা স্থাপন করেন, তাহা দেখা যাউক। একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায় যে, ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ, এই কথাটি প্রমাণ করিতে হইলে ন্যায়াচার্যগণকে আরও অনেক কথাই প্রমাণ করিতে হইবে। যেমন ন্যায়াচার্যগণকে প্রথমে দেখাইতে হইবে যে, বিনা কারণে কিছুই হইতে পারে না। কেননা অকস্মাৎ বা অকারণে যদি কিছু হইতে পারে, তাহা হইলে জগৎও যে অকস্মাৎ বা এমনিই ঘটিয়াছে, অর্থাৎ ঈশ্বর নামক কারণ জন্য হয় নাই, তাহা বলিতে পারা যাইবে। অতএব ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ, ইহা প্রমাণ করিতে হইলে প্রথমেই প্রমাণ করিতে হইবে যে, অকস্মাৎ, বা নির্নিমিত্তক কিছু হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, প্রমাণ করা প্রয়োজন যে, জগৎ এমন একটি পদার্থ যে ইহার উপপত্তির জন্য কোন না কোন কারণ কল্পনা করিতে হইবেই। কেননা, কার্যমাত্রই যদিও কারণ জন্যই হইয়া থাকে তথাপি জগৎ যদি কোন কার্য না হয়, বা যেরূপ পদার্থ কারণ-সাপেক্ষ সেইরূপ কোন পদার্থ না হয়, তাহা হইলে ইহার উপপত্তির জন্য কোন কারণ, তথা ঈশ্বর নামক নিমিত্ত কারণ কল্পনারও কোন প্রয়োজন থাকে না। অতএব, ন্যায়াচার্যগণকে দ্বিতীয়তঃ দেখাইতে হইবে যে, জগৎ একটি কার্যপদার্থ। তৃতীয়তঃ ন্যায়াচার্যগণকে দেখাইতে হইবে যে, এই কারণ ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কিছুই হইতে পারে না। কেননা, ইহা যদি স্বীকারও করা যায় যে, কার্যমাত্রই কারণ-সাপেক্ষ, এবং জগৎ একটি কার্য, তথাপি ইহা প্রমাণিত হয় না যে, জগতের আকাঙ্ক্ষিত কারণ ঈশ্বর। এই আকাঙ্ক্ষিত কারণ কোন অচেতন ও লৌকিক জড় পদার্থ, অথবা সাংখ্য কল্পিত প্রকৃতি অথবা বেদান্ত কল্পিত ব্রহ্মও হইতে পারে। অতএব ন্যায়াচার্যগণকে তৃতীয়তঃ দেখাইতে হইবে যে, এই জগতের উপপত্তির জন্য অলৌকিক হেতুই কল্পনা করিতে হইবে, এবং এই অলৌকিক হেতু সাংখ্য কল্পিত প্রকৃতি, বা বেদান্ত কল্পিত ব্রহ্ম নহে। চতুর্থতঃ, ন্যায়াচার্যগণেক

ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ, ইহা প্রমাণ করিতে হইলে আরও প্রমাণ করিতে হয়:
(১) উৎপন্ন পদার্থ বা কার্যপদার্থ মাত্রই কারণ-সাপেক্ষ।
(২) জগৎ একটি কার্য।
(৩) ইহার কারণ ঈশ্বর।

দেখাইতে হইবে যে, ঈশ্বর নিমিত্ত কারণই— অন্য কোনরূপ কারণতা তাঁহার নাই। অর্থাৎ, যদি পরমাণুবাদ না মানা যায় তাহা হইলে, কুম্ভকার যেরূপ মৃত্তিকা হইতে ঘট নির্মাণ করেন, ঈশ্বরও সেইরূপ চারি প্রকার পরমাণু হইতে এই জগৎ নির্মাণ করেন, এই কথার কোনও অর্থ থাকে না। অতএব ন্যায়াচার্যগণকে চতুর্থতঃ দেখাইতে হইবে যে, পরমাণুবাদ বিচারসিদ্ধ এবং সেইজন্য ঈশ্বর কেবল নিমিত্ত কারণই হইতে পারেন। সংক্ষেপে, ন্যায়াচার্যগণকে ঈশ্বর জগতের নিমিত্তকারণ এই কথাটি প্রমাণ করিতে হইলে প্রমাণ করিতে হইবে যে, অকস্মাৎ কিছুই হইতে পারে না, জগৎও অকস্মাৎ না হইয়া কোনও কারণ জন্যই হইয়াছে, এই কারণ অলৌকিক এবং সাংখ্য-সম্মত প্রকৃতি বা বেদান্ত-সম্মত ব্রহ্ম নহে, এবং পরমাণুবাদ যেহেতু বিচারসিদ্ধ সেই হেতু এই অলৌকিক হেতু অর্থাৎ ঈশ্বর নিমিত্ত কারণই।

এবং (৪) পরমাণু জগতের সমবায়ী কারণ বলিয়া ঈশ্বর নিমিত্ত কারণই।

ঈশ্বর জগতের নিমিত্তকারণ—এই কথাটি প্রমাণ করিতে চাহিলে ন্যায়াচার্যগণকে আরও কি কি প্রমাণ করিতে হইবে তাহা আমরা দেখিলাম। এখন, তাঁহারা কিভাবে এই সকল কথা প্রমাণ করেন তাহা দেখিবার চেষ্টা করা যাউক।

অকস্মাৎ, বা বিনা কারণে, কিছুই হইতে পারে না, ইহা প্রায় সকলেই বিশ্বাস করিয়া থাকেন।[১] এই বিশ্বাস এমনই সহজ, ব্যাপক ও গভীর যে, ইহা যে ভ্রান্ত হইতে পারে বা ইহার সত্যতা যে প্রমাণিত হওয়া প্রয়োজন, ইহাও অনেকে কল্পনা করিতে পারেন না। সত্য কথা বলিতে কি, অনেক দার্শনিকই এই বিশ্বাস যে সহজতঃ বা স্বতঃসিদ্ধভাবে সত্য তাহা বলিয়া থাকেন। কিন্তু এই সকল দার্শনিকদের কথা মানিতে পারা যায় না। কারণ, অনেক দার্শনিকই ইহার যে প্রমাণ প্রয়োজন তাহা বলিয়া থাকেন। শুধু তাহাই নহে। এমনও অনেক দার্শনিক আছেন যাঁহারা এই বিশ্বাস যে ভ্রান্ত বা ইহাকে সত্য বলিয়া মনে করিবার যে

বিনা কারণে যে কিছুই হইতে পারে না, ইহা অনেকে স্বীকার করেন না।

১। কার্যকারণ-তত্ত্ব লইয়া পাশ্চাত্য দর্শনে বহু বিচার হইয়াছে। এমন কি ইহা যদি বলা যায় যে, ভারতীয় দর্শনে এরূপ আলোচনা হয় নাই তাহা হইলে যে অসত্য ভাষণ দোষ ঘটে তাহা মনে হয় না। বস্তুতঃ, বিজ্ঞানকে কেন্দ্র করিয়া যে দর্শন গড়িয়া উঠে সেই দর্শনে, লোকব্যবহার ও ঈশ্বর-চেতনাকে কেন্দ্র করিয়া যে দর্শন গড়িয়া উঠে, তাহা হইতে কার্যকারণ তত্ত্বের অধিক বিচার থাকিবেই। যাহাই হউক, এই গ্রন্থে কার্যকারণ-তত্ত্ব বিচার কালে পাশ্চাত্য দর্শনের ছাত্রের কথা বিশেষভাবে মনে রাখা হইয়াছে। অকারণতাবাদরূপ পূর্বপক্ষ পাশ্চাত্য দর্শনের সাহায্যেই স্থাপন করা হইয়াছে এবং ইহার ন্যায়সম্মত খণ্ডনও এই উদ্দেশ্যে কিঞ্চিৎ সাহসের সহিত একটু বিশেষভাবে লেখা হইয়াছে।

কোন হেতু নাই, তাহা বলিয়া থাকেন। অতএব আমরা এই বিশ্বাসকে বিনা বিচারে সত্য বলিয়া মনে করিতে পারি না। কিন্তু বিচার করিয়াই কি পারি? আমরা এইমাত্র বলিলাম যে, কেহ কেহ এই বিশ্বাসকে অসত্য বা নিষ্প্রমাণ বলিয়া মনে করেন। এখন এই সকল দার্শনিকের কথা লইয়া কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক।

অকস্মাৎ যে কিছু হইতে পারে ইহা কেহ কেহ অস্বীকার করেন না। তবে অকস্মাৎ বলিতে কেহ বা অকারণে বুঝেন, আবার কেহ বা নির্নিমিত্তক বুঝেন।

ইঁহাদের আমরা আকস্মিকতা-বাদী বা নির্নিমিত্ততাবাদী বলিতে পারি।

অর্থাৎ অকস্মাৎ কিছু হইতে পারে ইহার দ্বারা কেহ কেহ বুঝাইতে চাহেন যে, উৎপাদনশীল পদার্থের উপপত্তির জন্য কোনও কারণ কল্পনা যে করিতেই হইবে এমন কোন কথা নাই। এই পক্ষকে আমরা অকারণতা-পক্ষ বা আকস্মিকতা-পক্ষ আখ্যা দিতে পারি। আবার, এমনও অনেক দার্শনিক আছেন যাঁহারা অকারণে যে কিছু হয় তাহা বলেন না, তবে নির্নিমিত্তক যে কিছু হইতে পারে তাহা অস্বীকার করেন না। এই সম্প্রদায়ের দার্শনিক-দের মতে কণ্টকের তীক্ষ্ণতা, পার্বত্য ধাতুসমূহের চিত্রতা, প্রস্তরের কাঠিন্য প্রভৃতি পদার্থের প্রত্যক্ষসিদ্ধ উপাদান বা সমবায়ী কারণ স্বীকার্য। কিন্তু ইহাদের কোন নিমিত্তকারণ প্রত্যক্ষসিদ্ধ না হওয়ায় স্বীকার্য নহে। আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা এই পক্ষকে নির্নিমিত্ততা-পক্ষ আখ্যা দিব।

আকস্মিকতাবাদ ও নির্নিমিত্ততাবাদ

কার্য কথাটি এমনই যে, বিনা আয়াসে ইহা কারণ কথাটিকে টানিয়া আনে এবং সেইজন্যই আমরা কোন পদার্থকে একবার যদি কার্য বলিয়া অভিহিত করি, তাহা হইলে যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা কোন কিছুকে তাহার কারণ বলিয়া দেখাইতে পারি, ততক্ষণ পর্যন্ত হাঁফ ছাড়িতে পারি না। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, কোন পদার্থকে কার্য আখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন কি? আমরা ত' প্রকৃতপক্ষে কোন কার্য প্রত্যক্ষ করি না। আমরা ঘট দেখি, পট দেখি, কুম্ভকার দেখি, তন্তুবায় দেখি, 'কপাল' দেখি, সূতা দেখি। কিন্তু ইহাদের কাহারও গাত্রে কি কার্য অথবা কারণ কথাটি লেখা আছে? অবশ্যই নাই। সকল প্রকার সংস্কারমুক্ত মন, বা যে মন কোনও বিশেষ দার্শনিক মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয় নাই সেই মনের সাহায্যে আমরা যখন আমাদের এই দৃশ্যজগৎকে অবলোকন করি, তখন

আকস্মিকতাবাদরূপ পূর্বপক্ষ

পদার্থ-প্রবাহ স্বীকার করা যায়, কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে কার্য-কারণ সম্বন্ধ আছে তাহা স্বীকার করা যায় না।

সত্য কথা বলিতে কি, আমরা কোথাও কার্য অথবা কারণ পাই না। আমরা যাহা পাই তাহা হইল উৎপাদ-বিনাশশীল পদার্থ-প্রবাহ। তাহার পর অবশ্য আমরা এই পদার্থ-প্রবাহের কোনটিকে কার্য বলি, আবার কোনটিকে কারণ বলি। কিন্তু এইরূপ বলিবার প্রয়োজন কি? ইহা ত' প্রকৃতপক্ষে আমাদের মনের কারিগরি বা ভাষার ছলনা। আমাদের মন বা বুদ্ধি এমনই যে, এই অনিত্য পদার্থ-প্রবাহকে পদার্থ-প্রবাহমাত্র বলিয়া স্থির থাকিতে পারে না। তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে চাহে। তাহাদের কোন্‌টি কার্য এবং কোন্‌টি কারণ তাহা নির্ণয় করিতে চাহে। এইরূপ চাওয়া যে কিছুটা ব্যবহারের তাগিদে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আবার, এইরূপ সম্বন্ধ-নির্ণয়ের ফলে যে ব্যবহারিক জীবনে অনেক উপকার পাওয়া যায় তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু তাহার দ্বারা আমাদের বুদ্ধির এই কার্যের কোন দার্শনিক বা তাত্ত্বিক উৎকর্ষ প্রমাণিত হয় না। এইরূপ আচরণের দ্বারা ইহা যে সত্যকে বিকৃত বা কলুষিত করিতেছে না, তাহাও বুঝা যায় না। বস্তুতঃ, আমাদের বুদ্ধির এই স্বাভাবিক আচরণ যে, ইহার কোনও স্বাভাবিক ত্রুটি বা দুর্বলতার জন্যই এইরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকিয়াই যায়। আমরা কল্পনা করিতে পারি যে, আমাদের বুদ্ধি এইরূপে কার্য করিলেও সুর, অসুর, কিম্পুরুষ, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর প্রভৃতির বুদ্ধি হয়ত এইরূপে কার্য করে না। সুতরাং আমরা সকলেই কারণানুসন্ধান করি বা আমাদের বুদ্ধির কারণানুসন্ধান না করিলে চলে না ইত্যাদি বলিয়া অনুভবসিদ্ধ উৎপাদ-বিনাশশীল পদার্থগুলিকে যে কার্য আখ্যা দিব এবং তাহারা যে কোন না কোন কারণ জন্য বা অকস্মাৎ ঘটে নাই ইত্যাদি বলিব তাহা হইবে না। এইরূপ আমাদের ভাষায় কার্য ও কারণ বলিয়া দুইটি শব্দ আছে এবং আমরা তাহাদের ব্যবহারও করি। শুধু তাহাই নহে, তাহাদের প্রয়োগ না করিয়া আমরা শান্তি পাই না। কিন্তু তাহার দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় না যে, এই প্রয়োগের দ্বারা আমরা তাত্ত্বিক সত্য পাই। সকল সভ্য ভাষাতেই এই শব্দ দুইটি রহিয়াছে ইহা বলিলেও নিস্তার নাই। কারণ কোন প্রচলিত ভাষারই তাত্ত্বিক সত্য নির্ণয়ের জন্য উদ্ভব হয় নাই। ব্যবহারের তাগিদে বা জীবন সংগ্রামে জয়ী হইবার চেষ্টার ফলেই তাহাদের উদ্ভব হইয়াছে। সুতরাং সকল প্রচলিত ভাষাতেই কার্য ও কারণ শব্দ দুইটি রহিয়াছে, এবং তাহাদের প্রয়োগ না করিলে ভাষা ব্যবহারই করা যায় না, ইত্যাদি বলিয়া আমরা যে কোন কিছুই বিনা কারণে ঘটে না ইহা বলিব, তাহা হইবে না।

কার্য অথবা কারণরূপে না বুঝিলে আমাদের বুদ্ধি শান্তি পায় না, এই যুক্তি অচল।

কার্য ও কারণ শব্দ ব্যবহার না করিলে মূক হইয়া যাইতে হয়, এই যুক্তিও অচল।

সত্য কথা বলিতে কি, আমরা চেষ্টা করিলে এমনও ভাষার সৃষ্টি করিতে পারি যাহাতে কার্য ও কারণ, বা তাহাদের তুল্য কোন শব্দ থাকিবে না। অনেক দার্শনিক এইরূপ অলোকায়ত ভাষা সৃষ্টি করিতেছেন। ইহাতে তাঁহারা কতদূর কৃতকার্য হইয়াছেন সে আলোচনা নিষ্ফল। তাঁহারা যদি কৃতকার্য নাও হন, বা ঐরূপ আদর্শ ভাষা আমরা যদি কোন দিন নির্মাণ নাও করিতে পারি তাহা হইলেও ইহা বলা চলিবে না যে, কোন কিছুকে যখন আমরা কার্য অথবা কারণ আখ্যা দিই তখন ঠিক কাজই করি। সংক্ষেপে, পারমার্থিক সত্য বা বস্তুস্থিতি নির্ণয় করিতে হইলে আমাদের বুদ্ধি বা ভাষার মায়াজাল ছিন্ন করিতে হইবে। বুদ্ধি কোন কিছুকে কার্য বা কারণ বলিয়া না বুঝিয়া পারে না, বা কার্য ও কারণ শব্দ ব্যবহার না করিলে আমাদের মূক হইয়া যাইতে হয়, ইত্যাদি যুক্তিবলে আমরা যে যাহা ঘটে, তাহা কোন না কোন কারণ জন্যই ঘটে, ইহা বলিব তাহা হইবে না। অকস্মাৎ কিছুই ঘটে না, এই বাক্য নিষ্প্রমাণ।

অতএব অকস্মাৎ কিছু ঘটে না, এই বাক্য নিষ্প্রমাণ

আকস্মিকতাবাদীর কথা আমরা শুনিলাম। এখন এইরূপ কথার উত্তরে কি বলিতে পারা যায়, বা ন্যায়াচার্যগণ কিরূপে আকস্মিকতা পক্ষ খণ্ডন করেন তাহা দেখা যাউক। আকস্মিকতাবাদীর বিরুদ্ধে ন্যায়াচার্যগণের মোট কথা হইল এই যে, উৎপাদ বিনাশশীল পদার্থগুলি কারণ বলেই উৎপাদ বিনাশশীল। কোন কিছু যে কাদাচিৎক, অর্থাৎ উৎপন্ন এবং বিনষ্ট হয় ইহাই কোনও কিছুই যে অকস্মাৎ ঘটিতে পারে না, তাহা প্রমাণ করে। উৎপাদ বিনাশশীল পদার্থ-প্রবাহ স্বীকার করিব, কিন্তু কার্যকারণ মানিব না, ইহা হইবে না। কথাটিকে একটু খুলিয়া বলিতে হয়। কোন পদার্থের গাত্রে যে কার্য অথবা কারণ কথাটি লেখা থাকে না, তাহা ঠিক (কাহার গাত্রেই বা কি লেখা থাকে?) কিন্তু সেইজন্য কোন কিছুকে কার্য অথবা কারণ বলিলে মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যায় না। কেননা, আমরা সকলেই কাদাচিৎক পদার্থ, বা অনিয়ত-কালবৃত্তি পদার্থ, অনুভব করিয়া থাকি। আমরা এই দেখিলাম ঘট নাই; তাহার পর দেখিলাম ঘট হইল এবং তাহার আরও কিছুকাল পরে দেখিলাম ঘটটি বিনষ্ট হইল। এইরূপ সূতিকাগৃহে দেখিতেছি যে শিশু জন্মাইতেছে, আবার শ্মশানে দেখিতেছি যে নরদেহ ভস্মীভূত হইতেছে। এই দেখিলাম যে তুমি মুখখানিকে শ্রাবণের মহামেঘের মত করিয়া ঘরে ঢুকিলে, এবং তাহার পরেই

আকস্মিকতাবাদ খণ্ডন

কার্য বলিতে কাদাচিৎক পদার্থই বুঝা হয়, সুতরাং উৎপাদবিনাশশীল পদার্থের স্বীকৃতিই কার্যকারণ তত্ত্বের যাথার্থ্যের স্বীকৃত।

দেখিলাম যে কফির উষ্ণ পেয়ালা দেখিবামাত্র মুখমণ্ডলকে এমন করিলে যে শরতের প্রভাত তপন লজ্জা পায়। এই দৃশ্য জগতে ছিল না, হইল, তাহার পর আবার থাকিল না, এইরূপ পদার্থ আমরা সর্বদাই দেখিতেছি। অতএব, এই জগৎ যে কাদাচিৎক পদার্থে পূর্ণ তাহা কেহই, অন্ততঃপক্ষে আকস্মিকতাবাদীরা, অস্বীকার করিতে পারিবেন না। এখন, ন্যায়াচার্যগণ বলিয়া থাকেন যে, কার্য শব্দটির অর্থই হইল কাদাচিৎক পদার্থ। সুতরাং কার্য বলিয়া কোনও কিছুকেই ডাকিব না, ভাষা হইতে কার্য শব্দটিকে নির্বাসিত করিব, ইত্যাদি কথার কোনও অর্থ নাই। অর্থাৎ এই বিশ্বে বহু কাদাচিৎক পদার্থ আছে। হয়, হইয়া কিছুকাল থাকে, এবং তাহার পর আবার থাকে না, এইরূপ পদার্থ আমরা সকলেই অনুভব করিয়া থাকি। অতএব আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে এই পদার্থগুলি পূর্ববর্তী-পদার্থ-শূন্য-পদার্থ কিনা, এবং যদি তাহাদের পূর্ববর্তী পদার্থ থাকে তাহা হইলে তাহাদের পূর্ববর্তী পদার্থগুলির মধ্য হইতে কাহাকেও নিয়ত পূর্ববর্তী বলা যায় কিনা। যেমন আমার এই কাপড়টি। ইহা সত্য যে, এমন একদিন ছিল যখন ইহা ছিল না। আবার ইহাও সত্য যে, এমন একদিন আসিবে যেদিন ইহা থাকিবে না। অতএব আমার এই কাপড়টি যে একটি কাদাচিৎক পদার্থ তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, ইহার উৎপত্তির পূর্বে কি কোন পদার্থ থাকে না? ইহা কি একটি পূর্ববর্তী-পদার্থ-শূন্য-পদার্থ? অবশ্যই নহে। কাপড়ই বলি, আর টেবিলই বলি বা চেয়ারই বলি বা যে কোন উৎপাদবিনাশশীল পদার্থই বলি, ইহারা কেহই পূর্ববর্তী-পদার্থ-শূন্য-পদার্থ নহে। ইহাদের প্রত্যেকেরই উৎপত্তির অব্যবহিত পূর্বকালে এক বা একাধিক পদার্থ থাকে। কোন একটি পদার্থ উৎপন্ন হইতেছে অথচ তাহার উৎপত্তির অব্যবহিত পূর্বকালে কোন পদার্থ থাকিতেছে না, ইহা আমরা কেহ কখনও দেখি নাই। সুতরাং দেখিবার আশাও রাখিতে পারি না। সংক্ষেপে, এই দৃশ্যজগৎ অসংখ্য কাদাচিৎক পদার্থে পূর্ণ এবং ইহারা কেহই পূর্ববর্তী-পদার্থ-শূন্য-পদার্থ নহে। প্রত্যেকটি কাদাচিৎক পদার্থের পূর্বেই যে বহু কাদাচিৎক পদার্থ রহিয়াছে, ইহা আমরা সহজ অনুভবেই পাইয়া থাকি। ঘটের পূর্বে কুম্ভকার থাকে, কপাল থাকে, দণ্ড থাকে, চক্র থাকে এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে কুম্ভকার গৃহিণীর নথ নাড়াও থাকে। এইরূপ পটের ক্ষেত্রে তন্তু থাকে, তুরী থাকে, তন্তুবায় থাকে এবং আরও অনেক কিছুই থাকে। যেমন, বস্ত্রখণ্ডটি যদি জগদীশ্বর তুল্য দিল্লীশ্বরের জন্য নির্মিত হয়, তাহা হইলে তন্তুবায়ের হৃদয়ে ভয় থাকে, লোভ থাকে, দুশ্চিন্তা থাকে ইত্যাদি। আবার বস্ত্রখণ্ডটি যদি কোনও তরুণ তন্তুবায় কোনও বিশেষ তরুণীর

এই বিশ্বে বহু কাদাচিৎক পদার্থ আছে এবং তাহারা পূর্ববর্তী-পদার্থ-শূন্য-পদার্থ নহে।

উদ্দেশ্যে তৈয়ারী করিতে থাকে, তাহা হইলে তাহার হৃদয়ে এমন একটি পদার্থ থাকে যাহাকে না পারা যায় বুঝিতে, না পারা যায় প্রকাশ করিতে এবং 'তর্ক তারে পরিহাসে মর্ম তারে সত্য বলি জানে'। অতএব ইহা বলিতে পারা যায় যে, প্রত্যেকটি কাদাচিৎক পদার্থের উৎপত্তির পূর্বে অনেক কাদাচিৎক পদার্থ থাকে। বস্তুতঃ, ইহা না বলিলে চলে না। বিশ্বে যে কেবল একটি কাদাচিৎক পদার্থ আছে বা ছিল বা হইবে ইহা বলা কাহারও ইষ্ট নহে। শুধু তাহাই নহে। প্রত্যেকটি কাদাচিৎক পদার্থের উৎপত্তির অব্যবহিত পূর্বক্ষণে যে অনেক কাদাচিৎক পদার্থ থাকে, ইহা অস্বীকার করিবার হেতুই বা কোথায়, আর অস্বীকার করিবই বা কেন ? অতএব কেবল কাদাচিৎক পদার্থই নহে, এইরূপ পদার্থপরম্পরাও আমাদের অনুভবসিদ্ধ।

শুধু তাহাই নহে, তাহাদের নিয়ত পূর্ববর্তী পদার্থও আছে।

তাহা হইলে দেখা গেল যে, এই জগতে অসংখ্য কাদাচিৎক পদার্থ আছে এবং তাহাদের প্রত্যেকেরই পূর্বভাবী কাদাচিৎক পদার্থ আছে। এখন আমাদের বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে, এই সকল কাদাচিৎক পদার্থের কেবল পূর্বভাবী পদার্থই আছে, না নিয়ত পূর্বভাবী পদার্থও আছে। এই বিচার করিতে হইলে নিয়ত পূর্বভাবী পদার্থ বলিতে কি বুঝা হয় তাহা দেখিতে হয়। কোনও পূর্বভাবীকে নিয়ত পূর্বভাবী বলার অর্থ হইল এই যে, যখনই কোন পরভাবী পদার্থের উৎপত্তি হয় তখনই, অর্থাৎ উৎপত্তি ক্ষণের অব্যবহিত পূর্বক্ষণে এই পূর্বভাবী পদার্থটি থাকে এবং যখন ইহা থাকে না তখন পরভাবী পদার্থটির উৎপত্তি হয় না। যেমন, বহ্নিকে ধূমের নিয়ত পূর্বভাবী বলা হয়। কারণ, যখনই ধূমের উৎপত্তি হয়, তখনই বহ্নিকে থাকিতে দেখা যায় বা বহ্নির অভাব দেখা যায় না, এবং যখন বহ্নির অভাব থাকে, তখন ধূমেরও যে অভাব থাকে, তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। ধূমযুক্ত কালের পূর্বকাল বহ্নিশূন্য নহে বলিয়া এবং বহ্নিশূন্য কালের উত্তরকাল ধূমশূন্যও বটে বলিয়া বহ্নি ধূমের নিয়ত পূর্বভাবী। অতএব অনুভবসিদ্ধ কাদাচিৎক পদার্থগুলির নিয়ত পূর্বভাবী পদার্থ আছে কিনা তাহা দেখিতে হইলে দেখিতে হয় যে যখন কোন কাদাচিৎক পদার্থ উৎপন্ন হয়, তখন তাহার পূর্ববর্তীদের মধ্যে এমন কোন পদার্থ থাকে কিনা, যাহার সমজাতীয় অন্য ব্যক্তি পদার্থ যখনই উৎপন্ন পদার্থটির সমজাতীয় অন্য ব্যক্তি পদার্থ উৎপন্ন হয় তখনই থাকে, এবং যাহার সমজাতীয় কোনও ব্যক্তি পদার্থ যখনই থাকে না, তখনই উৎপন্ন পদার্থটির সমজাতীয় কোন ব্যক্তি পদার্থ উৎপন্ন হয় না। মনে করা যাউক যে ক$_1$ একটি উৎপন্ন পদার্থ, এবং অ$_1$, আ$_1$, ই$_1$, এবং ঈ$_1$ ইহার পূর্ববর্তী পদার্থ। এখন

আমাদের বিচার্য বিষয় এই যে, এই পূর্ববর্তী পদার্থগুলির মধ্যে এমন কেহ আছে কিনা যাহার সমজাতীয় অন্যব্যক্তি পদার্থ, যখনই ক জাতীয় অন্য ব্যক্তি পদার্থ, যেমন $ক_{২}$, বা $ক_{৩}$, উৎপন্ন হয় তখনই থাকে। মনে করা যাউক যে, অন্যদেশে, অন্যকালে, বা অন্যদেশকালে $ক_{২}$ ঘটিল, এবং দেখা গেল যে $খ_{২}$ রহিয়াছে, যদিও $আ_{২}$ $ই_{২}$ প্রভৃতি নাই। $ক_{৩}$, $ক_{৪}$ প্রভৃতির ক্ষেত্রেও এইরূপ দেখা গেল। এবং তাহার পর আরও দেখা গেল যে অ-জাতীয় কোনও ব্যক্তি যখন উপস্থিত থাকে না, তখন ক-জাতীয় কোন ব্যক্তি উৎপন্ন হয় না। ইহা হইতে আমরা বলিতে পারি যে, অ-জাতীয় ব্যক্তিগুলি, বা অ, ক-জাতীয় ব্যক্তিগুলির, বা ক-র নিয়ত পূর্বভাবী, বা অ ক-এর কারণ। এখন প্রশ্ন এই যে, অ ও ক-র মধ্যে যেরূপ সম্বন্ধের কথা বলিলাম, সেইরূপ সম্বন্ধ কাদাচিৎক পদার্থগুলির মধ্যে আছে কিনা? এইরূপ প্রশ্নের সহজ উত্তর হইল, আছে। কারণ, আমাদের অনুভবই আমাদের বলিয়া দেয় যে কুম্ভকার ও ঘট, বা তন্তুবায় ও পট, বা বহ্নি ও ধূমের মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধ রহিয়াছে। ইহা কি সত্য নহে যে, আমরা যখনই কোন পট ব্যক্তিকে উৎপন্ন হইতে দেখি তখনই সূতা, মাকু, তন্তুবায় প্রভৃতিকে দেখি? এইরূপ ইহাও কি সত্য নহে যে আমরা যখনই কোন ঘট ব্যক্তিকে উৎপন্ন হইতে দেখি, তখনই কপাল, কুম্ভকার প্রভৃতিকে দেখি। অতএব, আমরা কপাল, কুম্ভকার প্রভৃতিকে ঘটের নিয়ত পূর্বভাবী বলিব না কেন? বা সূতা, তন্তুবায় প্রভৃতিকেই বা পটের নিয়ত পূর্বভাবী বলিব না কেন?

কুম্ভকার ঘটের নিয়ত পূর্বভাবী এবং তন্তুবায় পটের।

এইরূপ প্রশ্ন শুনিয়া আকস্মিকতাবাদী অবশ্য প্রতিপ্রশ্ন করিবেন, বলিবই বা কেন? ইহা অবশ্য সত্য যে, তুমি যতগুলি ঘটকে উৎপন্ন হইতে দেখিয়াছ, তাহাদের প্রত্যেকটিরই উৎপত্তির অব্যবহিত পূর্বক্ষণে মৃত্তিকা প্রভৃতি ছিল, এইরূপ আমিও দেখিয়াছি। কিন্তু আমরা ত' কেহ সকল ঘট দেখি নাই। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সকল ঘট কি আমরা কেহ দেখিতে পারি? অবশ্যই পারি না। তাহা যদি পারিতাম, তাহা হইলে আর শীর্ণদেহে, ম্লান আলোকে বসিয়া বসিয়া ন্যায়ের পুঁথি রচনা করিতাম না, সর্বজ্ঞ ঈশ্বর হইয়া গিয়া জগৎ রচনাই করিতাম। অতএব আমরা সকল ঘট, বা সকল পট, বা সকল ধূম দেখিতে পারি না এবং এইজন্যই কখনও জোর করিয়া বলিতে পারি না যে, মৃত্তিকা, বা তন্তু বা বহ্নি নিয়ত পূর্বভাবী। সুতরাং মৃত্তিকাকে কেন যে ঘটের নিয়ত পূর্বভাবী বলিব না, এই প্রশ্ন প্রশ্নই নহে। প্রকৃত প্রশ্ন হইল, ইহাকে নিয়ত পূর্বভাবী বলিব কেন?

আমরা কেহই সকল ঘট বা সকল পট দেখি নাই, সুতরাং এইরূপ কথা কি করিয়া বলি?

আকস্মিকতাবাদীর এইরূপ কথার উত্তরে ন্যায়াচার্যগণ বলিবেন যে, সকলের সম্বন্ধে কথা বলিতে হইলে যে সকলকেই দেখিতে হইবে এমন কোনও কথা নাই। একবারমাত্র দর্শন করিয়াই আমরা সকলের সম্বন্ধে কথা বলিতে পারি। যেমন, রান্নাঘরে ধূম দেখিলাম এবং আরও দেখিলাম যে ভিজা কাষ্ঠের সহিত অগ্নি সংযুক্ত হইতেছে এবং ধূম উৎপন্ন হইতেছে। ইহা হইতেই আমরা বলিতে পারি যে বহ্নি ধূমের নিয়ত পূর্বভাবী। এখন এই কথাটির সত্যতা সম্বন্ধে আমার বা তোমার বা কাহারও যদি সন্দেহ হয়, তাহা হইলে আমাদের আরও নিরীক্ষণ পরীক্ষণ করিতে হইবে। কিন্তু এই যে আরও নিরীক্ষণ বা ভূয়োদর্শন, তাহা সকল সম্পর্কে কথা বলিবার জন্য একান্ত আবশ্যক নহে।[২] একবার দর্শন করিয়া যদি কোন কথা বলা না যায় তাহা হইলে বহুবার দর্শন করিয়াও কোন কথা বলা যাইবে না। কারণ বহুবার দর্শন ত' প্রকৃতপক্ষে বহু একবার দর্শন। যাহাই হউক, সকলের সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার পর যখন কোন সংশয়ের সৃষ্টি হয়, যখন মনে আশঙ্কা জাগে যে, যাহাকে নিয়ত পূর্বভাবী বলিয়া মনে করা হইল তাহা হয়ত প্রকৃতপক্ষে নিয়ত পূর্বভাবী নহে, তখনই সেই সংশয় দূর করিবার জন্য, সেই আশঙ্কার নিবৃত্তির জন্য ভূয়োদর্শন করিতে হয়। ইহা অবশ্য সত্য যে, এইরূপ আশঙ্কা বা সংশয় প্রায়ই হইতে পারে। কিন্তু ইহা আরও সত্য যে, এই আশঙ্কার অবধি বা সীমা আছে। সত্য কথা বলিতে কি, আশঙ্কা করিতে চাহিলেই ত' আর আশঙ্কা করা যায় না। সংশয় করিব বলিয়াই কি আর সংশয় করা যায়? আশঙ্কা বা সংশয়ের উপযুক্ত-হেতু থাকা চাই। অমূলক আশঙ্কা কোন কাজেরই নহে —মানসিক ব্যধির পরিচায়ক মাত্র। অতএব, একবার মাত্র দর্শন করিয়াই আমরা সকলের সম্বন্ধে কথা বলিতে পারি, এবং সেইজন্য যতক্ষণ পর্যন্ত না কেহ দেখাইতে পারিতেছেন যে, মৃত্তিকাকে ঘটের নিয়ত পূর্বভাবী বলিয়া মনে করিবার কোন উপযুক্ত হেতু নাই, ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্তিকাকে ঘটের নিয়ত পূর্বভাবী বলিব না কেন এই প্রশ্ন করিবই।

সকলের সম্বন্ধে কথা বলিতে হইলে, সকলকে দেখার প্রয়োজন নাই।

একবার মাত্র দর্শন করিয়াই আমরা সকলের সম্পর্কে কথা বলিতে পারি।

এবং আমাদের এই কথার সত্যতা সম্পর্কে যদি কোন আশঙ্কা না জাগে বা নিরাস করিতে পারা যায় না এমন কোন সংশয় যদি না থাকে তাহা হইলে ইহাকে সত্য বলিয়াই মানিতে হইবে।

ইহা শুনিয়া হয়ত আকস্মিকতাবাদী বলিবেন যে, সবই বুঝিলাম, কিন্তু তথাপি

২। কথাটিকে প্রাভাকরদের মত বুঝিলে চলিবে না। এই বিষয়ে বিচার দ্বিতীয় খণ্ডে করা হইবে।

কিছুই মানিলাম না। কারণ, ইহা আমিও স্বীকার করি যে এক বা দুই বা আরও কিছু সংখ্যক দর্শনের পর আমরা সকলের সম্বন্ধে কথা বলিয়া ফেলি। কিন্তু আমার প্রশ্ন এই নহে যে আমরা এইরূপ করি কি না। আমাদের প্রকৃত প্রশ্ন হইল এই যে, এইরূপ করা উচিত কিনা বা আমরা এইরূপ করিয়া ঠিক কাজই করি কি না; অর্থাৎ দশবার যদি আমরা দেখি যে ধূমযুক্ত কালের অব্যবহিত পূর্বকালে বহ্নি রহিয়াছে তাহা হইলে যে আমরা মনে মনে ধূম ও বহ্নিকে বাঁধিয়া ফেলি বা একত্র দেখিতে অভ্যস্ত হই ইহা সত্য। কিন্তু এইরূপে আমরা তাহাদের মনে মনে বাঁধি বলিয়াই যে বস্তুস্থিতিতে বা আসল জগতেও তাহারা বাঁধা আছে, তাহা তোমাকে কে বলিল? অতএব, একটি দর্শন হইতে সকল সম্পর্কে কথা বলা আমাদের স্বভাব—কিন্তু স্বভাব যে আমাদের এই স্বভাবের সম্মান রক্ষা করিবে এবং আমরা মনে মনে দুইটি কাদাচিৎক পদার্থকে বাঁধিয়াছি বলিয়া বাঁধিয়া রাখিবে, এইরূপ মনে করার কোন সঙ্গত হেতু নাই।[৩]

কিন্তু ইহা কি আমাদের বুদ্ধির স্বাভাবিক দুর্বলতা নহে?

পূর্বপক্ষীর এইরূপ কথার উত্তরে ন্যায়াচার্যগণের বক্তব্য হইল এই যে বুদ্ধির উপর এইরূপ অনাস্থার কারণ কি? বুদ্ধি কি কোন নূতন সম্বন্ধ সৃষ্টি করিতে পারে? প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধি নিরাকার। তাহার কোন নিজস্ব আকার নাই। যাহাই তাহার জ্ঞানের বিষয় হয়, ইহা তাহারই আকার গ্রহণ করে। ঘটবুদ্ধি হইতে পটবুদ্ধিকে, তুমি ঘট ও পট, বুদ্ধির এই বিশেষণগুলির সাহায্যেই পৃথক করিতে পার। ঘটবুদ্ধি হইতে ঘটকে ত্যাগ বা উপেক্ষা করিয়া বুদ্ধিকে ধরিতে চাহিলে তুমি ব্যর্থ মনোরথই হইবে। তাই যে সকল সম্বন্ধ জ্ঞানে ভাসমান হয়, তাহারা সর্বথা জ্ঞানের সৃষ্টি হইতে পারে না। জ্ঞান ওলট পালট করিতে পারে, কিন্তু সম্পূর্ণ, সর্বথা নূতন কিছু তৈয়ারী করিতে পারে না। তাই প্রকৃতিতে পদার্থগুলির মধ্যে যদি সত্যসত্যই কোন সম্বন্ধ বা বন্ধন না থাকিত তাহা হইলে বুদ্ধি তাহাদের কোনরূপেই বাঁধিতে পারিত না। ঘট, পট প্রভৃতি সম্বন্ধীকে বুদ্ধি যেমন প্রকাশই করে, সৃষ্টি করে না, তেমনই তাহাদের সম্বন্ধকেও বুদ্ধি প্রকাশই করে সৃষ্টি করে না। ঘট যেমন ঘটবুদ্ধির আকার নহে, তাহার আকারের নিয়ামক, ঘটের সম্বন্ধও তেমনই তাহার বুদ্ধির আকার নহে, আকারের নিয়ামক মাত্র। তুমি যে বলিবে বুদ্ধি শশকের সহিত যখন বিষাণকে যোগ করিতে পারে, তখন অন্যান্য

বুদ্ধি নিরাকার বলিয়া একান্ত অলীককে বিষয় করিয়া পারে না।

৩। ইহাই হিউমের প্রকৃত বক্তব্য বলিয়া মনে হয়।

ক্ষেত্রেও যে তাহা করিতে পারে না তাহা কে বলিল, তাহা চলিবে না। কারণ শশক, বিষাণ, এবং যে সম্বন্ধে বুদ্ধি তাহাদের সম্বন্ধী বলিয়া বুঝিয়া থাকে সেই সম্বন্ধ যদি প্রসিদ্ধ পদার্থ না হইত, তাহা হইলে বুদ্ধি এইরূপ কার্য করিতে পারিত না। যেরূপ সম্বন্ধ আদপেই বস্তুস্থিতিতে নাই, সেইরূপ সম্বন্ধ বুদ্ধির পক্ষে তৈয়ারী করা সম্ভব নহে। বুদ্ধি কেবল খণ্ডশঃ প্রসিদ্ধ পদার্থগুলিকে জোড়াতালি দিয়া এমন কিছু তৈয়ার করিতে পারে যাহার অখণ্ড প্রসিদ্ধি নাই। ইহা দেখিয়া একথা মনে হওয়া অস্বাভাবিক নহে যে, বুদ্ধির ক্ষমতা অসীম। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধির ক্ষমতা অসীম নহে। তাই বস্তুস্থিতিতে পদার্থগুলির মধ্যে যদি কোন বন্ধন না থাকিত, তাহারা যদি টুক্‌রা টুক্‌রা ভাবে পরস্পরের সহিত একান্তভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিত, তাহা হইলে বুদ্ধির পক্ষে কোন কালেই তাহাদের বাঁধিবার যোগ্যতা থাকিত না। বস্তু-স্থিতিতে যেহেতু পদার্থগুলি সম্বদ্ধ, বুদ্ধিও সেইহেতু তাহাদের সম্বদ্ধ বলিয়া বুঝে। এইরূপ কথাকে যে তুমি অসমীচীন বলিবে, তাহা হইবে না। অর্থাৎ তুমি যে বলিবে যে, প্রকৃতিতে পদার্থগুলির মধ্যে সম্বন্ধ আছে, এই কথা নিষ্প্রমাণ, তাহা হইবে না। কারণ, সম্বন্ধ যে নাই, তাহা কেমন করিয়া বলি ? শশক-বিষাণ, গগন-কমলিনী প্রভৃতি দৃষ্টান্ত দৃষ্টান্তই নহে। তুমি শশক-বিষাণকে অলীক বলিয়া কি করিয়া বুঝিলে ? ইহার গাত্রে ত' আর অলীক কথাটি লেখা নাই? অতএব, তোমায় অবশ্যই বলিতে হইবে যে, ইহার কোন ব্যবহার নাই এবং সেইজন্যই ইহাকে অলীক বলি। সুতরাং মহিষ-বিষাণকে তুমি অলীক বলিতে পার না। মহিষ-বিষাণ ও শশক-বিষাণকে তুমি কি একই পর্যায়ে ফেলিতে পার ? গগন-কমল ও সরোজকে কি তুমি একরূপ অর্থ বলিতে পার ? অবশ্যই পার না। সকল পদার্থ অলীক হইলে, অলীক বলিয়া কিছুই থাকে না। যথার্থ বুদ্ধি যদি না হয়, অযথার্থ বুদ্ধিও হয় না। সকল বুদ্ধিই অযথার্থ এই বুদ্ধিটিকে অন্ততঃ যথার্থ হইতে হইবে। শুধু তাহা নহে। কোনও বুদ্ধিব্যক্তি যে অযথার্থ, তাহা অপর কোনও যথার্থ বুদ্ধির সাহায্যেই বুঝিতে হয়। রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি অযথার্থ, কারণ ঐ বুদ্ধি সর্পবুদ্ধির দ্বারা বাধিত হয়। সর্পবুদ্ধি যদি বাধিত না হইত বা ঐ বুদ্ধি জন্য ব্যবহার যদি কখনও বিফল না হইত, তাহা হইলে ঐ বুদ্ধি যে অযথার্থ তাহা বলা যাইত না। ঐ বুদ্ধিকে তুমি অযথার্থ এই জন্যই বলিতে পার যে, যথার্থ বুদ্ধিও তোমার আছে। এইরূপ শশক-বিষাণকে তুমি অলীক বলিতে পার কারণ তুমি জান যে গো-মহিষাদির যেমন বিষাণ আছে, ইহার তেমন নাই। বস্তুতঃ বিষাণ যদি গো মহিষ প্রভৃতি কোন প্রাণীর সত্যকার অবয়ব না হইত তাহা হইলে বুদ্ধির পক্ষে শশক-বিষাণ বুদ্ধিস্থ করা অসম্ভব হইত। বুদ্ধি উদোর পিণ্ড বুধোর স্কন্ধে চাপাইতে পারে ; কিন্তু উদোও যদি না থাকিত, পিণ্ডও

যদি না থাকিত এবং চাপাইবার যোগ্য পদার্থ না হইত, এবং বুধোর স্কন্ধও যদি না থাকিত এবং পিণ্ডের আশ্রয় হইবার যোগ্যতা যদি তাহার না থাকিত, তাহা হইলে বুদ্ধির পক্ষে উদোর পিণ্ড বুধোর স্কন্ধে চাপান সম্ভব হইত না। অতএব, বুদ্ধি যে মাঝে মাঝে বিগ্‌ড়াইয়া যায় বা যাহাদের মধ্যে বুদ্ধিস্থ সম্বন্ধ বস্তুস্থিতিতে নাই, তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধ বানাইয়া ফেলে, তাহা হইতে প্রমাণিত হয় না যে, ঐ সম্বন্ধ বুদ্ধি পুরাপুরি বানাইয়া থাকে। তুমি যে বলিবে যে, আমি ঘট, পট প্রভৃতিকে বুদ্ধি যে প্রকাশ করে তাহা স্বীকার করি, কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধগুলিকেও যে বুদ্ধি প্রকাশ করে তাহা স্বীকার করি না, তাহা হইবে না। কারণ ঘট, পট প্রভৃতিকে বুদ্ধি যে প্রকাশ করে তাহা তুমি কেমন করিয়া জানিলে? অবশ্যই যথার্থ বুদ্ধির বিষয় হয় বলিয়া, বা যেরূপ বুদ্ধি সমর্থ প্রবৃত্তির জনক হয় সেইরূপ বুদ্ধির বিষয় হয় বলিয়া। সেইরূপ তাহাদের সম্বন্ধ কি যথার্থ বুদ্ধির বিষয় হয় না? উপরন্তু, ঘট, পট প্রভৃতিকে বুদ্ধি কিভাবে প্রকাশ করে? ঘটকে কি বুদ্ধি ঘটত্ববিশিষ্ট, অর্থাৎ ঘটত্বের সমবায় সম্বন্ধে আশ্রয় বলিয়া প্রকাশ করে না? অতএব, ঘট যদি বুদ্ধির দ্বারা প্রকাশিত হয় এবং ঘটত্বও যদি বুদ্ধির দ্বারা প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে অবশ্যই সমবায় সম্বন্ধও বুদ্ধির দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে। সুতরাং বুদ্ধি প্রকৃতি হইতে বন্ধন রজ্জু সংগ্রহ করে, এবং দোষযুক্ত না হইলে, বা অতিশয় গুণযুক্ত হইলে প্রকৃতি যেরূপ রজ্জু দিয়া যেরূপ পদার্থকে বাঁধিয়াছেন, সেইরূপ রজ্জু দিয়া সেইরূপ পদার্থকেই বাঁধে। তবে মাঝে মাঝে ইহা দোষযুক্ত হইয়া যায় এবং তখনই ক-এর রজ্জু দিয়া খ-কে বাঁধে বা যে রজ্জু দ্বারা গ-ঘ প্রকৃতিতে বাঁধা আছে, সেই রজ্জু দ্বারা ঙ-চ কে বাঁধিয়া থাকে। অতএব, বুদ্ধির উপর অনাস্থা পোষণ করিবার কোন কারণ নাই। বুদ্ধিতে যে সম্বন্ধ ভাসমান হয় সেই সম্বন্ধ প্রকৃতিতেও আছে কি না, এইরূপ প্রশ্ন তুলিবারও কোন হেতু নাই। সুতরাং ইহা যদি স্বীকার কর যে, একবার দর্শন করিয়াই আমরা সকলের সম্বন্ধে কথা বলিতে পারি, তাহা হইলে তোমাকে আরও স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রতিকূল যুক্তি না থাকিলে বা বলিষ্ঠ সংশয় আশঙ্কা ইত্যাদি না থাকিলে এইরূপ করিয়া আমরা ঠিক কাজই করি। আরও দেখ, যখন কোনও একটি পদার্থকে আমরা দেখি, তখন কেবল কি আমরা ঐ ব্যক্তি পদার্থটিকেই দেখি? রান্নাঘরে যখন আমি কোনও ধুম ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি তখন কি কেবল ঐ ধুম ব্যক্তিটিকেই প্রত্যক্ষ করি? আমরা কি যাবৎ ধুমকে ঐ ধুমের সজাতীয়রূপে প্রত্যক্ষ করি না? ইহা অবশ্য সত্য যে, অন্যান্য ধুমের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য আমাদের রান্নাঘরের

কোনও একটি ক্ষেত্রে যখন কোন কিছুকে অপর কিছুর পরভাবী বলিয়া জানি, তখন এক অর্থে তাহাদের সকলকেই জানিয়া ফেলি।

ধুমব্যক্তিটির প্রত্যক্ষকালে প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না। কিন্তু ধুমত্ববিশিষ্টরূপে তাদের সকলেরই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। তাহা যদি না হইত, তাহা হইলে রান্নাঘরের বহ্নিকে রান্নাঘরের ধুমের পূর্বভাবী দেখিয়া অন্যান্য ধুম অন্যান্য বহ্নির পরভাবী কি না এই প্রশ্ন বা সংশয় উঠিতে পারিত না। যাহাই হউক, রান্নাঘরে বহ্নি যে ধুমের পূর্বভাবী, ইহা দেখিয়া আমরা বহ্নি সকল ধুমেরই পূর্বভাবী কি না এই প্রশ্ন করিতে পারি। শুধু তাহাই নহে, কোন বাধক বা প্রতিকূল যুক্তি না থাকিলে, আমরা ইহাও বলিতে পারি যে, ধুম মাত্রেরই বহ্নি পূর্বভাবী বা বহ্নি ধুমের নিয়ত পূর্বভাবী। অতএব, একবারমাত্র দর্শন করিয়া সকলের সম্বন্ধে কথা বলা মোটেই অযৌক্তিক নহে।

অতএব আশঙ্কা অমূলক।

এমন হয়ত আকস্মিকতাবাদী বলিতে পারেন যে, কোন অনিত্য পদার্থেরই কোন অনিত্য নিয়ত পূর্বভাবী পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় না। যেমন মৃত্যু। কখনও রোগ, কখনও শোক, কখনও তাপ, কখনও দুর্ঘটনা ইত্যাদি বহুবিধ পদার্থকে ইহার পূর্বভাবী পদার্থ বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়; এবং সেইজন্য মৃত্যু নামে যে সকল পদার্থকে ডাকিতে পারা যায়, তাহাদের কোন নিয়ত পূর্বভাবী পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় না।[8] এইরূপ বহ্নি। কখনও দেখা যায় যে, তৃণ সমবধান বিনাই মণি প্রভৃতির সমবধানে বহ্নি উৎপন্ন হইতেছে, আবার কখনও দেখা যায় যে, মণি প্রভৃতির সমবধান বিনাই তৃণ সমবধানে বহ্নি উৎপন্ন হইতেছে। অতএব, সকল বহ্নিরই যে কোন এক জাতীয় পদার্থ নিয়ত পূর্বভাবী, তাহা কেমন করিয়া বলি। বহ্নি যে কখনও তৃণাদির পরভাবী এবং কখনও মণি প্রভৃতির পরভাবী ইহা দেখিয়া অনেক দর্শনাচার্য বলিয়া থাকেন যে, তৃণ মণি প্রভৃতি তৃণ মণিরূপে বহ্নির কারণ নহে। ইহারা বহ্নি-অনুকূল কোনও একটি বা একজাতীয় শক্তির আশ্রয়রূপেই বহ্নির কারণ হইয়া থাকে। এখন এইরূপ কোনও শক্তি পদার্থ যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে অবশ্য বহ্নির যে, নিয়ত পূর্বভাবী পদার্থ রহিয়াছে, তাহা দেখান যায়। কারণ অতার্ণ বহ্নির ক্ষেত্রে তৃণ না থাকিলেও এবং তার্ণ বহ্নির ক্ষেত্রে মণি প্রভৃতি না থাকিলেও সকল ক্ষেত্রেই এক বা একজাতীয় শক্তি যে রহিয়াছে, তাহা বলা যায়। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, এইরূপ শক্তি নামক কোনও পদার্থ স্বীকার করিবার কোনও প্রয়োজন আছে কি? এই শক্তি যে প্রত্যক্ষবেদ্য নহে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই এবং অনুমানাদি প্রমাণের দ্বারা যে ইহাকে প্রমাণ করিতে পারা যাইবে তাহা মনে হয় না। উপরন্তু

আর একটি আশঙ্কা

৪। পাশ্চাত্ত্য দর্শনে ইহাকেই Plurality of cause বলে।

নৈয়ায়িকগণ শক্তি বলিয়া কোন পৃথক পদার্থ স্বীকার করেন না। অতএব, নৈয়ায়িকগণ কিছুতেই বলিতে পারেন না যে, প্রত্যেকটি কাদাচিৎক পদার্থেরই অনিত্য নিয়ত পূর্বভাবী পদার্থ আছে।

আকস্মিকতাবাদীর এইরূপ কথার উত্তরে ন্যায়াচার্যগণ যাহা বলেন তাহার সারমর্ম এইরূপ: তার্ণ বহ্নির যাহা পূর্বভাবী, অতার্ণ বহ্নির তাহা পূর্বভাবী নহে। অর্থাৎ তার্ণ বহ্নির পূর্বে তৃণ থাকে, কিন্তু অতার্ণ বহ্নির পূর্বে তৃণ থাকে না। এইরূপ অতার্ণ বহ্নির পূর্বে মণি প্রভৃতি থাকে, কিন্তু তার্ণ বহ্নির পূর্বে তাহারা থাকে না। ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তাহাতে ন্যায় সিদ্ধান্ত ব্যাহত হয় না। কারণ, বহ্নির বৈজাত্য স্বীকার করিলেই সকল গোলযোগ মিটিয়া যায়।[৫] অর্থাৎ তার্ণ বহ্নি মণিসমবহিত বহ্নি হইতে পৃথক, দীপশিখারূপ বহ্নি তপ্ত অয়ঃপিণ্ডগত বহ্নি হইতে পৃথক। এই পার্থক্য সহজ অনুভবসিদ্ধ। ব্যবহারও এই পার্থক্য স্বীকারপূর্বক হইয়া থাকে। আমার যদি গৃহকে আলোকিত করিবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে আমি দীপশিখারূপ বহ্নিরই অন্বেষণ করিব— তপ্ত-অয়ঃপিণ্ডগত বহ্নির অন্বেষণ করিব না। যাহাই হউক, তার্ণ বহ্নি, অতার্ণ বহ্নি প্রভৃতি বহ্নি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বহ্নি। এখন, অতার্ণ বহ্নি তৃণ সমবধান ভিন্ন উৎপন্ন হইলেও, তার্ণ বহ্নি কখনও না। সেইরূপ তার্ণ বহ্নি মণি সমবধান ব্যতিরেকে উৎপন্ন হইলেও মণিজ বহ্নি কখনও হয় না। তৃণ তার্ণ বহ্নি মাত্রেরই পূর্বভাবী এবং মণিজ বহ্নি মাত্রেরই মণি পূর্বভাবী। এইরূপ অন্যান্য ক্ষেত্রেও। আকস্মিকতাবাদীরা বহ্নির যে বৈজাত্য আছে তাহা দেখেন না এবং একজাতীয় বহ্নির যাহা নিয়ত পূর্বভাবী, তাহা যে অন্য জাতীয় বহ্নির নিয়ত পূর্বভাবী নহে তাহাই দেখেন। এইজন্যই তাঁহারা মনে করেন যে, বহ্নি মাত্রেরই কোন নিয়ত পূর্বভাবী পদার্থ নাই। এখন যদি তাঁহারা বলেন যে, তার্ণ বহ্নি, অতার্ণ বহ্নি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় নিয়ত পূর্বভাবী পদার্থ আছে, তথাপি বহ্নি মাত্রেরই কোন নিয়ত পূর্বভাবী পদার্থ নাই বলিয়া ন্যায় সিদ্ধান্ত ব্যাহত তাহা হইলে উত্তরে বলা হইবে যে, বিজাতীয় উষ্ণ স্পর্শবান্ তেজই বহ্নি সামান্যের[৬] নিয়ত পূর্বভাবী। সুতরাং প্রত্যেকটি কাদাচিৎক পদার্থেরই যে নিয়ত পূর্বভাবী পদার্থ আছে তাহা স্বীকার করিতে হয়।

ইহার সমাধান।

এখন কার্য বলিতে কাদাচিৎক পদার্থই বুঝা হয় বলিয়া এবং কারণ বলিতে

৫। ইহাকেই পাশ্চাত্ত্য দর্শনে Specialising the effect বলে।

৬। ইহাই Generalising the cause বলে।

নিয়ত পূর্বভাবীকেই বুঝা হয় বলিয়া, আমরা যখন কোনও কিছুকে কার্য বা কারণ বলিয়া বুঝি বা ডাকি, তখন কোনও অন্যায় কাজ করি না। অকস্মাৎ বা অকারণে কিছুই হইতে পারে না। বস্তুতঃ, অকস্মাৎ যদি কিছু হইতে পারিত, তাহা হইলে কার্যের কোন নিয়ত অবধি থাকিত না। যাহাদের আমরা কার্য বলি, তাহারা কেহই সর্বদেশে ও সর্বকালে থাকে না। যাহা সর্বদা থাকে তাহা কার্য নহে। কার্যমাত্রই অনিয়তকালবৃত্তি। প্রত্যেকটি কার্যই থাকে না, হয়, হইয়া কিছুকাল থাকে, তাহার পর আবার থাকে না। এখন প্রশ্ন এই যে, ইহার রহস্য কি? সামান্য বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, কার্য অকস্মাৎ হইতে পারে না বলিয়াই এইরূপ হয়। যাহাদের আমরা কোনও কার্যের কারণ বা নিয়ত পূর্বভাবী পদার্থ বলি তাহারা থাকিলেই কার্য উৎপন্ন হয় এবং তাহাদের সকলেরই বা নাশানুকূল কাহারও কাহারও বিনাশ হইলেই কার্যেরও বিনাশ হয়। কার্য যদি বিনা কারণে হইত বা স্বীয় স্বভাববশেই হইত তাহা হইলে তাহা কেন যে সর্বকালবৃত্তি হইত না তাহা বুঝা যাইত না। এখন কোন কার্যই কালের চিরসম্বন্ধী নহে। তাহারা সকলেই কাদাচিৎক। সুতরাং আমরা বলিতে পারি না যে, অকস্মাৎ বা অকারণে কোনো কিছু উৎপন্ন হইতে পারে। বিচার মুখে আকস্মিকতাবাদ দাঁড়াইতে পারে না।

আকস্মিকতাবাদ বিচারসহ নহে।

অকারণে বা অকস্মাৎ যে কিছুই ঘটিতে পারে না, তাহা আমরা দেখিলাম। এখন বিচার করিয়া দেখা যাউক যে, নির্নিমিত্তক কিছু হইতে পারে কি না। নির্নিমিত্ততা পক্ষ সমর্থক দর্শনাচার্যগণের বক্তব্য হইল এই যে, অকারণে যে কিছু ঘটিয়া থাকে তাহা বলা যায় না। কারণ, সকল দৃশ্য কার্যেরই উপাদান কারণ বা সমবায়ী কারণ প্রত্যক্ষসিদ্ধ। এইরূপ কোনও কিছুই যে সনিমিত্তক নহে তাহাও বলা যায় না। কারণ ঘট পট প্রভৃতির ক্ষেত্রে কুম্ভকার, তন্তুবায় প্রভৃতি নিমিত্তকারণ আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। তবে সকল জন্য পদার্থই যে সনিমিত্তক ইহা অস্বীকার করা যায়। কারণ কণ্টকের তীক্ষ্ণতা, পার্বত্য ধাতুসমূহের চিত্রতা প্রভৃতি জন্য পদার্থের অবয়বরূপ কারণ প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হইলেও নিমিত্তকারণ প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে। অতএব, অকারণে কিছু না ঘটিলেও, নির্নিমিত্তক অনেক কিছুই হইতে পারে।

নির্নিমিত্ততাবাদরূপ পূর্বপক্ষ

এই সকল দর্শনাচার্যগণের বিরুদ্ধে ন্যায়াচার্যগণের মূল বক্তব্য এই যে, ঘট, পট প্রভৃতি জন্য পদার্থ যে নিমিত্তকারণ সাপেক্ষ তাহা আমরা সকলেই স্বীকার করি। সুতরাং কণ্টকের তীক্ষ্ণতা, বা তৃণ তরু, মহীধর প্রভৃতি পদার্থের, যাহাদের নিমিত্ত

কারণ তোমার বা আমার মত ব্যক্তির প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে তাহাদেরও, নিমিত্তকারণ আছে কি না, তাহাই বিচার্য। এখন, ইহাদের নিমিত্ত কারণের প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া ইহাদের যে কোন নিমিত্তকারণ নাই, এমন কথা প্রথমেই বলা যায় না। কারণ, প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ নহে। যাহা প্রত্যক্ষ করি না তাহাই অলীক এইরূপ কোনও নিয়ম হইতে পারে না। অতএব, ধীরভাবে বিচার করিতে হইলে বলিতে হয় যে, ইহাদের নিমিত্তকারণ সন্দিগ্ধ। অর্থাৎ প্রথমেই ইহাদের নিমিত্তকারণ অস্বীকার করা উচিত হইবে না; উচিত হইবে নিমিত্তকারণ সম্পর্কে সংশয় পোষণ করা। কিন্তু এইরূপ সংশয় পোষণ করিয়াই বা সন্দেহ প্রকাশ করিয়াই যে পূর্বপক্ষী চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবেন, তাহা হইবে না! কারণ, কোনও সন্দেহ অহেতুক হইতে পারে না। কিন্তু তিনি কি হেতু দেখাইবেন? তিনি যে বলিবেন যে, তৃণ, তরু, মহীধর প্রভৃতির কোন নিমিত্তকারণ, তুমি বা আমি বা কেহই প্রত্যক্ষ করি না, ইহাই এই সন্দেহের হেতু? তাহা হইলে তিনি ঠকিয়া যাইবেন। কারণ, উহাদের নিমিত্ত কারণ প্রত্যক্ষসিদ্ধ না হইলেও সংশয়যোগ্য কি না ইহাই বিচার্য। উপরন্তু এইরূপ হেতুর বিরুদ্ধে প্রবল অনুমান প্রমাণ রহিয়াছে। অর্থাৎ সিদ্ধান্তী, বা যিনি সকল কার্যই সনিমিত্তক ইহা বলিয়া থাকেন, তিনি ঘট প্রভৃতি কার্য যেমন নিমিত্ত-কারণ সাপেক্ষ, তেমনই সকল কার্যই যে নিমিত্তকারণ সাপেক্ষ এইরূপ অনুমানের দ্বারা উক্ত হেতুকে খণ্ডন করিয়া দিবেন। সুতরাং এই অনুমানকে পূর্বপক্ষী যতক্ষণ পর্যন্ত না দুষ্ট বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিতেছেন ততক্ষণ পর্যন্ত কোন কিছু যে অনিমিত্তক হইতে পারে তাহা বলিতে পারিবেন না। এইরূপ অনুমানের বিরুদ্ধে সকল জন্য পদার্থই তৃণ, তরু, মহীধর প্রভৃতির ন্যায় অনিমিত্তক, এইরূপ কোন অনুমান যে তিনি প্রয়োগ করিবেন তাহা হইবে না। কারণ তৃণ, তরু প্রভৃতি জন্য পদার্থ প্রকৃতই অনিমিত্তক কিনা তাহাই বিচার্য। এইরূপ দৃষ্টান্ত উভয়বাদী সিদ্ধ নহে। অতএব সিদ্ধান্তীর সিদ্ধান্তকে খণ্ডন করিতে হইলে পূর্বপক্ষীকে দেখাইতে হইবে যে ঘট, পট প্রভৃতি পদার্থ যেরূপ জন্য সেরূপ জন্য-পদার্থ নহে। কিন্তু ইহা তিনি কোনরূপেই দেখাইতে পারিবেন না। কারণ জন্য-পদার্থরূপে ইহাদের মধ্যে ঐক্য রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে বৈজাত্য কেবল এইখানেই যে একক্ষেত্রে নিমিত্তকারণ প্রত্যক্ষসিদ্ধ, অপর ক্ষেত্রে তাহা নহে। কিন্তু এইরূপ বৈজাত্যে কিছুই আসিয়া যায় না। কারণ, যে সকল ক্ষেত্রে নিমিত্তকারণ সন্দিগ্ধ, সেই সকল ক্ষেত্রেও যে অবয়বের মিলন হয়, ইহা অস্বীকার করা যায় না। এবং অচেতন অবয়বগুলি যে নিজেরাই মিলিত হইতে পারে বা চেতনা-অনধিষ্ঠিত

ইহার খণ্ডন

হইয়াও কর্মে প্রবৃত্ত হইতে পারে, ইহা স্বীকার না করিলে, ঐ সকল ক্ষেত্রেও নিমিত্ত-কারণ স্বীকার করিতে হইবে। এখন চেতনা-অনধিষ্ঠিত জড় স্বতঃই কর্মে প্রবৃত্ত হইতে পারে, এইরূপ কথা অনেকে বলিয়া থাকেন। কিন্তু ন্যায়াচার্যগণ ইহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে, ইহার কোনও সর্ববাদিসিদ্ধ দৃষ্টান্ত নাই। অতএব, এইরূপ কথা তাঁহাদের মতে মানিবার কোন হেতু নাই। এবং চেতনা প্রেরিত হইয়া জড় যে কর্মে প্রবৃত্ত হয় ইহার সর্ববাদিসিদ্ধ দৃষ্টান্ত আছে। সুতরাং তৃণ, তরু, মহীধর প্রভৃতির ক্ষেত্রেও অবয়বগুলি যে স্বয়ং কর্মে প্রবৃত্ত না হইয়া নিমিত্তকারণের অপেক্ষা করে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। কোনও কিছুই যে যে নির্নিমিত্তক নহে, এই সিদ্ধান্তই সুসিদ্ধান্ত।

অকস্মাৎ বা নির্নিমিত্তক যে কিছুই হইতে পারে না, ইহা আমরা দেখিলাম। এখন, জগৎ একটি কার্য কিনা, তাহাই দেখিবার চেষ্টা করা যাউক। কার্য দ্রব্য মাত্রই সাবয়ব। যেমন ঘট। এখন, জগৎ বলিতে দ্ব্যণুকই বুঝি, আর অঙ্কুরই বুঝি, বা তৃণ, তরু, মহীধর প্রভৃতিই বুঝি ইহারা সকলেই সাবয়ব। অতএব, অর্থাৎ সাবয়ব বলিয়া জগৎ যে একটি কার্য তাহা বলা যায়। এই ন্যায়সিদ্ধান্ত অনেক দর্শনাচার্য স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে, সাবয়ব বলিয়া জগৎকে কেন যে কার্য বলা হয় তাহা বুঝিতে পারা যায় না। কারণ, সাবয়ব বলিতে যদি অবয়ব সংযোগী বুঝি, তাহা হইলে সাবয়ব দ্রব্য মাত্রকেই কার্য বলিতে পারি না। গগন ন্যায় মতে নিত্য এবং অবয়ব সংযোগীও বটে। বৃক্ষ নামক অবয়বীটির সহিত গগন যেমন সংযুক্ত ঠিক তেমনই তাহার শাখা-প্রশাখা প্রভৃতি অবয়বের সহিতও ইহা সংযুক্ত। তুমি যে ইহাকে কেবল অবয়বী সংযোগী বা বৃক্ষ সংযোগীই বলিবে তাহা হইবে না। কারণ, ইহা সর্বগত বা সকল মূর্ত, অর্থাৎ অসর্বব্যাপী পদার্থের সংযোগী। বৃক্ষের শাখা-প্রশাখার সহিত ইহার সংযোগ স্বীকার করিলে বহু সংযোগ স্বীকার করিতে হয় বা কল্পনা গৌরব দোষ হয় বলিয়া তুমি যে ইহাকে কেবলমাত্র বৃক্ষ সংযোগী বলিবে তাহাও হইবে না। কারণ, অবয়বের সহিত সংযুক্ত না হইয়া অবয়বীর সহিত সংযুক্ত হওয়া যায় না। এবং গগনের ন্যায় সর্বগত পদার্থ যদি কোনও একটি অবয়ব-সংযোগী হয় তাহা হইলে কেন যে ইহা সকল অবয়ব সংযোগী হইবে না তাহা বুঝিতে পারা যায় না। বস্তুতঃ গগন যে শাখা-প্রশাখা প্রভৃতি বৃক্ষের সকল অবয়বের সহিতই সংযুক্ত ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়, বা ইহাকে প্রমাণ করিবার জন্য বিশেষ আয়াস স্বীকার করিবার কোনও অর্থই হয় না। অতএব, গগনকে অবয়ব সংযোগী

জগৎ সাবয়ব বলিয়া কার্য।

কিন্তু সাবয়ব বলিতে অবয়ব সংযোগী বুঝিতে পারি না।

বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, এবং সেইজন্য সাবয়ব বলিতে যদি অবয়ব সংযোগী বুঝা হয়, তাহা হইলে সাবয়ব পদার্থকে কেন যে কার্য পদার্থ বলা হয়, তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

এইরূপ সাবয়ব বলিতে যদি অবয়ব সমবায়ী বুঝি, তাহা হইলেও কোন কিছুকে সাবয়ব বলিতে কেন যে কার্য পদার্থ বলিতে হইবে তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

অবয়ব সমবায়ীও বুঝা যায় না।

কারণ, ন্যায় মতে সামান্য নামক পদার্থটি নিত্য এবং অবয়ব সমবায়ীও বটে। অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে যে একরূপ বুদ্ধি বা অনুগত বুদ্ধি হয় তাহার উপপত্তির জন্য নৈয়ায়িকগণ সামান্য নামক নিত্য অথচ অনেক সমবেত পদার্থ স্বীকার করিয়া থাকেন। যেমন, এই ঘটটিতেও আমার ঘটবুদ্ধি হয়, ঐ ঘটটিতেও আমার ঘটবুদ্ধি হয়, সেই ঘটটিতেও আমার ঘটবুদ্ধি হয়, ইত্যাদি। এইরূপ বুদ্ধিকে অর্থাৎ ভিন্ন ব্যক্তিতে একাকার বুদ্ধিকে অনুগত বুদ্ধি বলে। এই অনুগত বুদ্ধি কেন হয় তাহা নির্ণয় করিতে গিয়া ন্যায়াচার্যগণ বলিয়া থাকেন যে, ঘটত্ব বলিয়া একটি পদার্থ আছে এবং যদিও ইহা প্রত্যেকটি ঘট হইতেই ভিন্ন তথাপি ইহা প্রত্যেকটি ঘটেই সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকে। অতএব ঘটত্ব একটি অনেক সমবেত পদার্থ। এখন, ঘটত্ব কেবল অনেক সমবেত পদার্থই নহে, নিত্যও বটে। কারণ, ইহা যদি নিত্য না হইয়া উৎপাদশীল বা কার্য পদার্থ হইত তাহা হইলে যেহেতু প্রত্যেকটি ঘট ব্যক্তিতেই ইহা সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকে, সেই হেতু প্রত্যেকটি ঘট ব্যক্তিই ইহার সমবায়ী কারণ হইয়া যাইত। কিন্তু কোনও ঘটকেই আমরা ইহার সমবায়ী কারণ বলিতে পারি না। কারণ, সমবায়ী কারণের নাশ হইলে কার্যেরও নাশ হইয়া থাকে। কিন্তু কোন ঘট ব্যক্তির নাশ হইলেও ইহার নাশ হয় না ; এবং ইহা ভাবপদার্থ অথচ বিনাশহীন বলিয়া উৎপাদহীনও বটে। অতএব, ইহাকে নিত্যই বলিতে হয়। এখন, ঘটত্ব যেরূপ একটি সামান্য, গোত্ব, অশ্বত্ব, দ্রব্যত্ব প্রভৃতিও তেমনই এক একটি সামান্য। তাহারাও নিত্য। এখন, দ্রব্যত্ব নামক সামান্যটির কথাই বিচার করা যাউক। ইহা নিত্য, কারণ সকল সামান্যই নিত্য। আবার ইহা অবয়ব-সমবায়ীও বটে। কারণ, এই সামান্যটি যেমন বস্ত্র নামক অবয়বীতে সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকে, ঠিক তেমনই আবার ঐ অবয়বীর অবয়ব তন্তু নামক দ্রব্যেও সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমানথাকে। তাই অবয়ব বলিতে যদি আমরা অবয়ব সমবায়ী বুঝি তাহা হইলে আর কার্য পদার্থ বুঝিতে পারি না।

তাহা হইলে কি আমরা সাবয়ব বলিতে অবয়ব-জন্য দ্রব্য বুঝিব? অবশ্যই নহে। কারণ, সাবয়ব দ্রব্য জন্য-দ্রব্য কি না তাহাই বিচার্য — এবং সেইজন্য অর্থাৎ

কোনও কিছুকে সাবয়বত্ব হেতুর সাহায্যে কার্য বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহিতেছি বলিয়া, সাবয়ব বলিতে অবয়ব-জন্ম বুঝা চলিবে না। এইরূপ, সাবয়ব বলিতে সমবেত দ্রব্যও বুঝিতে পারি না। কারণ, সমবেত দ্রব্য বলিতে সমবায় সম্বন্ধে আশ্রয় বা আশ্রিত দ্রব্যকেই বুঝা হয়। কিন্তু সমবায় সম্বন্ধে আশ্রয় দ্রব্য মাত্রই কার্য নহে। যেমন গগন। ইহা সমবায় সম্বন্ধে শব্দ নামক গুণের আশ্রয়, কিন্তু নিত্য। এইরূপ আপত্তি পরিহার করিবার জন্য যে সমবায় সম্বন্ধে দ্রব্য পদার্থের আশ্রয় দ্রব্য বলিব, তাহাও হইবে না। কারণ দ্ব্যণুক নামক অবয়বীর সমবায় সম্বন্ধে আশ্রয় অণু দুইটি নিত্য। অতএব, সাবয়ব দ্রব্য বলিতে সমবায় সম্বন্ধে, দ্রব্য বা কোন পদার্থের আশ্রয় হয় যে দ্রব্য, সেই দ্রব্য যে বুঝিব, তাহাও হইবে না। এইরূপ সমবায় সম্বন্ধে আশ্রিত দ্রব্য যে বুঝিব, তাহাও হইবে না। কারণ সমবায় সম্বন্ধই স্বীকার্য নহে। অতএব কোন কিছুকে যেমন ক্ষিতি বা অঙ্কুরকে যে সাবয়ব বলিয়া কার্য বলিব, তাহা হইবে না।

অবয়ব জন্মও বুঝিতে পারি না।

সমবেত দ্রব্য বুঝিব কি ?

এইরূপ পূর্বপক্ষীর উত্তরে ন্যায়াচার্যগণের মোট কথা হইল এই যে সাবয়ব দ্রব্য বলিতে সমবেত দ্রব্য বা সমবায় সম্বন্ধে আশ্রিত দ্রব্যই বুঝিতে হইবে। সাবয়ব পদের এইরূপ অর্থের বিরুদ্ধে পূর্বপক্ষীগণ বলিয়া থাকেন যে, সমবায় সম্বন্ধই স্বীকার্য নহে। এখন, সমবায় সম্বন্ধ পূর্বপক্ষী আচার্যগণ স্বীকার না করিলেও ন্যায়াচার্যগণ স্বীকার করিয়া থাকেন। ইহার বিরুদ্ধে পূর্বপক্ষীগণ যে সকল কথা বলেন, তাহার উত্তরও ন্যায়দর্শনে দেওয়া হয়। অতএব সমবায় সর্ববাদিসিদ্ধ পদার্থ না হইলেও, বিচারসিদ্ধ পদার্থ বটে। এইজন্য সাবয়ব দ্রব্য বলিতে সমবেত বা সমবায় সম্বন্ধে আশ্রিত দ্রব্য বুঝা যায়, এবং ক্ষিতি, অঙ্কুর প্রভৃতি সমবেত দ্রব্য বলিয়াই যে কার্য, তাহা বলা যায়। সংক্ষেপে, জগৎ একটি কার্য, এবং ইহার উপপত্তির জন্য কারণ কল্পনার প্রয়োজন।

অবশ্যই সমবায় সম্বন্ধে আশ্রিত দ্রব্য বুঝিতে হইবে।

জগৎ যে একটি কার্য পদার্থ ইহা আমরা দেখিলাম, এবং আমরা আরও দেখিলাম যে ইহার উপপত্তির জন্য কারণ কল্পনার প্রয়োজন। এখন দেখা যাউক যে অচেতন অথচ লৌকিক জড় পদার্থ এই কারণ হইতে পারে কি না। অচেতন জড় পদার্থ বা কোন লৌকিক পদার্থই যে জগতের কারণ ইহা মনে হওয়া স্বাভাবিক। কারণ জগৎ একটি লৌকিক পদার্থ এবং লৌকিক কার্যের উপপত্তির জন্য লৌকিক কারণের অনুসন্ধানই রীতি। কিন্তু ন্যায়াচার্যগণ বলেন যে লৌকিক

কারণ কল্পনার দ্বারা জগতের উপপত্তি করা যায় না। অলৌকিক পদার্থ যদি একান্ত অপ্রসিদ্ধ হইত বা অলৌকিক পদার্থ যদি লৌকিক পদার্থের সহিত সম্বন্ধহীন হইত তাহা হইলে হয় আমাদের লৌকিক কারণই কল্পনা করিতে হইত; অথবা বলিতে হইত যে জগতের কোন উপপত্তি হয় না। কিন্তু অলৌকিক পদার্থ অপ্রসিদ্ধ নহে— লৌকিক পদার্থের সহিত তাহার সম্বন্ধও অপ্রসিদ্ধ নহে। অবশ্য চার্বকগণ ইহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা অলৌকিক কিছু মানিতে চাহেন না। অলৌকিকের অস্বীকৃতির দ্বারা তাঁহারা কৌশলে ঈশ্বরকেও অস্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু ন্যায়াচার্যগণ পরলোক বা মুখ্য স্বর্গ, নরক প্রভৃতি স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন যে পরলোক না থাকিলে সাধু মহাজনগণ যে বহু বিত্তব্যয় ও আয়াস সাধ্য যজ্ঞাদি কর্ম করিয়া থাকেন, তাহার কোনও অর্থ থাকে না। অর্থাৎ কর্মে প্রবৃত্তি না জন্মিলে কেহ কোনও কর্ম করে না। সুতরাং সাধু মহাজনগণ যখন যজ্ঞাদি শুভকর্ম করেন বা হিংসা প্রভৃতি অশুভ কর্ম পরিহার করেন, তখন বুঝিতে হইবে যে ঐ সকল কর্মে তাঁহাদের প্রবৃত্তি হইয়াছে। কিন্তু কোনও কর্মে কাহারও প্রবৃত্তি কখন হয়? অবশ্যই সে যখন বুঝিতে পারে যে এই কর্মটি করিলে আমার এই ইষ্টটি লাভ হইবে। অতএব সাধু মহাজনগণের যজ্ঞাদি কর্মে প্রবৃত্তি কোন ইষ্ট-সাধনতা-জ্ঞানপূর্বক। কিন্তু এই ইষ্টটি কি? অবশ্যই কোন ইহলৌকিক পদার্থ, যেমন পূজা, খ্যাতি, ধন, মান প্রভৃতি নহে। কারণ, ইহাদের যাঁহারা তুচ্ছ বিবেচনা করেন, এমন কি ইহাদের হইতে সর্বদাই দূরে থাকিতে সচেষ্ট থাকেন, এরূপ মহাপুরুষও যজ্ঞাদি কর্মে প্রবৃত্ত হন। তাঁহারা যে কোনও বঞ্চকের কথায় ভুলিয়া ঐরূপ করিয়া থাকেন তাহাও বলা যায় না। কারণ বঞ্চকেরা কতিপয় ব্যক্তিকে কিছুদিনের জন্যই বঞ্চনা করিতে পারে; কিন্তু বহু ব্যক্তিকে, বিশেষ করিয়া সাধু মহাজনগণের ন্যায় বিচারী ব্যক্তিগণকে বহুদিন ধরিয়া বঞ্চনা করিতে পারে না। ঐ সাধু মহাপুরুষগণকে যে প্রতারক বলিব তাহাও হইবে না। কারণ, তাঁহাদের আচার আচরণ প্রভৃতি নিঃসন্দেহেই প্রমাণ করে যে তাঁহারা বঞ্চক নহেন, সাধু। অতএব ইহলৌকিক ইষ্ট সাধন করিবার জন্য সাধু মহাজনগণ যজ্ঞাদি কর্মে প্রবৃত্ত হন না। তাঁহারা অবশ্যই পারলৌকিক ইষ্ট বা স্বর্গাদি ফললাভের উদ্দেশ্যেই ঐ সকল কর্মে প্রবৃত্ত হন। সুতরাং পরলোক যে নাই তাহা কেমন করিয়া বলি? পুনরায়, কোনও যজ্ঞের ফল যে যজ্ঞ সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লাভ করা

অলৌকিক হেতু প্রসিদ্ধ বলিয়া এবং লৌকিক হেতুর দ্বারা জগতের উপপত্তি হয় না বলিয়া, ইহার হেতু অলৌকিক।

অলৌকিক পদার্থ অপ্রসিদ্ধ হইলে পরলোকার্থির স্বর্গাদি অর্থলাভের জন্য যাগাদি কর্মের কোনও অর্থ থাকিত না।

যাইবে এমন কথা বলা যায় না। আমি এখন কোনও যজ্ঞ করিলাম যাহার ফল স্বর্গলাভ। যজ্ঞ সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি স্বর্গলাভ করিব না। ঐ ফল আমি পরে লাভ করিব। এখন, আজিকার কর্ম অনাগতকালে লভ্য ফলের জনক হইবে কি করিয়া? যে কর্ম আজই চিরকালের জন্য ধ্বংস হইয়া গেল, তাহার সহিত যে ফল এখনও উৎপন্ন হয় নাই, বা সুদূর ভবিষ্যতে উৎপন্ন হইবে, তাহার কার্যকারণ ভাব সম্বন্ধ থাকিবে কি করিয়া? বা এই কর্মের যে এই ফল তাহা কেমন করিয়া বলা যাইবে? সুতরাং আশুবিনাশী যজ্ঞাদি কর্ম হইতে অনাগত কালে উৎপন্ন স্বর্গাদি ফলের উৎপত্তি কাল পর্যন্ত স্থায়ী কোনও অদৃষ্ট কারণ বা কর্মকর্তার ধর্ম বিশেষ স্বীকার করিতে হয়। বলিতে হয় যে এতৎকালে অনুষ্ঠিত কর্ম সমূহ অদৃষ্ট কারণ দ্বারা পরোক্ষভাবে তৎকালীন ফলের কারণ হইতে পারে। অতএব অদৃষ্ট বা অলৌকিক হেতু অপ্রসিদ্ধ নহে। বস্তুতঃ অদৃষ্ট হেতু স্বীকার করিলেই এই জগতে যে ভোগ বৈচিত্র্য রহিয়াছে তাহার উপপত্তি করা যায়। এই জগতে কেহ যে সুখী এবং কেহ যে দুঃখী, কেহ যে মনুষ্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, এবং কেহ যে তির্যগ্ যোনিতে জন্মগ্রহণ করে তাহার উপপত্তি করিতে হইলে অদৃষ্ট বা কর্মফলের কথা বলিতে হয়। অতএব, অদৃষ্ট আমাদের স্বীকার করিতেই হয়, এবং তাহার সহিত দৃষ্টের যে কার্যকারণভাব সম্বন্ধ থাকিতে পারে তাহাও স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং, ইহা যদি দেখা যায় যে জগৎ নামক মহাকার্যের উপপত্তি লৌকিক কারণ কল্পনার দ্বারা হইতে পারে না, তাহা হইলে অলৌকিক হেতুই কল্পনা করা উচিত নহে কি?

কিন্তু লৌকিক কারণ অর্থাৎ অচেতন জড় পদার্থের সাহায্যে জগৎ নামক মহাকার্যের উপপত্তি হইবে না কেন? এই প্রশ্নের উত্তর পাইতে হইলে জগৎ নামক মহাকার্যের জন্য ন্যায়াচার্যগণ কিরূপ কারণ অনুসন্ধান করিতেছেন তাহা মনে রাখিতে হইবে। চারি প্রকার পরমাণু বা অচেতন জড় পদার্থ যে জগতের সমবায়ী বা উপাদান কারণ, ইহা ন্যায়াচার্যগণও বলিয়া থাকেন।[৭] অতএব, অচেতন জড় জগতের কারণ হইতে পারে, ইহা বলিলে ন্যায় মত খণ্ডিত হয় না। ন্যায়াচার্যগণের

৭। পাশ্চাত্য দর্শনে কার্যত্বহেতুক একটি ঈশ্বরানুমান প্রচলিত আছে। কিন্তু ইহাতে পরিষ্কার করিয়া বলা হয় না যে ঈশ্বর কিরূপ কারণ। তাহার ফলে চেতন ঈশ্বর হইতে কিরূপে অচেতন ক্ষিতি প্রভৃতি আসিল তাহা বুঝিতে পারা যায় না। Emergent evolution বলিয়া এক প্রকার মত পাশ্চাত্য দর্শনে প্রচলিত। ইহার সহিত নৈয়ায়িকগণের আরম্ভবাদের বিশেষ কোনও সম্পর্ক নাই। ন্যায়মতে অবয়বী দ্রব্যেরই আরম্ভ হয়; কিন্তু এই মতে চৈতন্য প্রভৃতি গুণের আরম্ভ হয়। যাহাই হউক, এই মত অনুযায়ী অচেতন জড় হইতে চেতনের আবির্ভাব হয়। এবং এইরূপ কোনও মতের সাহায্যেও পাশ্চাত্য দর্শনের ঈশ্বরানুমানকে অনুপপত্তি হইতে মুক্ত করা যায় না। অর্থাৎ এই মতের বিপরীত মত লইয়া আমরা বলিতে পারি না যে চেতন ঈশ্বর হইতে অচেতন জড়

সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইলে জগৎ নামক কার্যের উপপত্তির জন্য সর্ব উপাদান অভিজ্ঞ নিমিত্ত কারণাখ্য কোনও চেতন কারণ কল্পনার প্রয়োজন আছে কিনা তাহাই বিচার করিয়া দেখিতে চাহিতে হইবে। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে অনেক দর্শনাচার্যের মতে তৃণ, তরু প্রভৃতি পদার্থের কোনও নিমিত্ত কারণ প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে বলিয়া সকল কার্যই সনিমিত্তক নহে। এখন, এই সকল দর্শনাচার্যের কথা যদি প্রমাণ করা যায়, তাহা হইলে ন্যায়চার্যগণকে সহজেই পরাস্ত করা যায়। কিন্তু প্রশ্ন এই যে ইঁহাদের কথা প্রমাণ করা যায় কি? আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে ভারতীয় দর্শনে যেরূপে অনুমান প্রমাণ প্রয়োগ করা হয়, তাহা যদি স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে ন্যায়াচার্যগণের কথাই মানিতে হয়, যে কর্তা ব্যতীত কোনও কার্য হইতে পারে না। অর্থাৎ ঘট, পট, প্রাসাদ, তোরণ প্রভৃতি কার্য যে চেতন নিমিত্ত কারণ সাপেক্ষ তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে ইহাদের মত সকল কার্যই চেতন নিমিত্ত কারণ সাপেক্ষ। পাশ্চাত্য দর্শনের ছাত্র এইরূপ অনুমানে সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। তিনি বলিতে পারেন যে অট্টালিকার ন্যায় মহীধরও যে চেতন নিমিত্ত কারণ সাপেক্ষ তাহা বলিব কেন? তাঁহার এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে ন্যায়াচার্যগণ বলিবেন যে বলিবই বা না কেন? আমি যদি এক ক্ষেত্রে দেখি যে ধূম বহ্নিজন্য তাহা হইলে বলিতে পারি যে সকল ধূমই বহ্নিজন্য। একবার মাত্র দেখিয়াই আমরা সকলের সম্পর্কে কথা বলিতে পারি। ইহা অবশ্য সত্য যে এইরূপে সকলের সম্পর্কে কথা বলিতে গিয়া আমরা ভুল করিতে পারি। কিন্তু ভুল করিতে পারি বলিয়াই যে ভুল করিয়াছি, তাহা মনে করিবার কোনও কারণ নাই। অতএব, আমাদের এই কথা যে ভুল, বা ভুল বলিয়া মনে করিবার যে উপযুক্ত হেতু রহিয়াছে, তাহা যদি দেখান না যায় তাহা হইলে ইহাকে সত্য বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাই অনুমান প্রমাণের রহস্য। অতএব, অট্টালিকার ক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি যে ইহা চেতন নিমিত্ত কারণ সাপেক্ষ তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি

সকল কার্যই কর্তাসাপেক্ষ বলিয়া জগৎও কর্তাসাপেক্ষ এবং কর্তা সল্লাজ্ঞ জীব নহে, ঈশ্বর।

আরম্ভ হয়। কারণ তাহা হইলে জড় উন্নত পদার্থ হইয়া যাইবে। ভারতীয় দর্শনে এইরূপ অনুপপত্তি নাই। ন্যায়দর্শনে পরমাণু মানা হয়, এবং ঈশ্বরকে উপাদান কারণই বলা হয় না। সাংখ্য দর্শনে অচেতন প্রকৃতিই জগতের উপাদান কারণ, অদ্বৈত বেদান্তে ঈশ্বর বা ব্রহ্মকে উপাদান কারণ বলিলেও জগৎকে ব্রহ্মের বিবর্ত বলা হয় এবং তামসী মায়াকেই প্রকৃতপক্ষে জড়ের পরিণামী উপাদান কারণ বলা হয়। রামানুজাচার্য ঈশ্বরকে উপাদান কারণ বলিলেও ঈশ্বরে অচিৎ অংশ স্বীকার করেন। অতএব এই বিষয়ে ভারতীয় দর্শনের ঈশ্বরানুমান পাশ্চাত্য দর্শনের ঈশ্বরানুমান হইতে উৎকৃষ্ট।

যে সকল কার্যই, অর্থাৎ তৃণ, তরু, মহীধর প্রভৃতিও এইরূপ কারণ জন্য। আমাদের এই সিদ্ধান্তকে খণ্ডন করিতে পারে, এমন কোন যুক্তি যদি না থাকে, তাহা হইলে ইহাকে সত্য বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। এখন, এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন যুক্তি আছে কি ? তৃণ, তরু, মহীধর প্রভৃতির কোন কর্তা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ নহে ইহা এই যুক্তি হইতে পারে না। কারণ, ইহাদের কর্তা দেখিতেছি না বলিয়া যে নাই তাহা প্রথমেই বলা যায় না। বিশেষ করিয়া ইহাদের কোন চেতন নিমিত্ত কারণ নাই, এইরূপ কথা দৃঢ়তার সহিত বলা যায় না। কারণ পূর্বপক্ষী এইরূপ কথা বলিলেও ন্যায়াচার্যগণ তাহা বলেন না। অতএব, ন্যায়াচার্যগণের সিদ্ধান্তকে খণ্ডন করিতে হইলে দেখাইতে হইবে যে অট্টালিকা প্রভৃতি কার্যদ্রব্য হইতে মহীধর প্রভৃতি কার্য-দ্রব্য অত্যন্ত বিসদৃশ। কিন্তু ইহা দেখান যায় কি ? অট্টালিকা প্রভৃতি অট্টালিকা বলিয়া, এবং মহীধর প্রভৃতি মহীধর বলিয়া, ইহাদের মধ্যে গুরুতর বৈসাদৃশ্য রহিয়াছে, এইরূপ যে বলিব তাহা হইবে না। কারণ, এইরূপ বৈসাদৃশ্য গুরুতর বৈসাদৃশ্য নহে। অট্টালিকা এবং ঘটের মধ্যেও যে এই জাতীয় বৈসাদৃশ্য রহিয়াছে তাহা বলা যায়। এইরূপ ইহাও আমরা বলিতে পারি না যে মৃত্তিকা নিমিত্ত কাবণের অপেক্ষা না করিয়াই বল্মীকস্তূপে পরিণত হয়, ইহা আমরা সকলেই দেখিতে পাই, এবং মহীধর প্রভৃতির ক্ষেত্রেও এইরূপ কথা বলা যায়, এবং ইহাই অট্টালিকা প্রভৃতি কার্য হইতে মহীধর প্রভৃতি কার্যের বিশেষ বৈজাত্য। কারণ, এইরূপ বৈজাত্য সত্যই আছে কিনা তাহাই বিচার্য। সংক্ষেপে, অচেতন জড় যে চেতনা প্রেরিত হইয়াই কর্মে প্রবৃত্ত হয় ইহার নিশ্চিত দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু স্বতঃই কর্মে প্রবৃত্ত হয়, এইরূপ কোন নিশ্চিত দৃষ্টান্ত নাই। সুতরাং সকল কার্যই ঘট, পট, অট্টালিকা প্রভৃতির ন্যায় কর্তৃজন্য এই অনুমানকে সাধুই বলিতে হয় ; বা জগৎ নামক মহাকার্য যে সকর্তৃক, এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিতে হয়।

জগৎ নামক মহাকার্যটি উপাদান অভিজ্ঞ চেতন নিমিত্ত কারণ সাপেক্ষ। কিন্তু এই কারণ তোমার বা আমার মত অল্পজ্ঞ জীব হইতে পারে না। কারণ, জীবের অল্পজ্ঞতা সর্ববাদিসিদ্ধ। জীব যে নিষ্ফল কর্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহা কেহই অস্বীকার করেন না। বস্তুতঃ কোনও কার্যের উপাদান কারণের অপরোক্ষ জ্ঞান না থাকিলে কর্তা হওয়া যায় না। কুম্ভকার ঘটের কর্তা হইতে পারে। কারণ, তাহার কপালের প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে। এইরূপ, তন্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান তন্তুবায়ের থাকে বলিয়াই সে বস্ত্রের কর্তা হইতে পারে। যাহাকে তুমি বা আমি বা কোন জীবই প্রত্যক্ষভাবে জানি না. তাহাকে উপাদান করিয়া তোমার বা আমার পক্ষে কোন কিছুই নির্মাণ করা

ঈশ্বরই জগতের নিমিত্ত কারণ।

সম্ভব নহে। এখন, আমরা কেহই পরমাণুকে প্রত্যক্ষ করি না। এইজন্য আমাদের কাহারও পক্ষেই দুইটি পরমাণুকে একত্র করিয়া দ্ব্যণুকের বা সৃষ্টির প্রথমোৎপন্ন কার্যের কর্তা হওয়া সম্ভব নহে। ইহা অবশ্য সত্য যে জীবের অদৃষ্ট বা কর্ম নিরপেক্ষ ভাবে কোনও কার্যের উৎপত্তি হয় না। কিন্তু সেইজন্য ইহা বলিতে পারা যায় না যে অদৃষ্ট দ্বারাই জীবগণ দ্ব্যণুকাদি কার্যের কর্তা হয়। কারণ, অদৃষ্ট অচেতন এবং ঈশ্বর কারিত। অনন্ত জীবের অনন্ত অদৃষ্টের জ্ঞাতা এবং অধিষ্ঠাতা কেবল ঈশ্বরই হইতে পারেন। উপরন্তু সৃষ্টির পূর্বে জীবের শরীরাদি না থাকায় জীব কখনও অদৃষ্টের প্রেরক হইয়া কর্তা হইতে পারে না। অতএব, এই জগতের নিমিত্ত কারণ ঈশ্বরকেই বলিতে হয়। সংক্ষেপে সকল কার্যই সকর্তৃক, জগৎ একটি কার্য বলিয়া ইহাও সকর্তৃক, এই কর্তা, তুমি বা আমি, বা কোন জীব নহে— ঈশ্বর বা সর্ব উপাদান অভিজ্ঞ, সকল কর্মের কারয়িতা, সকল অদৃষ্টের জ্ঞাতা ও অধিষ্ঠাতা আত্মাবিশেষ। এই জগৎ লৌকিক হইলেও ইহার হেতু অলৌকিক।

গ্রন্থপঞ্জী

(ক) অকারণতাবাদ খণ্ডন— ন্যায় কুসুমাঞ্জলি ১. ৫-৬ প্রকাশ, হরিদাস ভট্টের ব্যাখ্যা, কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশের বিবৃতি, এবং শ্রীরামকৃষ্ণ তর্কতীর্থের সৌরভ সহ।

(খ) নির্নিমিত্ততাপক্ষখণ্ডন— ন্যায়সূত্র ৪.২২-২৪, ভাষ্যাদি ও তর্কবাগীশকৃত টিপ্পনী সহ।

(গ) জগতের কার্যত্ব—(১) সর্বদর্শন সংগ্রহ, দর্শনাঙ্কুর টীকা সহ— আর্হত দর্শন।
(২) ষড়দর্শন সমুচ্চয়।
(৩) মুক্তাবলী সংগ্রহ ১.

(ঘ) অলৌকিক হেতুত্ব—কুসুমাঞ্জলি ১.৪ এবং ৮।

(ঙ) জগৎ সকর্তৃক—তাৎপর্য টীকা ৪.১.২১।

প্রথম খণ্ড। তৃতীয় অধ্যায়

পরিণামবাদ

আমরা দেখিয়াছি যে ন্যায়মতে সকল কার্য দ্রব্যই উপাদান অভিজ্ঞ কর্তাজন্য বলিয়া জগৎও সর্বজ্ঞ কর্তা বা ঈশ্বর জন্য। এই মত যে সকলের সম্মত নহে তাহাও আমরা বলিয়াছি। অনেক দর্শনাচার্য জগৎ নামক লৌকিক পদার্থের জন্য অলৌকিক হেতু কল্পনা করা অনুচিত বলিয়া এই ন্যায়মত গ্রহণ করেন না। ইহাদের বিরুদ্ধে ন্যায়াচার্যগণের কি বক্তব্য, তাঁহারা কেন যে জগতের উপপত্তির জন্য অপ্রাকৃত, অলৌকিক কারণ কল্পনা করেন, তাহাও আমরা দেখিয়াছি। এখন আমরা যে সকল দর্শনে জগতের উপপত্তির জন্য অপ্রাকৃত হেতু কল্পনার যৌক্তিকতা স্বীকৃত হইলেও ন্যায়মত গৃহীত হয় না, সেই সকল দর্শনের কথা বিচার করিতে পারি। এই সকল দর্শনের মধ্যে সাংখ্য দর্শন ও বেদান্ত দর্শনই বিশেষ প্রসিদ্ধ। সাংখ্য মতে জগৎ প্রকৃতির পরিণাম এবং অদ্বৈত বেদান্ত মতে জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত। এই দুইটি দর্শনে জগদুদ্ভব সম্পর্কে যাহা বলা হয়, তাহার সহিত ন্যায় দর্শনের কথা মিলে না; বা ইহাদের কাহারও কথা গ্রহণ করিলে ন্যায়মত গ্রহণ করা যায় না। অতএব, আমাদের এই দুইটি দর্শনের কথাই আলোচনা করিয়া দেখিতে হয়। এই অধ্যায়ে আমরা সাংখ্যমতের আলোচনা করিতেছি, এবং পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা অদ্বৈত মতের আলোচনা করিব।

সাংখ্য দর্শনে ঈশ্বরকে জগতের নিমিত্ত কারণ বলিয়া স্বীকার করা হয় না।

জগৎ যে কোনও সর্বজ্ঞ কর্তা বা ঈশ্বর জন্য, ইহা সাংখ্যাচার্যগণ স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে প্রমাণের অভাবে ঈশ্বর অসিদ্ধ এবং সেইজন্য জগৎ যে ঈশ্বর জন্য, ইহা বলা যায় না। বস্তুতঃ ঈশ্বর যদি স্বীকারও করা যায়, তাহা হইলেও তাঁহাকে জগতের কর্তা বলা যায় না। কারণ ঈশ্বর নামটি পারিভাষিক, আত্মা বা পুরুষবিশেষকেই ঈশ্বর বলা হয়। ন্যায়াচার্যগণও স্বীকার করেন যে, আত্মান্তরই ঈশ্বর। তিনি জীবাত্মার ন্যায়ই আত্মা, তবে তাহার ন্যায় অল্পজ্ঞ নহেন, সর্বজ্ঞ। এখন প্রশ্ন এই যে আত্মা কি কখনও কর্তা হইতে পারে? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে ন্যায়াচার্যগণ অবশ্যই হাঁ বলিবেন। আমি বসি, আমি দৌড়াই, আমি আনন্দ করি, ইত্যাদি লৌকিক বাক্যও

সাংখ্যমতে প্রমাণাভাবে ঈশ্বর অসিদ্ধ, এবং যদি ঈশ্বর স্বীকারও করা যায়, তাহা হইলেও তিনি পুরুষ বিশেষ বলিয়া কর্তা হইতে পারেন না।

আত্মা যে কর্তা, এই পক্ষ সমর্থন করে। কিন্তু সাংখ্যাচার্যগণ বলেন যে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে আত্মা কর্তা হইতে পারে না। পুরুষের কোনও কর্তৃত্ব নাই। কর্তৃত্ব ধর্ম তাহাতে উপচরিত হয় মাত্র। দশানন সীতাহরণ করে কিন্তু সংসর্গ-দোষে সাগর বাঁধা পড়ে। দস্যুদলের সহিত পথ চলিবার ফলে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণও রাজপুরুষগণের দ্বারা ধৃত হন। রক্তবর্ণ জবাকুসুমের সন্নিধানে থাকার জন্য শ্বেত স্ফটিকও লোহিত বর্ণ ধারণ করে। এইরূপ আত্মা অকর্তা হওয়া সত্ত্বেও পুরুষ বা কর্তা বলিয়া ব্যবহৃত হয়। আত্মা প্রকৃতপক্ষে উদাসীন কৃত্যহীন, মাধ্যস্থ, সাক্ষী-মাত্র। তাহাকে কোনও রূপেই কর্তা বলা যায় না। সুতরাং ঈশ্বর বা পুরুষবিশেষ এই জগতের কর্তা হইতে পারেন না। প্রকৃতপক্ষে এই জগতের উপপত্তির জন্য কোনও কর্তা স্বীকারেরই প্রয়োজন নাই। কুম্ভকার যেরূপে ঘট নির্মাণ করে, সেই-রূপে কোনও অপ্রাকৃত, সর্ব উপাদান অভিজ্ঞ কর্তা যে এই জগৎ নামক মহাকার্যটি নির্মাণ করেন, এইরূপ কথা বলিবার কোন প্রয়োজন নাই। টুক্‌রা টুক্‌রা পরমাণু-রূপ অবয়ব সংযোগের ফলে এই জগৎ উৎপন্ন হয় নাই। ইহা প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতি নামক মূল কারণের পরিণাম বা বিকার।

জগৎ ঈশ্বর জন্য নহে, প্রকৃতির পরিণাম।

অর্থাৎ, সাংখ্যমতে, অষ্ট প্রকৃতি ষোড়শ বিকার এবং পুরুষ,—এই পঁচিশটি তত্ত্বই তত্ত্ব। প্রকৃতি বলিতে প্রকৃষ্ট কারণ বা তত্ত্বান্তর প্রসব ধর্মী পদার্থ বুঝায়। ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরুৎ, এবং ব্যোম এই পাঁচটি বিকার বা কার্যের, কারণ গন্ধ প্রভৃতি পাঁচটি তন্মাত্র। আবার তাহাদের কারণ অহঙ্কার। ইহার কারণ মহৎ বা বুদ্ধি। এই মহৎ বা বুদ্ধির কারণ অব্যক্ত বা মূল প্রকৃতি। অন্যরূপে প্রকাশ করিয়া বলা যায় যে সাংখ্য মতে অকার্য প্রকৃতিই মূল কারণ। ইহা সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই তিনটি গুণসম্পন্ন। সৃষ্টির পূর্বে ইহাতে এই তিনটি গুণই সমান শক্তিতে বিদ্যমান থাকে। ইহার এই অবস্থাকে সাম্যাবস্থা বলে। এই সময়ে কোন তত্ত্বান্তর জন্মিতে পারে না। তাহার পর পুরুষ চৈতন্যপাতে রজোগুণ প্রবল হইয়া উঠে এবং ইহার সাম্যাবস্থার অবসান হইয়া মহৎ-তত্ত্ব নামক সত্ত্বপ্রধান তত্ত্বের আবির্ভাব হয়। এই মহৎকে বুদ্ধিও বলা হয়। ইহাকে মহৎ বলা হয় কারণ প্রকৃতির অন্য সকল বিকৃতি অপেক্ষা ইহা সূক্ষ্ম ও ব্যাপক এবং ইহাকে বুদ্ধি বলা হয়, কারণ এই নিরবচ্ছিন্ন ব্যাপক বিশুদ্ধ বুদ্ধি হইতেই ব্যবহারিক জীবনে খণ্ড খণ্ড জীব বুদ্ধির উদ্ভব হয়। এই সত্ত্বপ্রধান বুদ্ধি বা মহৎ হইতে রজঃপ্রধান অহঙ্কারের উদ্ভব হয়। মহতে অহং সুপ্ত অবস্থায় থাকে। অহঙ্কারের উদ্ভবের সহিতই ইহা প্রকটিত হয়। এই সময় হইতেই আমি জানি বা

সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব।

আমার ইত্যাদি অভিমান হইতে থাকে। মহত্তের মত অহঙ্কারেরও সমষ্টি এবং ব্যষ্টি অবস্থা আছে। সমষ্টি অবস্থায় একটি মাত্র আমি থাকে এবং ব্যষ্টি অবস্থায় প্রত্যেকটি পুরুষে একটি করিয়া 'আমি' প্রকাশ পাইতে থাকে। এই অহঙ্কারও তন্মাত্র এবং ইন্দ্রিয় এই দুই ভাগে পরিণত হয়। বাচস্পতি মিশ্রের মতে সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয়ের জন্ম হয় এবং তামসিক অহঙ্কার হইতে অবিশেষ শব্দাদির বা তন্মাত্রের জন্ম হইয়া থাকে। কিন্তু বিজ্ঞান ভিক্ষুর মতে রাজসিক অহঙ্কার হইতে মন ভিন্ন দশটি ইন্দ্রিয়ের জন্ম হয় এবং মনের জন্ম হয় সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে। অর্থাৎ, সত্ত্বপ্রধান সাত্ত্বিক বা বৈকারিক অহঙ্কার হইতে ভিক্ষু মতে কেবল মনই জন্মায়, এবং মিশ্রমতে একাদশ ইন্দ্রিয়ই জন্মগ্রহণ করে। এইরূপ রজঃপ্রধান রাজসিক বা তৈজস অহঙ্কার হইতে, ভিক্ষুমতে বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু এবং উপস্থ, এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় এবং চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক. এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় জন্মলাভ করে। কিন্তু মিশ্রমতে তৈজস অহঙ্কার সাত্ত্বিক ও তামসিক অহঙ্কারের সহকারী মাত্র। তন্মাত্রের উৎপত্তি প্রসঙ্গে মিশ্রমত ও ভিক্ষুমতে কোন বৈষম্য নাই। যাহাই হউক, অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্রের উদ্ভব হয়। এই তন্মাত্র-গুলি হইতে আবার আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি হয়। প্রথমে শব্দ তন্মাত্র হইতে শব্দমাত্র গুণসম্পন্ন আকাশের উৎপত্তি হয়। তাহার পর শব্দ তন্মাত্রের সহিত স্পর্শ তন্মাত্র মিলিত হইয়া শব্দ ও গুণ সম্পন্ন বায়ু উৎপন্ন করে। তাহার পর এই দুইটি তন্মাত্রের সহিত রূপ যুক্ত হইয়া শব্দ স্পর্শ ও রূপ যুক্ত অগ্নির সৃষ্টি করে। অতঃপর রস তন্মাত্র এই তিনটি তন্মাত্রের সহিত যুক্ত হইয়া শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস যুক্ত জল উৎপন্ন করে। অবশেষে শব্দাদি চারিটি তন্মাত্রের সহিত গন্ধ তন্মাত্র মিলিত হইয়া শব্দ, স্পর্শ, রস, রূপ ও গন্ধ বিশিষ্ট পৃথিবী নামক মহাভূত উৎপন্ন করে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, মূল প্রকৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া তন্মাত্র পর্যন্ত সকলেই তত্ত্বান্তরের উৎপাদক বা কারণ। এই জন্য সাংখ্য দর্শনে অষ্ট প্রকৃতির কথা বলা হয়। এই অষ্ট প্রকৃতির মধ্যে মূল প্রকৃতি কেবল কারণই। অন্য সাতটি কার্যও বটে। তাই তাহাদের বিকৃতিও বলা হয়। ঈশ্বরকৃষ্ণ ইহাদের প্রকৃতি-বিকৃতি বলিয়াছেন। এই অষ্ট প্রকৃতি ভিন্ন ষোড়শ বিকার, অর্থাৎ একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত এবং পুরুষও সাংখ্য দর্শনে স্বীকৃত। এই ষোড়শ বিকার কোনও তত্ত্বান্তর প্রসব করে না। ইহারা বিকৃতি মাত্রই। এবং পুরুষ প্রকৃতিও নহেন, বিকৃতিও নহেন, কোনও কিছুর উৎপাদকও নহেন, কোন কিছুর দ্বারা উৎপাদিতও নহেন— ইনি অ-প্রকৃতি-বিকৃতি। ইহা হইতে বুঝা যায় যে সাংখ্য মতে জগতের মূল উপাদান কারণ প্রকৃতি। কিন্তু এই প্রকৃতি প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। অনুমানের সাহায্যেই

ইহাকে সাধন করিতে হয়। কিন্তু এই অনুমানটি কি ? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে প্রথমে সাংখ্য দর্শনে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ নামক গুণ তিনটির কিভাবে কল্পনা করা হয়, এবং তাহার পর কার্য ও কারণের সম্বন্ধ লইয়া কি বলা হয়, তাহা দেখিতে হয়।

মূল কারণ প্রকৃতি অনুমেয়।

সাংখ্যাচার্যগণ বলিয়া থাকেন যে জগতের প্রত্যেকটি জড় পদার্থ সুখ, দুঃখ ও মোহস্বরূপ। যেমন, মৈত্রের সত্যবতী নাম্নী নয়-বিনয়-বিলাস লীলাবতী ভার্যা, স্বামীর সুখের কারণ, সপত্নীগণের দুঃখের কারণ এবং চৈত্র প্রভৃতি বহু যুবকেরই মোহের কারণ। সত্যবতীর সকাশে মৈত্রের অন্তঃকরণে সুপ্ত সুখ ব্যক্ত হয় বা সত্ত্বগুণের প্রাদুর্ভাব হয়, এবং তিনি নিজের সুখময় অবস্থার অনুভব করেন। এইরূপ সত্যবতীর সকাশে সপত্নী-গণের অন্তঃকরণে সুপ্ত দুঃখ ব্যক্ত হয় বা রজোগুণের প্রাদুর্ভাব হয়। চৈত্র প্রভৃতি যুবকগণের অন্তরেও এইরূপে তমোগুণের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে সত্যবতী মৈত্র প্রভৃতির অন্তঃকরণে সত্ত্বাদি গুণের অভিব্যক্তির কারণ। এখন, যেমন পুষ্প প্রভৃতি পার্থিব বলিয়াই পার্থিব ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সহিত সন্নিকৃষ্ট হয়, যেমন রূপ তৈজস বলিয়াই তৈজস চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত সন্নিকৃষ্ট হয়, সেইরূপ সকল ক্ষেত্রেই সদৃশ কারণ হইতেই সদৃশ কার্যের অভিব্যক্তি হয়। সত্যবতী স্বয়ং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, অর্থাৎ সুখ, দুঃখ ও মোহস্বরূপ বলিয়াই মৈত্র প্রভৃতির অন্তঃকরণে সুখ প্রভৃতির অভিব্যক্তির কারণ হইতে পারেন। এইরূপ সকল জড় পদার্থের ক্ষেত্রেই। সকল জড় পদার্থই সুখ, দুঃখ ও মোহাত্মক বা ত্রিগুণময়। এখন, সকল দৃশ্য জড় পদার্থই ত্রিগুণময় বলিয়া তাহাদের মূল কারণকেও যে এইরূপ হইতে হইবে, তাহা কি বলা যায় না ?

সাংখ্যের ত্রিগুণতত্ত্ব

এই প্রশ্নের উত্তর পাইতে হইলে কোনও কায এবং তাহার উপাদান কারণের মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ বিদ্যমান তাহা আলোচনা করিয়া দেখিতে হয়। কার্য-কারণ সম্বন্ধের কার্য এবং কারণ এই দুইটি সম্বন্ধী। এখন, কার্যকে আমরা সৎ পদার্থ বলিয়া কল্পনা করিতে পারি, আবার অসৎ পদার্থ বলিয়াও কল্পনা করিতে পারি। এইরূপ কারণকেও আমরা সৎ অথবা অসৎ বলিয়া কল্পনা করিতে পারি। সুতরাং কার্যের সহিত তাহার উপাদান কারণের সম্বন্ধ প্রসঙ্গে, আমরা প্রথমেই চারিটি পক্ষ পাই। যেমন (১) অসৎ কারণ হইতে অসৎ কার্য উৎপন্ন হয়; (২) অসৎ কারণ হইতে সৎ কার্য উৎপন্ন হয়; (৩) সৎ কারণ হইতে অসৎ কার্য উৎপন্ন হয় এবং (৪) সৎ কারণ হইতে সৎ কার্য উৎপন্ন হয়। আবার অসৎ বলিতে অলীক বা অভাব বা ব্যবহারিক তত্ত্বও

কার্য-কারণ তত্ত্ব

বুঝা হয় বলিয়া আমরা এই চারিটি পক্ষ হইতে ষোলটি পক্ষ লাভ করিতে পারি। পুনরায় অসৎ বলিতে উৎপত্তির পূর্বে অসৎ কিন্তু উৎপত্তির পর সৎ পদার্থকেও বুঝা হয় বলিয়া, এবং সৎ বলিতে অসৎ বলিতে যাহা বুঝা হয় না তাহা বুঝা যাইতে পারে বলিয়া এবং অনেক দর্শনে পারমার্থিক সৎ ও ব্যবহারিক সৎ বলিয়া দ্বিবিধ সত্তা মানা হয় না বলিয়া, এই প্রসঙ্গে যে কি বিপুল সংখ্যক পক্ষ হইতে পারে, তাহা সহজেই কল্পনা করিতে পারা যায়। এখন এই বিপুল সংখ্যক পক্ষগুলির মধ্য হইতে আচার্যগণ নিম্নলিখিত কয়টিকেই বিশেষ করিয়া আলোচনার পক্ষ করিয়াছেন।

চারিটি পক্ষ

(১) অভাবরূপ (উপাদান) কারণ হইতে ভাবরূপ বা সৎ কার্য উৎপন্ন হয়; (২) পারমার্থিক সৎ কারণ হইতে ব্যবহারিক সৎ কার্য উৎপন্ন হয়; (৩) সৎ (পারমার্থিক ইত্যাদি বিশেষণের কোনও প্রয়োজন নাই) কারণ হইতে উৎপত্তির পূর্বে অসৎ, কিন্তু উৎপত্তির পর সৎ কার্য উৎপন্ন হয়; এবং (৪) সৎ (পারমার্থিক ইত্যাদি বিশেষণ ব্যর্থ) কারণ হইতে সৎ কার্য উৎপন্ন হয়।

প্রথম পক্ষটি অনেক বৌদ্ধ দর্শনাচার্য সমর্থন করিয়া থাকেন। এই পক্ষটিকে আমরা অসৎ কারণ বাদ আখ্যা দিতে পারি। এই মতে অভাব হইতেই ভাব পদার্থ উৎপন্ন হয়। আমরা অনেকেই বলিয়া থাকি যে বীজ হইতে অর্থাৎ ভাবরূপ পদার্থ হইতে, অঙ্কুর, বা ভাবরূপ কার্য পদার্থ, উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই পক্ষের সমর্থকগণ ইহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে বীজ বা কোন ভাব পদার্থ হইতেই অঙ্কুর বা কোন ভাব পদার্থ যে উৎপন্ন হয় তাহা বলা যায় না। কারণ, বীজের উপমর্দন বা বিনাশ না হইলে যে কোনও অঙ্কুর উৎপন্ন হইতে পারে না, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। অঙ্কুরের উৎপত্তি যদি বীজের বিনাশের অপেক্ষা না করিত তাহা হইলে গৃহস্থিত বীজ, যে বীজ মৃত্তিকা সলিল প্রভৃতির সহিত সংযুক্ত হয় নাই সেই বীজ হইতেও অঙ্কুর উৎপন্ন হইত। বস্তুতঃ বীজনাশের পূর্বে যে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, ইহা বলা কাহারও ইষ্ট নহে। তাই বীজনাশের পর, বীজাভাবের সৃষ্টি হইবার পর, যে অঙ্কুর উৎপন্ন হয় ইহাই বলিতে হয়। সুতরাং, আরও বলিতে হয় যে, অঙ্কুরের উৎপত্তির অব্যবহিত পূর্বক্ষণে বীজের কোনও সত্তা থাকে না, তাহা অভাবে পর্যবসিত হয়, এবং সেই অভাব হইতেই, অর্থাৎ সেই অভাবকেই উপাদান কারণ করিয়া অঙ্কুর উৎপন্ন হয়। অঙ্কুর যেমন বীজাভাবকেই উপাদান কারণ করিয়া উৎপন্ন হয়, সেইরূপ পট প্রভৃতি পদার্থও, তন্তু প্রভৃতি পদার্থের অভাবকেই উপাদান করিয়া উৎপন্ন হয়। পট প্রভৃতির উৎপত্তির

অসৎ কারণ বাদ (বৌদ্ধমত)

ক্ষেত্রে তন্তু প্রভৃতির বিনাশ হইয়া থাকে, এবং সেই বিনাশ হইতেই পট প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। ইহা অবশ্য সত্য যে তন্তুর যে নাশ হয়, বা তন্তুনাশরূপ অভাব হইতে যে পটের উৎপত্তি হয়, তাহা আমরা দেখিতে পাই না। কিন্তু সেইজন্য আমরা যে ইহা অস্বীকার করিব তাহা হইবে না। কারণ, যেমন অঙ্কুর বীজনাশরূপ অভাব হইতে উৎপন্ন হয়, পট প্রভৃতিও সেইরূপ তন্তু প্রভৃতির অভাব হইতে উৎপন্ন হয়, এই অনুমানের দ্বারা ইহা প্রমাণ করিতে পারা যাইবে। সংক্ষেপে বৌদ্ধমতে অসৎ কারণ বা অভাবরূপ উপাদান কারণ হইতেই সকল ভাব কার্য উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অসৎ কারণ বাদ খণ্ডন
(সাংখ্য মতে)

সাংখ্যাচার্যগণ অসৎ কারণ বাদ স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হইতে পারে না। বীজাদির বিনাশের ফলে অঙ্কুরাদির উৎপত্তি হয় বটে, কিন্তু সেইজন্য আমরা বলিতে পারি না যে বীজাদির বিনাশ হইতেই অঙ্কুরাদি উৎপন্ন হয়। অবশ্য কোনও পদার্থের ধ্বংস যদি নিরন্বয় হইত, কোনও কিছু বিনষ্ট হইয়া গেলে যদি কেবল অভাবই পড়িয়া থাকিত, তাহা হইলে অভাব হইতেই যে ভাবের সৃষ্টি হইতেছে তাহা বলা সম্ভব হইত। যেমন বীজনাশের অর্থ যদি নিছক শূন্যতা হইত, তাহা হইলে বীজনাশের ফলে অঙ্কুরের উৎপত্তির অর্থ বীজনাশ নামক অভাব হইতে অঙ্কুরের উৎপত্তি হইত। কিন্তু নিরন্বয় ধ্বংস প্রসিদ্ধ নহে। আমরা কেহ কখনও দেখি নাই যে কোন কিছু যখন বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন নিছক শূন্যতাই পড়িয়া থাকে। বরং আমরা ইহার বিপরীত ব্যাপারই লক্ষ্য করি। আমরা দেখি যে যখন কোন কিছু ধ্বংস হইয়া যায়, তখন অনেক ভাব পদার্থও পড়িয়া থাকে। যেমন, কাপড় ছিঁড়িয়া যায়, সূতা থাকে ; ধূপ পুড়িয়া যায়, ছাই থাকে ; ঘট নষ্ট হয়, কপাল থাকে ইত্যাদি। অতএব কোন ধ্বংসই নিরন্বয় নহে। বস্তুতঃ প্রত্যেকটি জন্য দ্রব্যই তাহার অবয়বগুলির এক একটি ব্যূহ বা বিন্যাস। এই ব্যূহের ধ্বংস হইলেই দ্রব্যটি ধ্বংস হয়, কিন্তু তাহার আরম্ভক অবয়বগুলি থাকিয়া যায়। বীজের ধ্বংস নিরন্বয় নহে। বীজ বিনষ্ট হয়, কিন্তু তাহার আরম্ভক অবয়বগুলি থাকে। ঐ অবয়বগুলির বীজরূপ ব্যূহ বিনষ্ট না হইলে উহারা কোন অভিনব ব্যূহ রচনা করিতে পারে না। সুতরাং বীজনাশ না হইলে অঙ্কুরের উৎপত্তি হয় না। বীজের বিনাশ অঙ্কুরের উৎপত্তির জন্য প্রয়োজন। কিন্তু সেইজন্য আমরা বলিতে পারি না যে এই নাশ হইতেই অঙ্কুর উৎপন্ন হয়। অঙ্কুর প্রকৃতপক্ষে উৎপন্ন হয়, বীজের অবয়বগুলি হইতে। সত্য কথা বলিতে কি, অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হইলে অভাব সর্বত্রই সুলভ বলিয়া সর্বত্রই সর্বকার্যের উৎপত্তি হইতে পারে। অর্থাৎ

কোনও বস্তুর ধ্বংস যদি নিরন্বয় হয়, বা কোনও বস্তুর বিনষ্ট হইয়া যাওয়া যদি সর্বথা বিনষ্ট হইয়া যাওয়া হয়, তাহা হইলে বট বীজের বিনাশ হইতে আম্রবীজের বা অন্য কোন কিছুরই বিনাশের কোন বিশেষ থাকিতে পারে না। এই জন্যই বটবীজের বা কোন কিছুর বিনাশ হইতে আমরা আম্রাঙ্কুরের উৎপত্তির আশা করিতে পারি। কিন্তু এইরূপ আশা অসৎ-কারণবাদীরাও করেন না। আম্র বৃক্ষের আশা থাকিলে তাঁহারা আম্রবীজই ভূমিতে প্রোথিত করেন। সেই জন্য সর্বথা বিনষ্ট বীজ হইতে বা অভাবরূপ উপাদান হইতে যে অঙ্কুরাদি ভাব পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহা বলা যায় না। বস্তুতঃ অভাব নিরুপাখ্য বা স্বরূপ রহিত ও তুচ্ছ[১] বলিয়া কোনও কার্যেরই উৎপত্তি অভাব হইতে হইতে পারে না। শশক-বিষাণ যেমন তোমার দেহে আঘাত হানিতে পারে না, বা গগন-কমল যেমন তোমার দেব পূজায় ব্যবহৃত হইতে পারে না, ঠিক তেমনই স্বরূপ রহিত অভাব হইতেও কোন কার্যই উৎপন্ন হইতে পারে না। অসৎকারণবাদ গ্রাহ্য নহে।

অসৎকারণবাদ খণ্ডন
(ন্যায়মত)

ন্যায় দর্শনেও অসৎকারণবাদ স্বীকার করা হয় না। ন্যায়াচার্যগণ অবশ্য অভাবকে তুচ্ছ বা কারণতা-বিহীন পদার্থ বলিয়া মনে করেন না। তাঁহাদের মতে আমরা হাঁ বলিয়া অভাবের নির্দেশ করিতে পারি না, কিন্তু না, নাই বলিয়া পারি। বিধিরূপে অভাব জ্ঞানের বিষয় হয় না, কিন্তু নিষেধরূপে হয়। শুধু তাহাই নহে। অভাব কারণও হইতে পারে। কারণ, কারণ বলিতে নিয়ত পূর্বভাবী পদার্থই বুঝা হয়, এবং অভাব নিয়ত পূর্বভাবী হইতে পারে। বস্তুতঃ আকাশ ক্রিয়াহীন হইলেও যেমন নিজের অবস্থিতির দ্বারা শব্দের কারণ হইয়া থাকে, অভাবও তেমনই ক্রিয়াহীন হইলেও নিজের অবস্থিতির দ্বারা কারণ হইতে পারে। সংক্ষেপে ন্যায়াচার্যগণের মতে অভাব তুচ্ছ বা স্বরূপ রহিত পদার্থ নহে। ভাব পদার্থগুলিও যেমন পদার্থ, অভাবও তেমনই পদার্থ। পদার্থ হিসাবে ইহাদের মধ্যে কোন বৈষম্য নাই। এমন কি দ্রব্যাদি ভাব পদার্থ যেমন কারণ হইতে পারে, অভাবও তেমনই কারণ হইতে পারে। তবে অভাবগত কারণতা কেবল নিমিত্ত কারণতাই হইতে পারে। অভাবের পক্ষে উপাদান কারণ, বা সমবায়ী কারণ হওয়া সম্ভব নহে; এবং সেই জন্যই অসৎকারণবাদ গ্রাহ্য নহে। অসৎকারণ-বাদীরা বীজের বিনাশকে অঙ্কুরের উপাদান কারণ বলেন। কিন্তু ন্যায়াচার্যগণের মতে বীজাদির বিনাশ অঙ্কুরাদি কার্যের সহকারী বা নিমিত্ত কারণ। বীজনাশের

১। ইহাই সাংখ্যমত তথাপি ১।৪৫ সাংখ্যসূত্রের অনিরুদ্ধ বৃত্তিতে কেন 'তস্মাৎ সিদ্ধোঽভাব' ইত্যাদি বলা হইয়াছে তাহা সুধীগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

পর যে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, ইহা ন্যায়াচার্যগণ স্বীকার করেন। কিন্তু বীজনাশরূপ অভাব যে অঙ্কুরের উপাদান কারণ, ইহা তাঁহারা স্বীকার করেন না। সাংখ্যাচার্যগণের ন্যায় তাঁহারাও নিরন্বয় ধ্বংসে বিশ্বাস করেন না। তাঁহারাও বলেন যে বীজের অবয়বগুলির পূর্বব্যূহ বা বীজরূপ ব্যূহ বিনষ্ট হইয়া যে নূতন ব্যূহ বা পরস্পর সংযোগ জন্মে, তাহা হইতেই অঙ্কুরের উৎপত্তি হয়। বীজের ধ্বংস হইতেই অঙ্কুরের উৎপত্তি হয় না। শুধু তাহাই নহে। বাজের বিনাশই অঙ্কুরের উৎপত্তির কারণ হইতে পারে না। তাহা যদি পারিত তাহা হইলে বীজচূর্ণ হইতেও অঙ্কুরের উৎপত্তি হইত। বীজচূর্ণ হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না। কিন্তু মৃত্তিকা সলিল প্রভৃতির সংযোগ জন্য বিনষ্ট বীজ হইতে অঙ্কুরের উৎপত্তি হয়। এই বৈষম্যের কারণ কি? একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে অঙ্কুর বীজনাশ হইতে উৎপন্ন না হইয়া বীজের বিনাশের পর বীজাবয়বগুলির যে অভিনব ব্যূহ উৎপন্ন হয়, সেই অভিনব ব্যূহ হইতেই উৎপন্ন হয়। শিলের উপর নোড়ায় করিয়া যখন বীজকে চূর্ণ করা হয়, তখন অঙ্কুরানুকূল এই ব্যূহ উৎপন্ন হইতে পারে না। কিন্তু সলিলাদির সংযোগে যখন বীজ বিনষ্ট হয় তখন এই ব্যূহ জন্মলাভ করিতে পারে। তাই বীজের বিনাশের পর তাহার অবয়ব সমূহ হইতে যে নূতন ব্যূহ উৎপন্ন হয় তাহা হইতেই অঙ্কুর যে উৎপন্ন হয়, ইহাই বলিতে হয়। বীজাভাব অঙ্কুরের উপাদান কারণ নহে। বস্তুতঃ দ্রব্য পদার্থই উপাদান বা সমবায়ী কারণ হইতে পারে। কোনও অভাব পদার্থের পক্ষে সমবায়ী বা অসমবায়ী কারণ হওয়া সম্ভব নহে। বীজাদির অভাব অঙ্কুরাদি কার্যের নিমিত্ত কারণই। অভাবরূপ উপাদান কারণ হইতে ভাব কার্য উৎপন্ন হইতে পারে না। অসৎকারণবাদ বিচারসহ নহে।

প্রথম পক্ষটি বা অসৎকারণবাদ যে বিচারসহ নহে তাহা আমরা দেখিলাম। এখন, দ্বিতীয় পক্ষটি বিচারসহ কিনা তাহা দেখা যাউক। এই পক্ষটিকে সৎকারণবাদ বা বিবর্তবাদ আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। অদ্বৈতাচার্যগণ এই পক্ষ সমর্থন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে ঘট পট প্রভৃতির দৃশ্য জগৎকে সৎ বলা যায় না। তুচ্ছ বা অলীক না হইলেও ইহার কোন পারমার্থিক মূল্য নাই। স্বপ্নাবস্থায় আমরা যাহা অনুভব করি, স্বপ্নকালে তাহা যে মিথ্যা এই জ্ঞান আমাদের হয় না। শুক্তিতে যখন আমাদের রজতবুদ্ধি হয় তখন এই রজত যে মিথ্যা রজত, এইরূপ কোন বোধ আমাদের থাকে না। কিন্তু স্বপ্ন যখন ভাঙিয়া যায়, যখন আমরা জাগিয়া উঠি তখন আমরা স্বপ্নে অনুভূত পদার্থগুলি যে মিথ্যা তাহা বুঝিতে পারি। শুক্তি বা অধিষ্ঠানবুদ্ধি যখন হয় তখন পূর্বানুভূত রজত যে মিথ্যা, তাহা

সৎকারণবাদ
(অদ্বৈত মত)

জানিতে পারি। এইরূপ ঘট পটাদির দৃশ্য জগৎ বা প্রপঞ্চ যতদিন না ব্রহ্মজ্ঞান, অর্থাৎ আত্মজ্ঞান হয় ততদিন পর্যন্ত সত্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান হইলে ইহা যে সত্য নহে তাহা বুঝিতে পারা যায়। শুক্তিতে প্রতীত রজত যেমন প্রতীতি-মাত্রশরীর বা স্বাপ্ন পদার্থগুলি যেমন জ্ঞান কালেই থাকে এই প্রপঞ্চও তেমনই প্রতীতি মাত্র শরীর। ইহা প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে নাই। রজত জ্ঞানের কারণ যেমন কর্তা প্রভৃতির রাগাদি দোষ, স্বাপ্ন জ্ঞানের কারণ যেমন নিদ্রা নামক দোষ, এই প্রপঞ্চ প্রতীতির কারণও তেমনই অনাদি অবিদ্যা নামক দোষ। শুক্তিরজত যেমন শুক্তির বিবর্ত, এই প্রপঞ্চও তেমনই ব্রহ্মের বিবর্ত। অর্থাৎ বস্তুর সহিত যে অন্যথা প্রথা বা অন্যরূপ জ্ঞান, তাহা বিকার এবং বস্তু না থাকিয়াও যে অন্যরূপ জ্ঞান তাহা বিবর্ত। দধি দুগ্ধের বিকার, ঘট মৃত্তিকার বিকার, কুণ্ডল প্রভৃতি অলঙ্কার সুবর্ণের বিকার, ভস্ম ভস্মীভূত রজ্জুর বিকার। শুক্তিরজত শুক্তির বিবর্ত, রজ্জুসর্প রজ্জুর বিবর্ত এবং প্রপঞ্চ ব্রহ্মের বিবর্ত। প্রতীয়মান শুক্তিরজত যেমন প্রতীয়মান হয় মাত্র, কিন্তু আসলে নাই, প্রতীয়মান প্রপঞ্চও তেমনই প্রতীয়মান হয় মাত্র, কিন্তু আসলে নাই। শুক্তিরজত যেমন অধিষ্ঠান শুক্তির বিবর্ত, প্রপঞ্চও তেমনিই অধিকারী ব্রহ্মের বিবর্ত। অতএব প্রপঞ্চ বন্ধ্যাদুহিতার ভ্রূবিলাসের ন্যায় অলীক না হইলেও, সৎ নহে। ইহার ব্যবহারিক সত্তা আছে বটে কিন্তু পারমার্থিক সত্তা নাই। সুতরাং প্রপঞ্চরূপ কার্যকে অসৎ বলা যায়। কিন্তু ইহার কারণ বা অধিষ্ঠানকে অসৎ বলা যায় না। আরোপিত পদার্থের সত্তা অপেক্ষা কারণরূপ অধিষ্ঠানের সত্তা উৎকৃষ্টই হইয়া থাকে। শুক্তিরজতের সত্তা মিথ্যা, প্রতি-ভাসিক, কিন্তু শুক্তির সত্তা ব্যবহারিক। কারণরূপ অধিষ্ঠানের সত্তা অধ্যস্তের সত্তার সমান উৎকৃষ্ট এই দৃষ্টান্ত নাই। বরং অধিষ্ঠানের সত্তা যে অধ্যস্তের সত্তা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এই দৃষ্টান্তই সুলভ। সংক্ষেপে, অধ্যস্ত বা প্রপঞ্চ ব্যবহারিক ভাবে সত্য হইলেও, অধিষ্ঠান বা ব্রহ্ম পারমার্থিক ভাবেই সত্য। বস্তুতঃ ব্রহ্মের সত্তাই পার-মার্থিক, অন্য সকল সত্তা অপারমার্থিক। অতএব, প্রপঞ্চের কারণ বা অধিষ্ঠান পারমার্থিক সৎ, কিন্তু প্রপঞ্চ বা কার্য অসৎ বা ব্যবহারিক সৎ। পারমার্থিক সৎ কারণ হইতেই বিবর্ত বা ব্যবহারিক সৎ কার্য উৎপন্ন হয়।

সৎকারণবাদ খণ্ডন
(সাংখ্যমতে)

সাংখ্যাচার্যগণ এই বিবর্তবাদ বা সৎ-কারণবাদ স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে এই প্রপঞ্চ যে মিথ্যা এই কথার কোন প্রমাণ নাই। শুক্তিরজতকে আমরা মিথ্যা বলি। কারণ এই রজতজ্ঞানের পর ইহা শুক্তি, রজত নহে, এইরূপ জ্ঞান, পূর্বজ্ঞানকে বাধিত করে যে জ্ঞান সেই জ্ঞানের উদয় হয়। শুক্তিরজত যদি বাধিত

না হইত, বাধজ্ঞানের যদি উদয় না হইত তাহা হইলে শুক্তিতে রজতের জ্ঞানকে মিথ্যা বলিতে পারা যাইত না। এমন, সাংখ্যাচার্যগণ বলিয়া থাকেন যে প্রপঞ্চ সম্বন্ধে কাহারও কখনও বাধজ্ঞান হয় না। মৃত্তিকাতে আমাদের যে মৃত্তিকাবুদ্ধি হয়, তাহা কখনও ইহা মৃত্তিকা নহে, ব্রহ্ম, এইরূপ বুদ্ধির দ্বারা বাধিত হয় না। ঐ মৃত্তিকা যতদিন না বিকার প্রাপ্ত হয়, যতদিন না ঘট প্রভৃতি দ্রব্য রূপে পরিণত হয় ততদিন আমাদের মৃত্তিকা-বুদ্ধিই হইয়া থাকে। পরে ইহা যখন বিকার প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ মৃত্তিকা হইতে ঘট প্রভৃতি দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তখন আমাদের ঘটাদি বুদ্ধি হয়। কিন্তু এই ঘটাদি বুদ্ধির দ্বারা ঐ মৃত্তিকাদি বুদ্ধি বাধিত হয় না। মৃত্তিকা বুদ্ধির পর ঘটবুদ্ধি, শুক্তিরজত বুদ্ধির পর শুক্তি বুদ্ধির মত নহে। শুক্তি রজত রূপে ভাসমান হইয়াছিল ইহা আমরা বলি। কিন্তু ঘটাদি মৃত্তিকারূপে ভাসমান হইয়াছিল, ইহা আমরা কেহই বলি না। সেইরূপ ইহা রজত নহে এইরূপ জ্ঞানের ন্যায় ইহা প্রপঞ্চ নহে, এইরূপ জ্ঞানও কাহারও হয় না। সেইজন্য প্রপঞ্চের সত্তা যে কেবল ব্যবহারিক তাহা বলা যায় না। প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মে প্রপঞ্চ কেমন করিয়া আরোপিত হইবে? শুক্তিতে রজতের আরোপ সম্ভব। কারণ শুক্তির সহিত রজতের বহু বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। কিন্তু ব্রহ্মের সহিত প্রপঞ্চের কোনও বিষয়ে সাদৃশ্য নাই। বস্তুতঃ ইহারা অত্যন্ত বিসদৃশ। ব্রহ্ম চিন্ময় এবং প্রপঞ্চ জড়। তমঃ এবং প্রকাশের মধ্যে যেমন অত্যন্ত বৈসাদৃশ্য আছে, ইহাদের মধ্যেও ঠিক তেমনই অত্যন্ত বৈসাদৃশ্য আছে। প্রকাশে যেমন অন্ধকারের আরোপ সম্ভব নহে, ব্রহ্মেও তেমনই প্রপঞ্চের আরোপ সম্ভব নহে। সুতরাং প্রপঞ্চকে অধ্যস্ত বা মিথ্যা বলার কোন কারণ নাই। পারমার্থিক সৎ কারণ হইতে ব্যবহারিক সৎকার্য উৎপন্ন হয়, এই মত বিচার সহ নহে।

ন্যায়দর্শনেও সৎকারণবাদ স্বীকার করা হয় না। ন্যায়মতেও প্রপঞ্চের কেবল ব্যবহারিক সত্তাই আছে, ইহা অসিদ্ধ। বস্তুতঃ ন্যায়মতে সত্তাকে পারমার্থিক ও ব্যবহারিক এইভাবে ভাগ করিবার কোনও অর্থ নাই। কোনও অনুভব যথার্থ কিনা, তাহা শেষ পর্যন্ত ব্যবহারের দ্বারাই স্থির করা হয়। সুতরাং ব্যবহারসিদ্ধ সত্তা অতিক্রান্ত সত্তার কোনও সঙ্গত অর্থ হয় না। অদ্বৈতাচার্যগণ যাহা তিন কালেই অবাধিত, তাহার সত্তাকেই পারমার্থিক সত্তা বলিয়া থাকেন। কিন্তু ন্যায়াচার্যগণের মতে কোন কিছু সৎ হওয়ার অর্থ এই নহে যে ইহা তিন কালেই অবাধিত থাকে। তাঁহাদের মতে যাহা সৎরূপে প্রতীয়মান হয় তাহাই সৎ। ঘটও সৎ পটও সৎ আবার ঈশ্বরও সৎ। বস্তুতঃ একান্ত তুচ্ছ বা অলীক বলিব কাহাকে? শশক-বিষাণ, গগন-

সৎকারণবাদ খণ্ডন
(ন্যায় মতে)

কমল, বন্ধ্যা দুহিতার ভ্রূবিলাস প্রভৃতিকে আমরা অলীক বলি। কিন্তু ইহারা কি একান্ত অলীক? ইহাদের কি খণ্ডশঃ প্রসিদ্ধি নাই? শশক-বিষাণ অলীক হইলেও শশক এবং বিষাণ অলীক নহে। বন্ধ্যা দুহিতার ভ্রূবিলাস অলীক হইলেও বন্ধ্যা, বা দুহিতা বা ভ্রূ, বা তাহার বিলাস যে প্রসিদ্ধ ইহা আশ্রমবাসী ঋষিগণও জানেন। অতএব কোন কিছুকেই একেবারে অলীক বলা যায় না। সর্বথা অসৎ বলিয়া কোন কিছুই হইতে পারে না। এইরূপ মিথ্যা বিষয় বলিয়াও কোন বিষয় থাকিতে পারে না। শুক্তিতে রজত জ্ঞান মিথ্যা, কিন্তু সেইজন্য বলা যায় না যে এই জ্ঞানের বিষয় যে রজত তাহা মিথ্যা। সত্য বিষয়ের জ্ঞান সত্য এবং মিথ্যা বিষয়ের জ্ঞান মিথ্যা এইরূপ কোনও কথা বলা যায় না। বিষয় দোষে জ্ঞান মিথ্যা হয়, এই নিয়মের কোন উপপত্তি নাই। শুক্তিতে প্রতীত রজত মিথ্যা রজত নহে। ইহা দেশান্তরীয় কালান্তরীয় রজত মাত্র। ইহার জ্ঞান এইজন্য মিথ্যা যে এই জ্ঞানে যেখানে যে সম্বন্ধে যাহার জ্ঞান হইয়াছে সেখানে সে সম্বন্ধে তাহা নাই। শুক্তিতে যখন রজতের জ্ঞান হয় তখন রজতত্ব যে ইদং এ সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান রহিয়াছে এই জ্ঞানই হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইদংএ রজতত্ব সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান থাকে না। সেই জন্যই অর্থাৎ ইদং, সমবায় এবং রজতত্ব প্রসিদ্ধ পদার্থ হইলেও, ইহা রজত এই জ্ঞান মিথ্যা। বিষয় দোষে, অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন কোনও মায়াময় রজতকে বিষয় করার জন্য যে এই জ্ঞান মিথ্যা হইয়াছে তাহা বলিবার কোন প্রয়োজন নাই। সুতরাং ন্যায়াচার্যগণের মতে কোন কিছুর মিথ্যা প্রতীতি তাহার মিথ্যাত্বের জ্ঞাপক নহে। যাহা সত্য সত্যই মিথ্যা তাহার মিথ্যা জ্ঞানও হইতে পারে না। যাহার কোনও দিন কোন সত্য জ্ঞান হয় নাই তাহার কোন মিথ্যা জ্ঞানও কখনও হইতে পারে না। আমার যদি কোনদিন বাস্তব রজতে যথার্থ রজত বুদ্ধি না হয় তাহা হইলে কোনও দিনই আমার শুক্তিতে বা অন্যত্র কোথাও অযথার্থ রজত বুদ্ধি হইবে না। সুতরাং প্রতীয়মান প্রপঞ্চকে যদি আমরা মিথ্যা বা মিথ্যাজ্ঞানের বিষয় বলি, তাহা হইলে আমাদের আরও বলিতে হইবে যে প্রপঞ্চ সত্য সত্যই মিথ্যা নহে, বা আমাদের কখনও কখনও বাস্তব প্রপঞ্চে যথার্থ প্রপঞ্চ বুদ্ধি হয়। কিন্তু ইহা বলাও যাহা আর এই প্রপঞ্চ মিথ্যা নহে ইহা বলাও তাহা। অতএব অধিষ্ঠানরূপ পারমার্থিক সৎকারণ হইতে বিবর্ত বা ব্যবহারিক সৎকার্য উৎপন্ন হয় এই মত আদরণীয় নহে।

সৎকারণবাদ ও অসৎকারণবাদ লইয়া আমরা আলোচনা করিয়াছি। এখন, আমরা তৃতীয় পক্ষটি লইয়া আলোচনা করিতে পারি। এই পক্ষটিকে অসৎ কার্যবাদ বলা হয়। ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা প্রভৃতি দর্শনে এই পক্ষটি সমর্থন করা হয়।

এই সকল দর্শনাচার্যের মতে কার্য প্রাগসৎ অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বে অসৎ। উৎপত্তির পূর্বে কার্য বিদ্যমান থাকিলে কারক ব্যাপারের দ্বারা তাহাকে উৎপন্ন করার কোন প্রয়োজনই থাকিত না। এখন সাংখ্যাচার্যগণ এই মত গ্রহণ করেন না। তাঁহাদের মতে অসৎ বা অবিদ্যমান পদার্থের কোন উৎপত্তিই হইতে পারে না। কার্য উৎপত্তির পূর্বে সূক্ষ্মভাবে কারণে বিদ্যমান থাকে। কারক ব্যাপার দ্বারা তাহাকে প্রকাশিত করা হয় মাত্র। কার্য বলিতে ঠিক উৎপাদিত বা যাহা পূর্বে ছিল না, কারণ বলে হইল, এইরূপ কোন পদার্থ বুঝায় না। যাহা পূর্বে অপ্রকাশিত বা অনভিব্যক্ত ছিল, কারণ বলে প্রকাশিত বা অভিব্যক্ত হইল, এইরূপ পদার্থই বুঝায়। এইরূপ, কারণ বলিতেও উৎপাদক বুঝায় না, বুঝায় প্রকাশক বা অভিব্যঞ্জক। সংক্ষেপে সাংখ্যমতে উৎপত্তির পূর্বে কার্য কোনও অবিদ্যমান পদার্থ নহে, পরন্তু সূক্ষ্মরূপে কারণ শরীরে বিদ্যমান কোনও পদার্থ।

ন্যায় মীমাংসা প্রভৃতি দর্শনে অসৎকার্যবাদ স্বীকার করে, কিন্তু সাংখ্যকারগণ ইহা গ্রহণ করেন না।

এই পক্ষটিই চতুর্থ পক্ষ। ইহাকে সৎকার্যবাদ আখ্যা দেওয়া হয়। সাংখ্যাচার্যগণ এই পক্ষটি সমর্থন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে অসৎ বা অবিদ্যমান পদার্থের উৎপত্তি হইতে পারে না। কারণ উৎপত্তির অর্থ হইল সত্তার সহিত সম্বন্ধ এবং দুইটি সৎ বা বিদ্যমান পদার্থের মধ্যেই সম্বন্ধ হইতে পারে। কোনও অসৎ বা অবিদ্যমান পদার্থের সহিত কোনও বিদ্যমান পদার্থের বা সত্তার সম্বন্ধ হইতে পারে না। কোনও বন্ধ্যা দুহিতার ভ্রূবিলাসে ত্রিভুবনে কেহ কখনও যৌবন চঞ্চল হয় না বা কোনও নয় বিনয় বিলাস লীলাবতী কামিনী কোনও বন্ধ্যাপুত্রের অনুরাগিণী হয় না। কোনও সম্বন্ধের কোনও সম্বন্ধী যে অসৎ হইবে তাহা বলা যায় না। অন্যরূপে প্রকাশ করিয়া বলা যায় যে সৎ ও অসতের মধ্যে, বিদ্যমান ও অবিদ্যমান পদার্থের মধ্যে কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। সুতরাং অসতের উৎপত্তি বা সত্তার সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে না। অসৎকার্যবাদ গ্রাহ্য নহে।

সাংখ্য মত

অসতের কোনও উৎপত্তি হইতে পারে না।

অসতের কোনও উৎপত্তি সম্ভব নহে। নিপুণতম শিল্পীও যেমন পীতকে নীল করিতে পারেন না, ঠিক তেমনই কেহই অবিদ্যমানকে বিদ্যমান করিতে পারে না। এখন হয়ত তুমি বলিতে পার যে যাহা একান্ত অসৎ তাহার কোন উৎপত্তি না হইতে পারে, কিন্তু ঘটাদি কার্য একান্ত অসৎ নহে। ইহা উৎপত্তির পূর্বে অসৎ হইলেও উৎপত্তির পরে সৎ হয়। এবং সেইজন্য বলিতে পারা যায় যে সত্তাবিশিষ্ট ঘট উৎপত্তির পূর্বে বিদ্যমান না থাকিলেও অসত্তাবিশিষ্ট ঘট থাকে এবং কুম্ভকারাদি

কারক ব্যাপারের দ্বারা তাহা সত্তাবিশিষ্ট হয়। কার্য একান্ত অসৎ নহে, প্রাগসৎ মাত্র। অতএব তাহার উৎপত্তি হইতে পারে। অন্যরূপে প্রকাশ করিয়া বলা যায় যে অসৎ কার্যবাদীগণ অসতের সহিত সত্তার সম্বন্ধ হইতে পারে না বলিয়া উৎপত্তির পূর্বে কার্য যে কোন না কোন ভাবে কারণে থাকিতে বাধ্য, সৎকার্যবাদীগণের এই কথা স্বীকার করিতে পারেন। কিন্তু তাহার পর তাঁহারা বলিতে পারেন যে এই কোন না কোন ভাবে থাকার অর্থ তিলের মধ্যে তৈল যে ভাবে থাকে সেইভাবে থাকা নহে। এইরূপ থাকার অর্থ হইল অসত্তা-বিশিষ্ট হইয়া থাকা বা অসৎ ঘটরূপে থাকা। এইরূপ পূর্বপক্ষীর বিরুদ্ধে সাংখ্যাচার্যগণ বলিয়া থাকেন যে এই কথা হাস্যকর। কারণ উৎপত্তির পূর্বে অসত্তাবিশিষ্ট ঘট থাকে এই কথার অর্থ কি? ঘটরূপ ধর্মী না থাকিলেও তাহার অসত্তারূপ ধর্ম থাকে? ইহা হইতেই পারে না। কারণ ধর্মী যদি না থাকিল তাহা হইলে তাহার ধর্ম থাকিবে কি করিয়া? তাহা হইলে এই কথাটির অর্থ কি, ঘট থাকে না? কিন্তু তাহা হইলে তাহার উৎপত্তি কেমন করিয়া হয়? বস্তুতঃ কালভেদে ঘটে সত্তা ও অসত্তা স্বীকার করিলে, উৎপত্তির পূর্বে এবং উত্তর, এই উভয় কালেই ঘটের বিদ্যমানতা স্বীকার করিতে হয়, বা অসৎকার্যবাদ যে বিচারসহ নহে, তাহাই বলিতে হয়। ফল কথা, উৎপত্তির পূর্বে ঘট কোন না কোন ভাবে থাকে ইহা যদি স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে আরও স্বীকার করিতে হইবে যে ইহা সূক্ষ্মভাবে আচ্ছাদিত অবস্থায় তাহার কারণ শরীরে বিদ্যমান থাকে। অসত্তাবিশিষ্ট হইয়া থাকে বা কালভেদে সত্তা ও অসত্তা নামক ধর্ম দুইটির আশ্রয় হয়, ইত্যাদি কথার অন্য কোনও অর্থ হয় না।

কার্য যে কালভেদে সত্তা ও অসত্তারূপ ধর্মদ্বয়ের আশ্রয় ইহাও অসৎকার্যবাদীগণ বলিতে পারেন না।

এখন হয়ত পূর্বপক্ষী বলিবেন যে ঘট প্রভৃতি কার্য যদি উৎপত্তির পূর্বেই বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে কুম্ভকারাদি কারক ব্যাপারের কোনও অর্থ থাকে না। কারণ যাহা বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাকে উৎপাদন করিবার চেষ্টা কেহ করে না। আমার করতলে যে আমলকীটি রহিয়াছে, তাহাকে আহরণ করিবার জন্য আমি বৃক্ষশিরে আরোহণ করি না। অতএব কুম্ভকার প্রভৃতি কারক ব্যাপারের যদি কোন অর্থ থাকে কার্যকে উৎপন্ন করিবার জন্য যে সকল আয়াস স্বীকার করা হয় তাহা যদি নিরর্থক না হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে উৎপত্তির পূর্বে কার্য বিদ্যমান থাকে না। অবিদ্যমান কার্যকেই উৎপাদন করিবার জন্য আমরা যত্ন করিয়া থাকি। বিদ্যমানকে বিদ্যমান করিবার কোনও অর্থই নাই। এইরূপ, পূর্বপক্ষীর বিরুদ্ধে

কার্য প্রাগসৎ বলিয়া কারক ব্যাপার নিরর্থক নহে।

সাংখ্যাচার্যগণ যাহা বলেন, তাহার সারমর্ম নিম্নরূপ। কুম্ভকারাদি কারক ব্যাপার প্রাগসৎ ঘট প্রভৃতিকে বিদ্যমান করিবার জন্য নহে। উৎপত্তির পূর্বে ঘট প্রভৃতি থাকে, তবে আচ্ছাদিত অবস্থায় থাকে। সেই আচ্ছাদন দূর করা প্রয়োজন। কোনও লজ্জাশীলা নববধূর অবগুণ্ঠন লুণ্ঠন করিয়া তাঁহারা মুখমণ্ডলকে যেমন অভিব্যক্ত বা প্রকাশিত করিতে হয়, সেইরূপ কারক ব্যাপারের দ্বারা কার্যের আচ্ছাদন দূর করিয়া তাহাকে প্রকটিত বা প্রকাশিত করা হয়। সংক্ষেপে, প্রাগ্‌সৎ ঘটাদি কার্য কারক ব্যাপারের পূর্বে অনভিব্যক্ত থাকে—কারক ব্যাপারের দ্বারা তাহাদের অভিব্যক্ত করা হয়। যেমন তিলকে নিপীড়িত করিয়া তাহার অভ্যন্তরে প্রচ্ছন্ন ভাবে বিদ্যমান তৈলকে প্রকাশিত করা হয়, যেমন গাভীর উদরে অদৃশ্যভাবে বর্তমান দুগ্ধকে দোহন ব্যাপার দ্বারা অভিব্যক্ত করা হয়, ঠিক সেইরূপ উপাদান কারণের অভ্যন্তরে, সূক্ষ্মভাবে আচ্ছাদিতরূপে অবস্থিত কার্যকে কারক ব্যাপারের দ্বারা অভিব্যক্তই করা হয়, উৎপন্ন করা হয় না। অতএব উৎপত্তির পূর্বেও কার্য সৎ; ইহা বলিলে কারক ব্যাপার যে নিরর্থক তাহা বলিতে হয় না।

বস্তুতঃ ইহা কোনও প্রাগসৎ কার্যের কারণ বা উৎপাদক এইরূপ কোন দৃষ্টান্তই নাই। কুম্ভকার প্রভৃতিকে যে এইরূপ দৃষ্টান্ত বলিব তাহা হইবে না। কারণ, ইহারা ন্যায় মীমাংসা প্রভৃতি দর্শনাচার্যগণের সম্মত হইলেও সংকার্যবাদীগণের সম্মত নহে। বস্তুতঃ কারণ যদি কার্যের সহিত সম্বন্ধ যুক্ত হইয়া কার্য উৎপন্ন করে, তাহা হইলে উৎপত্তির পূর্বেই কার্যকে বিদ্যমান থাকিতে হয়। কারণ, অসৎ, অবিদ্যমান পদার্থের সহিত কাহারও কোন সম্বন্ধ সম্ভব নহে। এবং কারণ যদি কার্যের সহিত সম্বন্ধ যুক্ত না হইয়াই কার্য উৎপাদন করিতে পারে তাহা হইলে সকল কারণ হইতেই সকল কার্য উৎপন্ন হওয়ার প্রসঙ্গ হয় বা যে কোন কারণ হইতেই যে কোন কার্য যে উৎপন্ন হইতে পারে, এইরূপ অসম্ভব কথা বলিতে হয়। অর্থাৎ কুম্ভকারাদি যদি ঘটাদির সহিত সম্বন্ধ যুক্ত হইয়াই তাহাদের উৎপাদন করিয়া থাকে, তাহা হইলে উৎপত্তির পূর্বেও যে ঘট প্রভৃতি পদার্থ থাকে তাহা বলিতে হয়। কারণ, যাহা অবিদ্যমান তাহার সহিত কেহই সম্বন্ধ যুক্ত হইতে পারে না। কোনও কুম্ভকারই খ-পুষ্পের সহিত সম্বন্ধ যুক্ত হইতে পারে না, বা গগনকমলের দ্বারা তাহার ইষ্টদেবের পূজা করিতে পারে না। অতএব যাঁহারা উৎপত্তির পূর্বে ঘট প্রভৃতি কার্য অসৎ ইহা বলিতে চাহিবেন তাঁহাদের পক্ষে কারণ যে কার্যের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়াই কার্য উৎপাদন করে, তাহা বলা চলিবে না। কিন্তু তাঁহারা কি বলিবেন যে সম্বন্ধযুক্ত না হইয়াই কারণ কার্য উৎপন্ন করে?

অসৎকার্যবাদী বলিতে পারেন না যে কারণ কার্যের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া কার্য উৎপন্ন করে। কারণ, তাহা হইলে সৎকার্যবাদই সিদ্ধ হয়।

এইরূপ কথা যে তাঁহারা বলিয়া ফেলিতে পারেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সত্য-কথা বলিতে কি, ইহাতে তাঁহাদের বিপদ বাড়িয়াই যায়। কারণ, মৃত্তিকা প্রভৃতি যদি ঘট প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধযুক্ত না হইয়াই ঘট প্রভৃতির কারণ হয়, তাহা হইলে ইহারা যে কেন পটের কারণ হইতে পারে না, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। কারণ, মৃত্তিকা প্রভৃতি প্রাগসৎ ঘটের সহিত যেরূপ সম্বন্ধহীন, প্রাগসৎ পটের সহিতও তেমনই সম্বন্ধহীন। সেইজন্য মৃত্তিকা হইতে পট না হইয়া কেন যে ঘট হইবে তাহা বুঝিতে পারা যায় না। কোনও নরপতি যখন তাঁহার অন্তঃপুরে বাস করে না এইরূপ কোনও ব্যক্তিকে তাঁহার মাণিকটি দান করিতে চাহেন তখন কেন যে সেই মাণিকটি আমাকে না দিয়া তোমাকেই তিনি দিবেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। তুমিও তাঁহার অন্তঃপুরে বাস কর না এবং আমিও তাঁহার অন্তঃপুরে বাস করি না। এই ব্যাপারে তোমার এবং আমার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। সুতরাং তিনি যেমন তোমায় তাঁহার মাণিকটি দান করিতে পারেন, তেমনই আমায়ও পারেন। এইরূপ উৎপত্তির পূর্বে মৃত্তিকার সহিত ঘটের যদি কোন সম্বন্ধ না থাকে তাহা হইলে মৃত্তিকার নিকট অজাত ঘটও যাহা, অজাত পটও তাহাই। সুতরাং মৃত্তিকা হইতে যেমন ঘটের উৎপত্তি হইতে পারে, ঠিক তেমনই আবার অন্য যে কোনও পদার্থের উৎপত্তি হইতে পারে। তাই অজাতকার্যের সহিত সম্বন্ধযুক্ত না হইয়াই কারণ যে কার্যের জনক হয় বা হইতে পারে, তাহা বলা যায় না। যিনি ইহা বলিতে চাহিবেন, তাঁহাকে তৃণ পাংশু বা বালুকা হইতে যে রজত, সুবর্ণ, মণি, মুক্তা, প্রবাল প্রভৃতি উৎপন্ন হইতে পারে, এইরূপ অসম্ভব কথা বলিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

কিন্তু তাঁহারা ইহাও বলিতে পারেন না যে কারণ কার্যের সহিত সম্বন্ধযুক্ত না হইয়া কার্য উৎপাদন করে। কারণ তাহাতে উপাদান ব্যবস্থা থাকে না।

এখন হয়ত পূর্বপক্ষী বলিতে পারেন যে কারণ কার্যের সহিত সম্বন্ধযুক্ত না হইয়াই কার্য উৎপন্ন করে কিন্তু তাহাতে যে কোন উপাদান কারণ হইতে যে যে কোন কার্য উৎপন্ন হয়, এইরূপ আপত্তিকর কথা বলিতে হয় না। কারণ, কোনও কারণ যে কার্য উৎপন্ন করিতে সমর্থ সেই কার্যই উৎপন্ন করিয়া থাকে। যেমন মৃত্তিকা হইতে ঘট, তন্তু হইতে পট সুবর্ণ হইতে কুণ্ডল ইত্যাদি যে উৎপন্ন হয়, ইহা দেখিতেই পাওয়া যায়। সেইজন্য বিশেষ কারণ হইতেই যে বিশেষ কার্য উৎপন্ন হয় তাহা বলিতেই হয়। কিন্তু তাই বলিয়া কারণ কারণ বিশেষের গর্ভে যে কার্য বিশেষ আচ্ছাদিত অবস্থায় বাস করে তাহা বলিবার কোনও প্রয়োজন নাই। কারণ, কারণে শক্তি বিশেষ বা সামর্থ্য-বিশেষ কল্পনা

কারণ বিশেষে বিশেষে কার্যানুকূল শক্তি কল্পনা করিয়া উপাদান ব্যবস্থা কি রক্ষা করা যায়?

করিলেই কাজ মিটিয়া যায়। অর্থাৎ যে কারণ যে কার্য উৎপাদনে শক্ত সেই কারণ সেই কার্যই উৎপন্ন করে। মৃত্তিকা অজাত ঘটের সহিত সম্বন্ধযুক্ত না হইয়াও পট উৎপন্ন না করিয়া ঘট উৎপন্ন করে কারণ ইহা ঘট উৎপাদনেই সমর্থ। অতএব, যে কোন উপাদান হইতে যে যে কোন কার্য উৎপন্ন হয় না, তাহার অর্থাৎ উপাদান কারণ ব্যবস্থার উপপত্তির জন্য উপপত্তির পূর্বে কারণ যে প্রচ্ছন্নভাবে তাহার উপাদান কারণে অবস্থিত থাকে, এইরূপ কথা বলিবার বা সৎকার্যবাদ গ্রহণ করিবার কোন প্রয়োজন হয় না।

অবশ্যই নহে।

এইরূপ পূর্বপক্ষীর বিরুদ্ধে সাংখ্যাচার্যগণের মূল বক্তব্য এই যে কারণগত শক্তি বা সামর্থ্য কি অজাতকার্যের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া কার্য উৎপন্ন করে, অথবা সম্বন্ধযুক্ত না হইয়াই করে? যদি প্রথম কল্পটি স্বীকার করা হয় তাহা হইলে অজাত কার্য যে জন্মিবার পূর্বেও থাকে তাহা স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং অসৎকার্যবাদীগণ প্রথম কল্পটি গ্রহণ করিতে পারেন না। কিন্তু তাঁহারা দ্বিতীয় কল্পটিও গ্রহণ করিতে পারেন না। কারণ, মৃত্তিকাতে ঘটানুকূল শক্তি যদি ঘটের সহিত সম্বন্ধহীন হইয়া ঘট উৎপন্ন করে, তাহা হইলে তাহা ঘট উৎপন্ন না করিয়া পট বা অন্য কিছু যে কেন উৎপন্ন করিবে না তাহা বুঝিতে পারা যায় না। অতএব অসৎকার্যবাদীগণ বিশেষ কারণে বিশেষ কার্যানুকূল বিশেষ শক্তি কল্পনার দ্বারা যে কারণ বিশেষ হইতে কার্যবিশেষ উৎপন্ন হওয়ার বা উপাদান ব্যবস্থার ব্যবস্থা করিবেন, তাহা হইবে না।

উপাদান কারণ ও কার্য অভিন্ন বলিয়া সৎকার্যবাদই সিদ্ধ।

প্রকৃত কথা এই যে, উপাদান কারণ ও কার্য অভিন্ন[২]। উপাদান কারণ হইতে কার্যের কোন পৃথক সত্তা নাই। পট তন্তু হইতে ভিন্ন নহে। ইহারা যদি পরস্পর ভিন্ন হইত, তাহা হইলে ইহাদের পরস্পর অপ্রাপ্তি থাকিত। আমরা পটটি এখানে রহিয়াছে এবং সুতা ওখানে রহিয়াছে, বা পটটি রহিয়াছে কিন্তু সুতা নাই এইরূপ দেখিতে পাইতাম। দুইটি মেষের মধ্যে পরস্পর অপ্রাপ্তি দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহাদের উভয়েরই নিজস্ব সত্তা আছে। অর্থাৎ একটি মেষ সর্বদাই অপর মেষটির শৃঙ্গে তাহার শৃঙ্গ সংযুক্ত করিয়া দণ্ডায়মান থাকে না। এবং আমরা ইহাদের যে কোন একটিকে ত্যাগ করিয়া অপরটিকে গ্রহণ করিতে পারি। কিন্তু তন্তু ও পটের মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধ নাই। পট আছে, অথচ তন্তু নাই, ইহা আমরা কল্পনাও করিতে

২। সাংখ্যমতে অবয়বী অবয়ব অতিরিক্ত হইতে পারে না। মিশ্র প্রভৃতির সাংখ্যমতের আলোচনায়ও ইহাই বুঝা যায়। কিন্তু অনিরুদ্ধ বৃত্তি-তে (১।৪২) 'অত্রোচ্যতে অবয়বাবয়বিনোর্ভেদাৎ' ইত্যাদি কেন বলা হইল তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

পারি না। ন্যায়াচার্যগণও ইহা স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহারাও বলেন যে তন্তু হইতে পটকে সরাইয়া লওয়া যায় না। তথাপি তাঁহারা ইহাদের অত্যন্ত ভিন্ন বলেন এবং ইহাদের মধ্যে যে পরস্পর অপ্রাপ্তি নাই, ইহার উপপত্তির জন্য সমবায় নামক সম্বন্ধের কল্পনা করিয়া থাকেন। কিন্তু সাংখ্যাচার্যগণের মতে এইরূপ কোনও সম্বন্ধ হইতে পারে না। সেইজন্য সাংখ্যাচার্যগণ তন্তু হইতে অতিরিক্ত পট নামক কোনও দ্রব্যান্তর যে সমবায় সম্বন্ধে তন্তুতে বিদ্যমান থাকে, তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে পট কোন দ্রব্যান্তর নহে, তন্তুই। বস্তুতঃ পট যদি অর্থান্তর হইত, তন্তুর ধর্ম পটের ধর্ম হইত না। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে তন্তুর ধর্মই পটের ধর্ম। যে তন্তু সমূহ দ্বারা পট নির্মিত হয়, সেই তন্তুগুলির ওজন বা গুরুত্ব ও পটের গুরুত্ব একই। যে সুবর্ণ হইতে কুণ্ডল নির্মিত হয়, সেই সুবর্ণের ওজনই কুণ্ডলের ওজন। অতএব উপাদান কারণ ও কার্য যে অভিন্ন ইহা বলাই যুক্তিসঙ্গত। উপরন্তু সমবায় বলিয়া কোনও সম্বন্ধ স্বীকার করা যায় না। এই পদার্থটি ন্যায়-বৈশেষিকাদি দর্শনাচার্যগণের প্রক্রিয়ামাত্র সিদ্ধ। অতএব উপাদান কারণে কার্য সমবেত হয়, বা উপাদান কারণ ও কার্য অভিন্ন নহে ইত্যাদি কথা বলা অনুচিত। কার্যের সত্তা তাহার উপাদান কারণের সত্তা হইতে ভিন্ন নহে।

এখন তুমি বলিতে পার যে উপাদান কারণ ও কার্য যদি অভিন্নই হয় তাহা হইলে তাহাদের একরূপ ব্যবহার নাই কেন? বস্ত্রের দ্বারা প্রাবরণ বা শীত নিবারণাদি কার্য করা হয়, কিন্তু সূতার দ্বারা এই কার্য করা হয় না। সুতরাং তাহাদের অভিন্ন বলি কি করিয়া? তোমার এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে সাংখ্যাচার্যগণ

একটি আশঙ্কা ও তাহার নিবাস।

বলিবেন যে প্রত্যেক বাহক যেমন বিযুক্তভাবে শিবিকা বহন করিতে না পারিলেও মিলিতভাবে পারে সেইরূপ প্রত্যেকটি সূতা বিযুক্ত ভাবে শীতাদির নিবারণ করিতে না পারিলেও একভাবে বিন্যস্ত হইয়া পারে। বস্তুতঃ বস্ত্র সূতার বিশেষ প্রকারের মিলন বা বিন্যাস ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। সেইজন্য উপাদান কারণ ও কার্যের মধ্যে কোন ভেদ নাই। এখন উপাদান কারণ ও কার্য অভিন্ন ইহা বলিলে কার্য যে উৎপত্তির পূর্বেও বিদ্যমান তাহা বলিতে হয়। কারণ, উপাদান কারণের সত্তাই কার্যের সত্তা। কারণের যে কার্য উৎপন্ন হওয়ার পূর্বে সত্তা থাকে তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। সুতরাং কার্যেরও যে উৎপত্তির পূর্বে সত্তা থাকে তাহা স্বীকার করিতে হয়। কার্য ও কারণের সম্বন্ধ প্রসঙ্গে ইহাই সাংখ্যাচার্যগণের চরম কথা।

তাহা হইলে দেখা গেল যে সাংখ্যাচার্যগণের মতে ব্যক্ত পদার্থ মাত্রই সুখ, দুঃখ

ও মোহস্বরূপ, বা ত্রিগুণময়, এবং উপাদান কারণের সত্তাই কার্যের সত্তা। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে জগতের মূল উপাদান কারণও ত্রিগুণময়। এই উপাদান কারণের নামই প্রকৃতি। অতএব, প্রকৃতি প্রত্যক্ষগম্য পদার্থ না হইলেও অলীক পদার্থ নহে। পূর্বোক্ত অনুমানের সাহায্যেই ইহাকে প্রমাণিত করিতে পারা যায়। এই অনুমানকে যে শ্রুতিবিরোধী বলিব তাহা হইবে না। কারণ,

প্রকৃতি সাধক অনুমান।

ইহা শ্রুতিবিরোধী নহে।

অজামেকাং লোহিত শুক্ল কৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং স্বরূপাঃ

ইত্যাদি শ্রুতিও এই তত্ত্বের অনুকূল। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটি গুণযুক্ত প্রকৃতি হইতেই যে প্রজা সৃষ্টি হইয়াছে, ইহাই এই শ্রুতিতে বলা হইয়াছে। অবশ্য অনেকে এই শ্রুতির অন্তর্গত অজা শব্দটিকে রূঢ়্যর্থে গ্রহণ করিয়া পশু বিশেষ বুঝিতে চাহিয়াছেন, বা আমূল মূল প্রকৃতিকে বুঝিতে চাহেন নাই। কিন্তু ইহার কোনও অর্থ নাই। অধ্যাত্মবিদ্যার ক্ষেত্রে এইরূপ অর্থ চলিতেই পারে না। সেই জন্য আমাদের এই শব্দটির যৌগিক অর্থ গ্রহণ করিয়া ইহার দ্বারা মূল প্রকৃতিকেই বুঝিতে হইবে। এইরূপ লোহিত, শুক্ল এবং কৃষ্ণ শব্দের লক্ষণা দ্বারা রজঃ সত্ত্ব এবং তমঃ এই গুণ তিনটিকেই বুঝিতে হইবে। অতএব প্রকৃতিতত্ত্ব যে শ্রুতি সম্মত তাহা বুঝা যায়। যাহাই হউক, জগতের উপাদান কারণ প্রকৃতি, ঈশ্বর কুম্ভকারের ন্যায় অচেতন পরমাণু হইতে এই জগৎ নির্মাণ করেন নাই। ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ, এই ন্যায়মত বিচার সহ নহে।

সাংখ্যাচার্যগণের কথা আমরা শুনিলাম। এখন আমরা ন্যায়াচার্যগণের কথা শুনিতে পারি। ন্যায়াচার্যগণের মতে, আত্মা কর্তা নহে, এই সাংখ্য মতের কোনও প্রমাণ নাই। সকল লৌকিক এবং বৈদিক ব্যবহারই আত্মাকে কর্তা বলিয়া স্বীকার করিয়া হইয়া থাকে। সাংখ্যাচার্যগণও স্বীকার করিয়া থাকেন যে আত্মার কর্তৃত্ব ধর্ম লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহার সিদ্ধ। তথাপি তাঁহারা ইহাকে উপ-চরিত ধর্ম বলিয়া মনে করেন। কিন্তু প্রশ্ন এই যে এই-রূপ মনে করিবার কারণ কি? আত্মা কি কোন কিছুরই, এমন কি চৈতন্য বা জ্ঞানেরও আশ্রয় হইতে পারে না? না, আত্মা চৈতন্য বা জ্ঞানের আশ্রয় হইলেও কর্তৃত্ব প্রভৃতি ধর্মের আশ্রয় হইতে পারে না? সাংখ্যাচার্যগণ অবশ্য আত্মাকে কোন কিছুরই আশ্রয় বলিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহাদের মতে আত্মা চৈতন্যের আশ্রয় নহে, চৈতন্য স্বরূপ।

সাংখ্যমত নিরাকরণ।

আত্মা কর্তা হইতে পারে। মানস প্রত্যক্ষে আত্মা জ্ঞানাশ্রয় রূপেই ভাসমান হয়।

আত্মাকে এইরূপে কল্পনা করিলে যে তাহাকে কর্তৃত্ব প্রভৃতি ধর্মের আশ্রয় বলা যায় না, তাহা সত্য। কিন্তু আত্মাকে চৈতন্যস্বরূপ বলিব কেন? আত্মার যে মানস প্রত্যক্ষ আমাদের হইয়া থাকে, তাহাতে আত্মা চৈতন্যরূপে ভাসমান হয় না। বস্তুতঃ সহজ মানস প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করিলে আত্মা ও জ্ঞান যে অত্যন্ত ভিন্ন তাহাই বলিতে হয়। আরও দেখ, আমাদের জ্ঞান মাত্রই সবিষয়ক। প্রত্যেক জ্ঞানেরই কোন না কোন বিষয় আছে। ঘটজ্ঞানের বিষয় ঘট, পটজ্ঞানের বিষয় পট, নীল-জ্ঞানের বিষয় নীল, পীতজ্ঞানের বিষয় পীত ইত্যাদি। জ্ঞান হইয়াছে, অথচ তাহা কোন বিষয়ের হয় নাই, এইরূপ অদ্ভুত ব্যাপার আমরা কেহ কখনও দেখি নাই। শুধু দেখি নাই নয়, দেখিবার আশাও রাখি না। কারণ জ্ঞান মাত্রই নিরাকার বা নিজস্ব আকার রহিত। যে পদার্থ ইহার বিষয় হয়, ইহা তাহারই আকার গ্রহণ করে। ঘটজ্ঞান ঘটের আকার গ্রহণ করে, পটজ্ঞান গ্রহণ করে পটের আকার। তাহা যদি না হইত তাহা হইলে ঘট পট প্রভৃতি জ্ঞানের বিষয় যে জ্ঞানের আকার মাত্র নহে, কিন্তু জ্ঞান নিরপেক্ষ বাহ্যবস্তু তাহা বলিবার কোন উপায় থাকিত না, এবং বিজ্ঞানবাদীগণেরই জয় হইত। কিন্তু বিজ্ঞানবাদীগণের জয়ী হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। কারণ, জ্ঞান যে নিরাকার তাহা সহজেই বুঝা যায়। ঘটজ্ঞানকে পটজ্ঞান হইতে জ্ঞানের বিশেষণ, বা ঘট ও পটের সাহায্যেই পৃথক করিতে পারা যায়। এই জ্ঞান দুইটির মধ্যে জ্ঞানাংশে কোন পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু জ্ঞানের যদি নিজস্ব কোন আকার থাকিত, তাহা হইলে এই দুইটি জ্ঞানের মধ্যে জ্ঞানাংশেও যে পার্থক্য রহিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যাইত। বস্তুতঃ জ্ঞান যদি নিরাকার না হইত, তাহা হইলে ঘটজ্ঞান হইতে ঘটকে বিযুক্ত করিয়াও আমরা জ্ঞানকে ধরিতে পারিতাম। কিন্তু এইরূপে আমরা ঘটজ্ঞানকে বা কোন জ্ঞানকেই ধরিতে পারি না। আমরা যখনই কোন জ্ঞানকে ধরিতে যাই, তখনই হয় ঘটজ্ঞানকে ধরি, নয় পটজ্ঞানকে ধরি, নয় অন্য কোন বিষয়ের জ্ঞানকে ধরি। জ্ঞান নিরাকার বলিয়াই এইরূপ হয়। বিষয়ের আকারে আকারিত নহে যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানের কোন মানস প্রত্যক্ষ হয় না, বা এইরূপ জ্ঞান যে আছে তাহা বলাও যায় না। যাহাই হউক, জ্ঞান মাত্রই সবিষয়ক। সুতরাং জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষের অর্থ হইল বিষয়ক জ্ঞানের প্রত্যক্ষ। এমন, আত্মা এবং জ্ঞান যদি অভিন্ন হইত; তাহা হইলে ঘট জ্ঞানের যেমন ঘটবিষয়করূপে মানস প্রত্যক্ষ হয়, ঘটের জ্ঞাতারও ঠিক তেমনই ঘটবিষয়ক রূপে প্রত্যক্ষ হইত; কিন্তু তাহা হয় না। ঘট জানিবার পর আমি আমাকে ঘটবিষয়ক বলিয়া জানি না। আমি ঘটবিষয়ক জ্ঞানবান্— এইরূপেই আমাকে জানিয়া থাকি। সংক্ষেপে, জ্ঞানের

জ্ঞানই হয় ; এবং সেই জন্যই আত্মা যে জ্ঞানস্বরূপ তাহা বলিতে পারা যায় না। আত্মা জ্ঞান, অর্থাৎ, চৈতন্যস্বরূপ, সাংখ্যাচার্যগণের এই কথা ন্যায়াচার্যগণেরম তে গ্রাহ্য নহে।

আত্মা যে জ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারে ইহা আমরা দেখিলাম। এখন দেখা যাউক যে ইহা কর্তৃত্বের আশ্রয় কি না। ন্যায়াচার্যগণের মতে আত্মা কর্তৃত্বের আশ্রয় বা কর্তা হইতে পারে। কারণ, চেতন আমি করিতেছি এইরূপ প্রতীতি হইতে বুঝা যায় যে চৈতন্য ও কর্তৃত্ব একই অধিকরণে বিদ্যমান, বা যাহাই চৈতন্যের আশ্রয়, তাহাই কর্তৃত্বের আশ্রয়। যেমন, সবুজ পাতাটি কাঁপিতেছে বলিলে বুঝা যায় যে, যে পাতাটি সবুজ বর্ণের আশ্রয় সেই পাতাটিই কম্পনেরও আশ্রয় ; সেইরূপ 'চেতন আমি করিতেছি' বা 'দুঃখী আমি করিতেছি', ইত্যাদি বলিলে বুঝা যায় যে, যে আমি বা আত্মা, চৈতন্য অথবা দুঃখের আশ্রয়, সেই আমি বা আত্মা কর্তৃত্বেরও আশ্রয়। অতএব চেতন আমি করিতেছি ইত্যাদি প্রতীতি হইতে বলা যায় যে আত্মা যেমন জ্ঞানাশ্রয়, ঠিক তেমনই কর্তৃত্বের আশ্রয়ও বটে। অদৃষ্ট এবং ভোগের মধ্যে যেমন সামানাধিকরণ্য রহিয়াছে কর্তৃত্ব এবং জ্ঞানের মধ্যেও ঠিক তেমনই সামানাধিকরণ্য রহিয়াছে। আত্মাকে যদি জ্ঞাতা বলা হয়, তাহা হইলে তাহাকে কর্তাও বলিতে হইবে। এখন 'চেতন আমি করি' ইত্যাদি প্রতীতিকে তুমি যে চৈতন্যাংশে ভ্রান্ত বলিবে তাহা হইবে না। তাহা হইলে যে কৃতি-অংশে কেন ইহা ভ্রান্ত নহে, তাহা বলিতে হইবে। অন্যরূপে প্রকাশ করিয়া বলা যায় যে 'চেতন আমি করি' ইত্যাদি প্রতীতি যদি সত্য হয় তাহা হইলে যে আত্মা জ্ঞানাশ্রয় সেই আত্মাই যে কর্তৃত্বাশ্রয়, তাহা স্বীকার করিতে হয়, এবং আত্মা যে কর্তা নহে, এই সাংখ্যমত বিসর্জন দিতে হয়। এইজন্য সাংখ্য অনুরাগীগণ বলিতে পারেন যে এই প্রতীতিটি অংশতঃ ভ্রান্ত। স্বভাবজড় বুদ্ধির কোনও চৈতন্য নাই। পুরুষ চৈতন্য তাহাতে প্রতিবিম্বিত হয় বলিয়াই তাহাকে চেতন বলা হয়। কিন্তু চৈতন্যের আশ্রয় না হইলেও বুদ্ধি কৃতি অদৃষ্ট, ভোগ প্রভৃতির আশ্রয়। অতএব, যে অধিকরণে কৃতি বিদ্যমান, সেই অধিকরণে চৈতন্য প্রকৃতই নাই। চৈতন্য ও কৃতির মধ্যে কোন সামানাধিকরণ্য থাকিতে পারে না। চেতন আমি করি এই প্রতীতিটি অংশতঃ ভ্রান্ত ; এবং এইরূপ অংশতঃ ভ্রান্ত প্রতীতির উপর নির্ভর করিয়া আত্মা যে কর্তৃত্বের আশ্রয় তাহা কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে ? সাংখ্য অনুরাগীগণের এইরূপ কথার উত্তরে ন্যায়াচার্যগণ বলেন যে চেতন আমি করি এই প্রতীতিটিকে যে

চেতন আমি করিতেছি ইত্যাদি প্রতীত জ্ঞাতাই যে কর্তা তাহা বুঝায়।

এই প্রতীতিকে চৈতন্যাংশে ভ্রান্ত বলা যায় না।

চৈতন্যাংশেই ভ্রান্ত তাহা বলিব কেন? অর্থাৎ কেন মনে করিব যে বুদ্ধির কর্তৃত্ব আছে বলিয়া প্রতীতিটি কৃত্যংশে ভ্রান্ত নহে, কিন্তু চৈতন্য নাই বলিয়া ইহা চৈতন্যাংশে ভ্রান্ত? সাংখ্য অনুরাগীগণ ধরিয়া লইয়াছেন যে যাহা কৃতির আশ্রয় তাহা চৈতন্যের আশ্রয় নহে, এবং সেই জন্যই প্রতীতিটিকে চৈতন্যাংশে ভ্রান্ত বলিতেছেন। কিন্তু এইরূপ ধরিয়া লওয়া চলে কিনা তাহাই বিচার্য। বস্তুতঃ এই প্রতীতিটি যে কৃত্যংশে ভ্রান্ত তাহাই বা বলিব না কেন? এমন কি হইতে পারে না যে চৈতন্য যেমন আত্মনিষ্ঠ কর্তৃত্বও তেমনই আত্মনিষ্ঠ, কিন্তু যেহেতু পুরুষের সহিত বুদ্ধির ভেদ অতিসান্নিধ্যবশতঃ গৃহীত হয় না, সেই হেতু চৈতন্য যে ভাবে বুদ্ধিতে আরোপিত হয় কর্তৃত্বও তাহাতে সেভাবেই আরোপিত হয়? আরও দেখ, চৈতন্যের এক অধিকরণ এবং কর্তৃত্বের অন্য অধিকরণ হইতে পারে না। কারণ, কর্তৃত্বের আশ্রয় বুদ্ধি যদি নিত্য হয় তাহা হইলে চিরকালই আত্মাতে কর্তৃত্ব ধর্ম উপচরিত হইতে থাকিবে এবং কখনও মোক্ষ হইবে না। কিন্তু বুদ্ধি যদি অনিত্য হয় তাহা হইলে তাহার উৎপত্তি থাকিবে। এখন, বুদ্ধি অনাদি হইবে না বলিয়া আত্মা প্রথমে অসংসারী থাকিবে, তাহার পর বুদ্ধি উৎপন্ন হইলে সংসারী হইবে, এবং তাহার পর বুদ্ধির নাশ হইলে আবার অসংসারী হইবে। কিন্তু আবার কোনও বুদ্ধি উৎপন্ন হইলে সংসারী হইবে। অতএব বুদ্ধি অনিত্য হইলে পর্যায়ক্রমে আত্মা সংসারী ও অসংসারী হইতে থাকিবে। এইরূপ কোনও কথা আত্মা সম্বন্ধে বলা যায় না; কারণ তাহাতে আত্মার মোক্ষ সম্ভব হইতে পারে না, এবং মোক্ষার্থে প্রবৃত্তির উচ্ছেদ হয়। বস্তুতঃ অসংসারী আত্মা সংসারী হইতে পারে ইহা যদি একবার স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে মুক্ত আত্মাও যে কেন বদ্ধ হইবে না, তাহা বলিতে পারা যায় না। সংক্ষেপে যে অধিকরণে চৈতন্য থাকে সেই অধিকরণে যদি কর্তৃত্বও না থাকে, তাহা হইলে মোক্ষ বা তাহার জন্য প্রবৃত্তি সম্ভব হইতে পারে না। অতএব, আমাদের স্বীকার করিতে হয় যে আত্মা যেমন জ্ঞানাশ্রয়, ঠিক তেমনই কর্তৃত্বাদি ধর্মের আশ্রয়ও বটে। সংক্ষেপে, আত্মার কর্তৃত্ব নাই বলিয়া এবং ঈশ্বর আত্মান্তর বলিয়া ঈশ্বর জগতের কর্তা হইতে পারে না, এই সাংখ্য মত অসিদ্ধ।

কারণ তুল্য যুক্তিতে ইহাকে কৃত্যংশেও ভ্রান্ত বলা যাইতে পারে।

এবং চৈতন্য ও কর্তৃত্বের সামানাধিকরণ্য না থাকিলে মোক্ষ বা তদর্থে প্রবৃত্তির উচ্ছেদ হয়।

ন্যায়াচার্যগণ কিরূপে সাংখ্যাচার্যগণের একটি কথার উত্তর দেন তাহা আমরা দেখিলাম। এখন তাহারা কিরূপে সাংখ্যাচার্যগণের দ্বিতীয় কথাটির, অর্থাৎ অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে ব্যক্ত জগৎ উদ্ভূত হয়, এই কথাটির উত্তর দেন তাহা দেখিবার চেষ্টা করা যাউক।

সৎকার্যবাদ নহে অসৎকার্যবাদই বুদ্ধিসিদ্ধ।

সাংখ্যের প্রকৃতিতত্ত্ব সৎকার্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। ন্যায়াচার্যগণ সৎকার্যবাদ স্বীকার করেন না। তাঁহারা অসৎকার্যবাদী। তাঁহাদের মতে প্রাগসৎ কার্য যে উৎপন্ন হয় ইহা বুদ্ধি অর্থাৎ সহজ অনুভব সিদ্ধ। কপালে যে ঘট নাই, ইহা আমরা সকলেই দেখিতে পাই, বা কপাল হইতে যে ঘট উৎপন্ন হইবে এইরূপ অনুভবও আমাদের সকলের হইয়া থাকে। অতএব ঘটের প্রাগভাব অস্বীকার করা যায় না। উৎপত্তির পূর্বে ঘট বিদ্যমান থাকে এইরূপ কথা বলিলে সর্বজনীন অনুভবের অপলাপ হয়। অবশ্য যদি দেখা যায় যে প্রাগসৎ কার্য উৎপন্ন হয়, ইহা বলিলে বহুবিধ অনুপপত্তির উদ্ভব হয়, তাহা হইলে আমাদের বাধ্য হইয়াই উৎপত্তির পূর্বেও যে ঘট থাকে, তাহা বলিতে হয়। কিন্তু প্রশ্ন এই যে উদ্ধার করিতে পারা যায় না এমন কোনও অনুপপত্তি অসৎকার্যবাদের আছে কি? সাংখ্যাচার্যগণ অবশ্য অসৎকার্যবাদের বিরুদ্ধে বহুবিধ আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকেন। কিন্তু ন্যায়াচার্যগণের মতে এই সকল আপত্তি সহজেই খণ্ডন করা যায়। যেমন, সাংখ্যাচার্যগণ বলিয়া থাকেন যে প্রাগসৎ কার্য উৎপন্ন হয়, ইহা বলাও যাহা আর কালভেদে কার্য যে সত্তা ও অসত্তারূপ দুইটি ধর্মের ধর্মী হয় ইহা বলাও তাহা, এবং এই কথা হয় হাস্যকর অথবা সৎকার্যবাদেরই পরিপোষক। অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বে যদি কার্যরূপ ধর্মটি না থাকে, তাহা হইলে তখন তাহার অসত্তারূপ ধর্মটি থাকিবে কেমন করিয়া? কিন্তু যদি থাকে, তাহা হইলে প্রকারান্তরে সৎকার্যবাদই অঙ্গীকৃত হয়। অসত্তাবিশিষ্ট কার্য থাকে বলিয়া, অর্থাৎ আসলে কার্যটি থাকে না বলিয়া যদি সৎকার্যবাদ হইল না বলা হয়, তাহা হইলে প্রকৃতপক্ষে ধর্মী থাকে না অথচ ধর্ম থাকে এইরূপ হাস্যকর কথাই বলিতে হয়। সাংখ্যাচার্যগণের এইরূপ কথার উত্তরে ন্যায়াচার্যগণ বলিয়া থাকেন যে কালভেদে কার্য সত্তা ও অসত্তারূপ ধর্ম দুইটির ধর্মী হইতে পারে। এই কথা মোটেই হাস্যকর নহে। এমন কি সৎকার্যবাদীগণকেও ইহা স্বীকার করিতে হয়। অর্থাৎ কার্য গগন-কমলের ন্যায় একান্ত অসৎ নহে। উৎপত্তির পূর্বে ইহা অসৎ হইলেও উৎপত্তির পর ইহা সৎ। অতএব, ইহার সহিত কোনও কিছুর সম্বন্ধ হওয়া অসম্ভব নহে। বস্তুতঃ ইহার পক্ষে ইহার উৎপত্তির পূর্বকালস্থ অসত্তা ধর্মের ধর্মী হওয়া সম্ভব। অবশ্য কোনও কিছুকে কোনও ধর্মের ধর্মী বলিতে যদি বুঝি যে অশ্ব যেমন তাহার পৃষ্ঠে আরোহীকে বহন করে ধর্মীও সেইরূপ তাহার পৃষ্ঠে ধর্মকে বহন করিয়া থাকে, তাহা হইলে উৎপত্তির পূর্বকালস্থ কোনও ধর্মের ধর্মী হওয়া কোনও কার্যের পক্ষে সম্ভব হয় না। কিন্তু ধর্মী বলিতে আমরা এইরূপ কিছুকে বুঝিব কেন? ধর্মী বলিতে কোনও ধর্মের সহিত সম্বন্ধযুক্তকেই বা বুঝিব না কেন? বস্তুতঃ ধর্মী

কার্য কালভেদে সত্তা ও অসত্তার আশ্রয় হইতে পারে।

বলিতে ধর্মের সম্বন্ধীই বুঝিতে হইবে। কারণ এমনও অনেক ধর্মী আছে যাহারা ঠিক তাহাদের ধর্মের আধার নহে। যেমন স্বামী। চৈত্রকে যখন ধনস্বামী বলা হয় তখন চৈত্র যে তাহার সমস্ত ধনসম্পত্তি বাক্সবন্দী করিয়া মাথায় করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহা বুঝা হয় না। অতএব ধর্মী বলিতে ধর্মের সম্বন্ধীই বুঝিতে হয়, ধর্মের আধার বা ভারবাহী বুঝিলে চলে না। সুতরাং উত্তর কালে যে পদার্থ উৎপন্ন হইবে তাহার পক্ষে উত্তরকালীনত্ব সম্বন্ধে পূর্বকালীন ধর্মের ধর্মী হওয়া সম্ভব। বৈশাখ মাস উত্তরকালীনত্ব সম্বন্ধে চৈত্র মাসের সম্বন্ধী। ঘট প্রভৃতি কার্যও উত্তর-কালীনত্ব সম্বন্ধে নিজ নিজ প্রাগভাবের সম্বন্ধী। চৈত্রমাসের অধিকরণ কালের ধ্বংসাধিকরণত্ব বৈশাখ মাসের আছে। এইরূপ ঘট প্রভৃতি পদার্থেরও তাহাদের প্রাগসত্ত্বের অধিকরণ কালের ধ্বংসাধিকরণত্ব আছে। অতএব কালভেদে ঘটাদি কার্য যে অসত্তা ও সত্তা নামক ধর্ম দুইটীর ধর্মী হইতে পারে এই কথা হাস্যকর নহে। প্রকৃত পক্ষে সৎকার্যবাদীগণকেও এইরূপ কথা বলিতে হয়। কারণ তাঁহাদেরও বলিতে হয় যে মৃত্তিকাতে ঠিক ঘটরূপ অর্থাৎ ঘটত্বের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়া ঘট নাই, এবং তন্তুতেও পটত্বাবচ্ছিন্ন হইয়া পট নাই। মৃত্তিকাতে ঘটত্বাবচ্ছিন্ন-রূপে ঘট যদি থাকিত, তাহা হইলে ঘট নাই হইবে, এইরূপ বোধ কাহারও হইত না। সেইরূপ তন্তুর ক্ষেত্রেও। বস্তুতঃ, ধান্যে যে রূপে তণ্ডুল থাকে বা তিলে যে রূপে তৈল থাকে উপাদান কারণে কার্য যে সেইভাবে থাকে তাহা বলা যায় না। কারণ ধান্যে তণ্ডুলত্ব-বিশিষ্ট তণ্ডুল থাকে, যদিও যতদিন না অবঘাত করা হয় ততদিন আমরা দেখিতে পাই না। তিলের মধ্যেও সেইরূপ তৈলত্বাবচ্ছিন্ন তৈল থাকে, যদিও যতদিন না আমরা নিপীড়ন করি ততদিন তাহা দেখিতে পাই না। আমাদের যদি কোন তৃতীয় নয়ন থাকিত বা আমরা যদি সূক্ষ্মভাবে ধান্যাদির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারিতাম তাহা হইলে অবঘাত বা নিপীড়নের পূর্বেই তণ্ডুল বা তৈল প্রত্যক্ষ করিতে পারিতাম। কিন্তু এইরূপ কথা আমরা ঘট পট প্রভৃতি কার্য পদার্থের ক্ষেত্রে বলিতে পারি না। মৃত্তিকায় ঘটরূপে ঘট থাকে না, তন্তুতেও পটত্ববিশিষ্ট রূপে পট থাকে না। ধাত্রী যেরূপ জননী জঠরে যে শিশু রহিয়াছে তাহাকে বাহির করিতে সাহায্য করেন সেইরূপ কুম্ভকার, তন্তুবায় প্রভৃতি কর্তা যে মৃত্তিকা, সুতা প্রভৃতির গর্ভে যে ঘট প্রভৃতি রহিয়াছে তাহাদের বাহির করিতে সাহায্য করেন এমন কথা আমরা বলিতে পারি না। বস্তুতঃ কূর্মের অঙ্গগুলি যেমন কূর্মের শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে এবং মধ্যে মধ্যে বাহির হয়, কার্য যে সেইরূপ কারণশরীরে আচ্ছাদিত অবস্থায় থাকে, এবং তাহার পর নির্গত হয় ইহা বলা যায় না। আমাদের

এইরূপ কথা সৎকার্য বাদীকেও বলিতে হয়।

বলিতে হয় যে মৃত্তিকা প্রভৃতি উপাদান কারণে ঘটত্বাদির দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়া ঘট প্রভৃতি কার্য পদার্থ থাকে না। তাহাদের প্রাগভাবেই তথায় থাকে। এবং এইজন্য কালভেদে কার্য সত্তা ও অসত্তা নামক ধর্ম দুইটীর ধর্মী হইতে বাধ্য।

অসৎকার্যবাদে যে উপাদান কারণ ব্যবস্থার উপপত্তি নাই তাহা নহে।

অসৎকার্যবাদ অঙ্গীকার করিলে কারণ বা কারণগতশক্তি কার্যের সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত হইয়া কার্য উৎপন্ন করে, না সম্বন্ধযুক্ত না হইয়াই করে তাহা বলিতে পারা যায় না, সাংখ্যাচার্যগণের এই কথারও উত্তর ন্যায়াচার্যগণ দিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে "কার্য যদি একেবারেই অসৎ বা অলীক হইত তাহা হইলেই উহার সহিত কাহারই কোন সম্বন্ধ সম্ভব হইত না। কিন্তু আমাদিগের মতে কার্য যখন উৎপত্তিক্ষণ হইতেই সৎ তখন তাহার সহিত কারণ বিশেষের যে কোন সম্বন্ধ অসম্ভব হইতে পারে না। আমাদিগের মতে ভাব কার্যের উৎপত্তি ক্ষণ হইতেই তাহার উপাদান কারণের সহিত ঐ কার্যের সমবায় নামক সম্বন্ধ সিদ্ধ হয়। ঐ সম্বন্ধ আধারাধেয় ভাবের নিয়ামক, সুতরাং উহার আধার উপাদান কারণ ও আধেয় ঘটাদি কার্যের সত্তাকে অপেক্ষা করায় কার্যের উৎপত্তির পূর্বে ঐ সম্বন্ধ সিদ্ধ হয় না। কিন্তু কার্য ও কারণের কার্যকারণভাব সম্বন্ধে পূর্ব হইতেই সিদ্ধ আছে। সামান্যতঃ অনুমান প্রমাণের সাহায্যে যে জাতীয় কার্যের প্রতি যে জাতীয় পদার্থের সামর্থ্য অর্থাৎ কারণত্ব পূর্বে বুঝা যায় তজ্জাতীয় কার্য ও সেই পদার্থের কার্য-কারণ-ভাব সম্বন্ধও পূর্বেই বুঝা যায়, এবং সেই কারণগত শক্তি—যাহা আমাদিগের মতে কারণত্বরূপ ধর্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে—তাহার সহিতও কার্যবিশেষের কোনও সম্বন্ধ পূর্বেই বুঝা যায়। কার্যবিশেষে তাহার কারণগত কারণত্ব-নিরূপিত-কার্যত্ব সম্বন্ধ আছে এবং সেই কারণেও সেই সেই কার্যত্ব-নিরূপিত-কারণত্ব-সম্বন্ধ আছে। সুতরাং কার্যোৎপত্তির পূর্বেও কারণ ও তদ্গত কারণত্বের (শক্তির) সহিত সেই কার্যের সম্বন্ধ অবশ্যই আছে। ঐ সম্বন্ধ সংযোগ ও সমবায়াদির ন্যায় আধারাধেয় ভাবের নিয়ামক নহে। সুতরাং উহা ভবিষ্যৎ পদার্থেও থাকিতে পারে। ভবিষ্যৎ পদার্থের সহিত কাহারও কোন রূপ সম্বন্ধ থাকিতে পারে না, ইহা বলা যায় না। আমাদিগের ভবিষ্যৎ মৃত্যু বিষয়ে আমাদিগের যে অবশ্যম্ভাবিত্ব জ্ঞান জন্মে তাহার সহিত যেই ভবিষ্যৎ মৃত্যুর কি কোন সম্বন্ধই নাই? জ্ঞান ও বিষয়ের মধ্যে কোন সম্বন্ধ না থাকিলে সকল জ্ঞানকেই সকল বিষয়ক বলা যায়। তাহা হইলে অমুক বিষয়ে জ্ঞান হইয়াছে অমুক বিষয়ে জ্ঞান হয় নাই এইরূপ কখনও বলা যায় না। সুতরাং যে বিষয়ে জ্ঞান জন্মে তাহার সহিতই ঐ জ্ঞানের সম্বন্ধ বিশেষ স্বীকার্য। তাহা হইলে ভবিষ্যৎ মৃত্যু বিষয়ে এখন যে জ্ঞান জন্মে তাহার সহিত সেই মৃত্যুরও সম্বন্ধ বিশেষ

স্বীকার করিতে হইবে। সেই সম্বন্ধের অনুরোধে সেই মৃত্যু পূর্ব হইতেই আছে ইহা বলিলে জীবিত জীব মাত্রই মৃত ইহাই বলা হয়। কারণ, জীবের মৃত্যু নামক জন্য পদার্থও ত' মৃত্যুর পূর্ব হইতেই সৎ, নচেৎ পূর্বোক্ত সৎকার্যবাদ সিদ্ধ হইতে পারে না। পূর্বোক্ত যে সকল যুক্তির দ্বারা সাংখ্য সম্প্রদায় সৎকার্যবাদের সমর্থন করিয়াছেন তদ্দ্বারা তাঁহাদিগের মতে জীবের মৃত্যু পদার্থও উৎপত্তির পূর্বে সৎ, নচেৎ তাহার কারণের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ সম্ভব না হওয়ায় উহা জন্মিতে পারে না ইহা তাঁহারা বলিতে বাধ্য। মৃত্যু ভাবপদার্থ না হইলেও, উহার কারণের সহিত উহার সম্বন্ধ যে আবশ্যক ইহা তাঁহারা অস্বীকার করিতে পারিবেন না।[৩]

অবয়বী অবয়ব অতিরিক্ত সুতরাং সৎকার্যবাদ গ্রাহ্য নহে।

এইরূপ উপাদান কারণ ও কার্যের মধ্যে ভিন্নতা নাই ইহা দেখাইয়া সাংখ্যাচার্যগণ যে কারণকে কার্যেরই অব্যক্ত অবস্থা বলিয়া থাকেন ন্যায়াচার্যগণ তাহারও উত্তর দেন। ন্যায়াচার্যগণ বলেন যে উপাদান কারণ ও কার্য এক হইতে পারে না। কার্যের সত্তা কারণের সত্তা হইতে পৃথক। যাঁহারা অবয়বীকে অবয়ব-অতিরিক্ত বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহারা অবশ্য উপাদান কারণ ও কার্যের যে পৃথক সত্তা নাই তাহা বলিতে পারেন। কিন্তু অবয়বীকে অবয়ব অতিরিক্ত না বলিলে অনেক অসুবিধা হয়। প্রথম অধ্যায়ে আমরা এই বিষয়ে অনতিবিস্তারে আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং এই প্রসঙ্গে এখানে কিছু বলার প্রয়োজন নাই। এখানে কেবল এইটুকু বলিলেই চলে যে ন্যায়মতে অবয়বী অবয়ব-অতিরিক্ত। সুতরাং উপাদান কারণ ও কার্য কখনও এক হইতে পারে না। অতএব সৎকার্যবাদীগণের এই যুক্তিটিও ন্যায়াচার্যগণকে প্রভাবিত করিতে পারে না। ফলকথা, কার্য ও কারণের সত্তা পৃথক। কার্য যে উৎপত্তির পূর্বে উপাদান কারণে অব্যক্ত ভাবে উপস্থিত থাকে তাহা বলা যায় না। প্রাগসৎ কার্যই উৎপন্ন হয়। কার্যের প্রাগভাব বিনষ্ট হইলেই কার্য উৎপন্ন হয়।

অভাব ভাবান্তর মাত্র নহে; প্রাগভাব বস্তু, প্রাগসৎ কার্যেরই উৎপত্তি হয়।

কার্যের প্রাগভাব বিনষ্ট হইয়া কার্য উৎপন্ন ইহা অবশ্য সাংখ্যাচার্যগণ মানেন না। তাঁহাদের মতে অভাব স্বরূপ রহিত পদার্থ। যাহাকে অভাব বলা হয় তাহা প্রকৃত পক্ষে ভাবান্তর মাত্র। ন্যায়াচার্যগণ বলেন যে সুতাতে বস্ত্রের প্রাগভাব রহিয়াছে। অর্থাৎ যে সকল সুতা হইতে এখনও বস্ত্র উৎপন্ন হয় নাই কিন্তু হইবে বলিয়া বোধ হইতেছে, সেই সকল সুতাতে যে বস্ত্রটি উৎপন্ন হইবে তাহার যেন অভাব রহিয়াছে। এই অভাবকে তাঁহারা প্রাগভাব

৩. তর্কবাগীশ, ন্যায়দর্শন ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৩৪-৩৫।

বলেন। কিন্তু সাংখ্যাচার্যগণ ইহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে এখানে কেবল সূতাই আছে, অন্য কিছুই নাই। বস্তুতঃ অভাব সাংখ্যমতে কোনও অতিরিক্ত পদার্থ নহে। ঘটের প্রাগভাব মৃত্তিকা প্রভৃতি, ধ্বংসাভাব চূর্ণাদি, অত্যন্তাভাব কেবল অধিকরণ এবং অন্যোন্যাভাব পট প্রভৃতি। কিন্তু ন্যায়াচার্যগণ এই মত স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে অভাব অতিরিক্ত পদার্থ। ইহাকে ভাবান্তর মাত্র বলা যায় না। যেমন অত্যন্তাভাবের কথাই ধরা যাউক। ভূতলে ঘট নাই ইত্যাদি প্রতীতিসাক্ষিক অভাবকে অত্যন্তাভাব বলে। এখন বিচার করিয়া দেখা যাউক যে আমরা যখন বলি যে ভূতলে ঘট নাই, তখন কি এই কথাই বলি যে কেবল ভূতল রহিয়াছে? সাংখ্যাচার্যগণ এই প্রশ্নের উত্তরে হাঁ বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে ভূতলে ঘটাভাব রহিয়াছে, ইহা বলাও যাহা আর কেবল ভূতল রহিয়াছে ইহা বলাও তাহা। অতএব এই অভাব অধিকরণ স্বরূপ।[৪] কিন্তু ন্যায়াচার্যগণ ইহা অস্বীকার করেন। ইঁহারা বলেন যে অভাব যদি অধিকরণ স্বরূপই হয়, তাহা হইলে একই অভাব অনন্ত অধিকরণে থাকিতে পারে বলিয়া সেই অভাবটিকে আর একটি অভাব বলিতে পারা যায় না। অর্থাৎ যেখানে একটি অভাব স্বীকার করিলেই কাজ মিটিয়া যায়, সেখানে অনন্ত অভাব কল্পনা করিতে হয়। যেমন গোয়ালিনীর শিরোপরি যে ভরা ঘটটি রহিয়াছে, তাহা আমার মাথার উপরেও নাই তোমার মাথার উপরেও নাই বা অন্য কাহারও মাথার উপরে নাই। অতএব ঐ ঘটের অভাব অসংখ্য অধিকরণে রহিয়াছে। এখন, যদি আমরা অভাবকে অধিকরণ অতিরিক্ত বলিয়া কল্পনা করি, তাহা হইলে একই অভাব যে অনন্ত অধিকরণ রহিয়াছে তাহা বলিতে পারি। কিন্তু আমরা যদি অভাবকে অধিকরণ স্বরূপ বলিয়া মনে করি, তাহা হইলে আমাদের অনন্ত অভাব কল্পনা করিতে হয়। অতএব অভাবকে কেবল অধিকরণ বলিয়া মনে করা অপেক্ষা অতিরিক্ত কিছু বলিয়া মনে করাই বুদ্ধিমানের কাজ বলিয়া মনে হয়।

এখন তুমি যে বলিবে যে ন্যায়াচার্যগণ যখন বৃক্ষবৃত্তি কপিসংযোগাভাবকে গুণ-বৃত্তি কপিসংযোগাভাব হইতে ভিন্ন বলিয়া মনে করেন, এবং সেইজন্য অভাব যে অধিকরণ ভেদে ভিন্ন হইতে পারে, ইহা বলিয়া থাকেন, তখন আর অভাবকে অধিকরণ অতিরিক্ত বলিয়া যে এক বলা হয়, বা লঘু কল্পনার গৌরব করা হয়, তাহার কোন অর্থ নাই বা অভাবকে অধিকরণ স্বরূপ বলিলে যে গুরু কল্পনার

৪। তত্ত্বকৌমুদীর ৫ম কারিকায় ভূতলের তৎকালীন পরিণামকেই অভাব বলা হইয়াছে, সুতরাং সাংখ্য মতে অভাবকে ঠিক অধিকরণস্বরূপ বলা যায় না। ইহা প্রভাকরের মত। ইহাকে কেন্দ্র করিয়া বিচার চলিয়া থাকে। তাই এখানে তাহাই করা হইল।

আশ্রয় লওয়া হইল বলা হয়, তাহারও কোন অর্থ নাই, তাহা হইবে না। কারণ ন্যায়াচার্যগণ স্বীকার করেন বটে যে অনেক সময় অধিকরণ ভেদে অভাব ভিন্ন হইতে পারে। যেমন, তাঁহারা বলিয়া থাকেন, যে যেই বৃক্ষের শাখাদেশে কপিসংযোগ থাকে, সেই বৃক্ষের মূলদেশে কপিসংযোগের অভাব থাকিতে পারে এবং এই বৃক্ষবৃত্তি কপিসংযোগাভাব অন্য কোনও অধিকরণে, যেমন কোন গুণে, যে কপিসংযোগাভাব থাকে, তাহা হইতে ভিন্ন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে যে অভাব তাহার প্রতিযোগীর (যাহার অভাব) সহিত একই অধিকরণে থাকিতে পারে সেই অভাবই যে অধিকরণ ভেদে ভিন্ন হয়, ইহাই ন্যায়াচার্যগণ বলিয়া থাকেন। কপিসংযোগ (প্রতিযোগী) এবং তাহার অভাব একই বৃক্ষে শাখাবচ্ছেদে এবং মূলাবচ্ছেদে থাকিতে পারে। তাই বলা হয় যে বৃক্ষবৃত্তি কপিসংযোগাভাব, গুণবৃত্তি কপিসংযোগাভাব হইতে ভিন্ন। কিন্তু যেখানে অভাব ব্যাপ্যবৃত্তি, অর্থাৎ প্রতিযোগীর সহিত একই অধিকরণে থাকে না, সেখানে অভাব যে অধিকরণ ভেদে ভিন্ন হয় তাহা বলা যায় না। অতএব, অভাবকে অধিকরণস্বরূপ বলিলে যে কল্পনা গৌরব হয় এই কথায় কোন দোষ নাই।

আরও দেখ অভাব এবং তাহার অধিকরণের মধ্যে আধারাধেয় ভাব রহিয়াছে। আমরা বলি যে ভূতলে ঘট নাই, তোমার মুখে হাসি নাই, বায়ুতে রূপ নাই, হ্রদে বহ্নি নাই ইত্যাদি। অর্থাৎ ঘটাভাবরূপ অভাবটি ভূতলরূপ আধারের আধেয়; হাস্যাভাবরূপ অভাবটি মুখরূপ আধারের আধেয়, রূপাভাব রূপ অভাবটি বায়ুরূপ আধারের আধেয়, বহ্ন্যভাবরূপ অভাবটি হ্রদরূপ আধারের আধেয়, ইত্যাদি রূপে আমাদের অভাববুদ্ধি হইয়া থাকে। এখন, আধেয়কে আধারস্বরূপ বলা অনুচিত। তৈলকে পাত্রস্বরূপ বলা, বা দধিকে ভাণ্ডস্বরূপ বলা যায় না। তুমি অবশ্য বলিতে পার যে, যখন কোন কোন ক্ষেত্রে অভাবরূপ আধেয়কে অধিকরণ স্বরূপ বলা হয় তখন অভাব এবং অধিকরণের মধ্যে আধারাধেয় ভাব বর্তমান থাকিলেও সকল ক্ষেত্রেই অভাবকে অধিকরণ স্বরূপ বলা হইবে না কেন? অর্থাৎ অভাব অধিকরণক অভাবের ক্ষেত্রে আধেয় অভাব যে আধার অভাবের স্বরূপ ইহা অনবস্থার ভয়ে বা অতিগুরু কল্পনার ভয়ে বলা হইয়া থাকে। যেমন, একই ভূতলে যখন ঘটাভাব ও পটাভাব থাকে তখন এই দুইটি অভাব ভিন্ন বলিয়া, একটির ভেদ যে অপরটিতে থাকে তাহা বলিতে হয় এবং ঘটাভাববৃত্তি পটাভাবভেদ বা পটাভাববৃত্তি ঘটাভাবভেদ যে ঘটাভাব বা পটাভাব স্বরূপ তাহাও অনবস্থা ভয়ে বলিতে হয়। ঘটাভাববৃত্তি পটাভাবভেদকে যদি ঘটাভাবের অতিরিক্ত বলা হয় তাহা হইলে পটাভাবভেদ ভেদ নামক দ্বিতীয় ভেদরূপ একটি নূতন অভাব স্বীকার করিতে হয়, এবং দ্বিতীয়

ভেদও অতিরিক্ত হইবে বলিয়া তৃতীয় ভেদ স্বীকার করিতে হইবে বা অনবস্থা হইবে। অতএব অনবস্থা ভয়ে ন্যায়াচার্যগণ বলিয়া থাকেন যে ঘটাভাববৃত্তি পটাভাবভেদ ঘটাভাব স্বরূপ। এমন অভাব অধিকরণক অভাবের ক্ষেত্রে আধেয়রূপে ব্যবহৃত অভাব অধিকরণস্বরূপ, ইহা যখন বলা হয় তখন অন্যান্য অভাবের ক্ষেত্রেও (যেমন ভূতলবৃত্তি ঘটাভাবের ক্ষেত্রেও) তাহা বলা হইবে না কেন?

তোমার এইরূপ কথার উত্তরে বলা হইবে যে, অন্যক্ষেত্রেই বা বলা হইবে কেন? অন্যক্ষেত্রে কি অনবস্থা হয়? আরও দেখ, এইরূপ অনবস্থা কেবল ভেদরূপ অভাব অধিকরণক অভাবের ক্ষেত্রেই হইতে পারে। অন্যত্র পারে না। পুনরায়, জলে আমাদের গন্ধাভাবের ঘ্রাণজ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, বায়ুতে আমাদের রূপাভাবের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, আকাশে আমাদের শব্দাভাবের শ্রৌত্র প্রত্যক্ষ হইতে পারে, ইত্যাদি। কিন্তু অভাবকে যদি আমরা অধিকরণস্বরূপ বলি, তাহা হইলে এই সকল প্রত্যক্ষের কোন উপপত্তি করিতে পারি না। কারণ, জলের ঘ্রাণজ প্রত্যক্ষ হয় না, বায়ুর চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না এবং আকাশের কোন প্রত্যক্ষই হয় না। অতএব অভাবকে অধিকরণস্বরূপ বলা যায় না। এখন অত্যন্তাভাবকে যদি অধিকরণ অতিরিক্ত বলিয়া স্বীকার করা হয় তাহা হইলে প্রাগভাবকেও অতিরিক্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। সংক্ষেপে, অভাব ভাবান্তর নহে। ইহা ভাবভিন্ন বস্তু। পদার্থরূপে ভাব পদার্থেরই তুল্য। সুতরাং প্রাগভাব বস্তু। এই প্রাগভাব বিনষ্ট হইলেই কার্যের উৎপত্তি হয়। প্রাগসৎ কার্যেরই উৎপত্তি হইয়া থাকে।

বস্তুতঃ প্রাগসৎ কার্যের কোন উৎপত্তিই হইতে পারে না। যাহা রহিয়াছে, তাহার আবার কি উৎপত্তি হইবে? কার্য যে উৎপন্ন হয় তাহার একমাত্র অর্থ হইল এই যে, কার্য উৎপত্তির পূর্বে বিদ্যমান থাকে না। সৎকার্যবাদিগণ বলেন যে, কার্য উৎপন্ন হয় না, প্রকাশিত, অভিব্যক্ত, আবির্ভূত হয়। এখন প্রশ্ন যে, এই আবির্ভাব কি আবির্ভূত হয়, না উৎপন্ন হয়? অর্থাৎ সৎকার্যবাদিগণের মতে উৎপত্তির পূর্বে কার্য অসৎ নহে, সৎ বা বিদ্যমান। তবে বিদ্যমান থাকিলেও, ইহা প্রকাশিত অবস্থায় থাকে না। তাহার উপাদান কারণে প্রচ্ছন্নভাবে থাকে, এবং সেইজন্য কারক ব্যাপার সার্থক হয়। কারক ব্যাপার তাহাকে প্রকৃতপক্ষে উৎপন্ন না করিয়া প্রকাশিত বা অভিব্যক্ত করে। কিন্তু এই অভিব্যক্তি কি কারক ব্যাপারের সাহায্যে অভিব্যক্ত হয়? কার্যটি উৎপত্তির পূর্বে বিদ্যমান থাকে এবং প্রচ্ছন্নভাবে থাকে, তাহা বুঝিলাম। কিন্তু তাহার আবির্ভাবও কি কার্যটি যখন আবির্ভূত হয়, তাহার পূর্বেও বিদ্যমান থাকে? এখন যে সকল যুক্তির দ্বারা

সৎকার্যবাদে মূলক্ষয়কারী অনবস্থা রহিয়াছে।

সাংখ্যাচার্যগণ ঘটাদি কার্য যে উৎপত্তির পূর্বে সৎ ইহা দেখাইতে চাহেন, সেই সকল যুক্তি যদি গ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে আবির্ভাবও যে উৎপন্ন না হইয়া আবির্ভূত হয়, তাহাই বলিতে হয়। অর্থাৎ, যাহা অসৎ তাহার কোনও উৎপত্তি সাংখ্যাচার্যগণের মতে হইতে পারে না। কোন কিছু যে কালভেদে সত্তা ও অসত্তা নামক ধর্ম দুইটীর ধর্মী হইবে, তাহাও হইবে না। সুতরাং, আবির্ভাবের সত্তা যখন আছে, ইহা যখন অলীক নহে—অলীক হইলে কার্যের প্রকাশই অলীক হইয়া যাইবে এবং হয় অসৎকার্যবাদ, নয় বিবর্তবাদ গ্রহণ করিতে হইবে—তখন ইহাও যে প্রাগসৎ তাহাই বলিতে হয়। অতএব, সাংখ্যমতে কার্যই কেবল আবির্ভূত হয় না, তাহার আবির্ভাবও সৎ বলিয়া আবির্ভূত হয়। উৎপত্তির পূর্বে কার্যই কেবল প্রচ্ছন্নভাবে থাকে না, তাহার আবির্ভাবও প্রচ্ছন্নভাবে থাকে। বস্তুতঃ আবির্ভাবও প্রচ্ছন্নভাবে না থাকিলে কার্যের পক্ষে প্রচ্ছন্নভাবে থাকা চলিত না। এখন কার্য প্রচ্ছন্নভাবে থাকে বলিয়া, তাহার জন্য যেমন আবির্ভাব প্রয়োজন আবির্ভাবও প্রচ্ছন্নভাবে থাকে বলিয়া তাহার জন্যও তেমনই আবির্ভাবের প্রয়োজন। কিন্তু সেই দ্বিতীয় আবির্ভাবও সৎ পদার্থ হইবে বলিয়া উৎপন্ন হইতে পারিবে না। তাহাকেও আবির্ভূত হইতে হইবে। সুতরাং তৃতীয় আবির্ভাবের প্রয়োজন। তাহার জন্য আবার চতুর্থ আবির্ভাবের প্রয়োজন ইত্যাদি। অতএব কার্য উৎপত্তির পূর্বে প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান থাকে, তাহা সত্য সত্যই উৎপন্ন না হইয়া আবির্ভূত হয়, ইত্যাদি কথা বলিলে, কার্যের আবির্ভাব, সেই আবির্ভাবের আবির্ভাব, আবার তাহার আবির্ভাব ইত্যাদি অনন্ত আবির্ভাব স্বীকার করিতে হয় বা অনবস্থা দোষের উদ্ভব ঘটে। অন্যরূপে প্রকাশ করিয়া বলা যায় যে কার্য উৎপত্তির পূর্বে বিদ্যমান থাকিলেও সাংখ্যাচার্যগণের মতে কারক ব্যাপার নিরর্থক নহে, কারণ কার্য প্রচ্ছন্নভাবেই বিদ্যমান থাকে, ব্যক্তভাবে থাকে না। কারক ব্যাপারের দ্বারা প্রচ্ছন্ন কার্যকে প্রকট করা হয় মাত্র, উৎপন্ন করা হয় না। এখন প্রশ্ন এই যে, কার্যের এই প্রকাশ বা আবির্ভাব ইহা কি সৎ পদার্থ? সাংখ্যাচার্যগণকে এই প্রশ্নের উত্তরে হাঁ-ই বলিতে হইবে। কারণ, প্রকাশ যদি অসৎ হয়, তাহা হইলে কার্য প্রকৃত পক্ষে প্রকাশিত হয় না, উৎপন্নই হয়, এইরূপ অসৎকার্যবাদসম্মত কথাই সত্য হয়। অথবা, কার্যের উৎপত্তিও অলীক, প্রকাশও অলীক, কার্য প্রকৃতপক্ষে মায়াময়, এই বিবর্তবাদসম্মত কথাই সত্য হয়। অতএব কার্যের আবির্ভাব যে কার্যের মতই সৎ, এইরূপ কথাই সাংখ্যাচার্যগণকে বলিতে হয়। এখন, আবির্ভাব যদি সৎ পদার্থ হয় তাহা হইলে ইহা প্রাগসৎই হইবে। কারণ, অসতের কোনও উৎপত্তি নাই, এবং কালভেদে যে কোন কিছু সত্তা ও অসত্তা নামক ধর্ম দুইটীর ধর্মী হইতে পারে, তাহা

বলা যায় না। কিন্তু পূর্ব হইতে বিদ্যমান আবির্ভাবের জন্য আবার কারক ব্যাপার কেন ? কার্য বিদ্যমান বটে, কিন্তু প্রচ্ছন্নভাবে, সুতরাং কারক ব্যাপার সার্থক—ইহা বুঝিলাম। কিন্তু আবির্ভাব, যাহা পূর্ব হইতেই রহিয়াছে তাহার জন্য আবার কারক ব্যাপার কেন ? অবশ্যই কার্যের মত প্রচ্ছন্নভাবে থাকে বলিয়া এবং নিজে প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া কার্যকে প্রচ্ছন্নভাবে রাখে বলিয়া। কিন্তু তাহা হইলে আবির্ভাবেরও আবির্ভাব প্রয়োজন, এবং তাহারও আবার আবির্ভাব, বা অনন্ত আবির্ভাব প্রয়োজন। অতএব, সৎকার্যবাদে অনবস্থা দোষ অবশ্যম্ভাবী। এইরূপ কোন দোষ অসৎকার্যবাদে নাই। কারণ, অসৎকার্যবাদে কার্য এবং তাহার উৎপত্তি ভিন্ন পদার্থ নহে। কার্য এবং তাহার উৎপত্তি যদি ভিন্ন হইত, তাহা হইলে উৎপত্তির উৎপত্তি, তাহার উৎপত্তি এইরূপ অনন্ত উৎপত্তি স্বীকার করিতে হইত। কিন্তু কার্য এবং তাহার উৎপত্তি বস্তুতঃ অভিন্ন। কিন্তু এইজন্য ঘটটি উৎপন্ন হইল ইত্যাদি বাক্য পুনরুক্তি দোষ দুষ্ট নহে। কারণ ঘট এবং তাহার উৎপত্তি বস্তুতঃ এক হইলেও ঘটত্ব এবং উৎপত্তিত্ব ধর্ম ভিন্ন। ঘটত্ব সকল ঘটেরই ধর্ম, কিন্তু উৎপত্তিত্ব সকল উৎপন্ন পদার্থেরই ধর্ম। ঘট বাচ্য বা প্রমেয় প্রভৃতি বাক্য যেমন পুনরুক্তি দোষ দুষ্ট নহে, ঘট উৎপন্ন হইল এইরূপ বাক্যও সেইরূপ পুনরুক্তি দোষ দুষ্ট নহে। এখন, অসৎকার্যবাদে যেমন কার্য ও তাহার উৎপত্তিকে অভিন্ন বলা যায়, সৎকার্যবাদে কিন্তু কার্য এবং তাহার আবির্ভাবকে এইরূপ অভিন্ন বলা যায় না। কারণ, কার্যের আবির্ভাবের জন্যই কারক ব্যাপার প্রয়োজন। অতএব, সৎকার্যবাদে অনবস্থা অবশ্যম্ভাবী। অসৎকার্যবাদে কিন্তু ইহা নাই। অতএব, এই অনবস্থাকে যে প্রামাণিক বলিব তাহা হইবে না। সৎকার্যবাদ গ্রাহ্য নহে। অসৎকার্যবাদই গ্রাহ্য। প্রাগসৎ কার্যেরই উৎপত্তি হইয়া থাকে।

এখন সৎকার্যবাদ যদি বিচারসহ না হয় তাহা হইলে সাংখ্যসম্মত প্রকৃতিও বিচারসিদ্ধ পদার্থ হইতে পারে না। অর্থাৎ, আমরা বলিতে পারি না যে, প্রকৃতিই এই জগতের উপাদান কারণ। বস্তুতঃ বিজাতীয় কার্য বিজাতীয় উপাদান কারণ জন্য ; এক প্রকৃতি হইতে যে এই বিচিত্র জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। ঘট এবং পট এক জাতীয় কার্য নহে। তাহারা বিজাতীয় পদার্থ। কিন্তু এই বৈজাত্যের উপপত্তি হইবে কেমন করিয়া ? অবশ্যই তাহাদের উপাদান কারণের বৈজাত্যের সাহায্যে। যে উপাদান কারণ হইতে ঘট নির্মিত হয়, তাহা পটের উপাদান কারণ হইতে বিজাতীয়। সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে, কার্যের বৈচিত্র্য উপাদান কারণের বৈচিত্র্য বুঝায় এবং সেই-

সৎকার্যবাদ বিচারসহ নহে বলিয়া জগৎ প্রকৃতির পরিণাম, এই কথাও বিচারসহ নহে।

জন্যই অর্থাৎ এই জগৎ অতি বিচিত্র, বহু জাতীয় কার্যে পরিপূর্ণ বলিয়া এক জাতীয় প্রকৃতির কার্য হইতে পারে না। একই দীপ যেমন আলোককারী, বর্তিবিকারকারী এবং ঘটাদির প্রকাশকারী হইতে পারে তেমনই এক অভিন্ন প্রকৃতিই এই বিচিত্র জগতের কারণ, ইহা যে বলিব তাহা হইবে না। কারণ, কথা হইতেছে উপাদান কারণ লইয়া, এবং উপাদান কারণের বৈচিত্র্য স্বীকৃতির দ্বারাই কার্যের বৈচিত্র্য নির্বাহ করিতে হইবে। এইরূপ সজাতীয় কারণ শক্তিভেদে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় কার্য উৎপন্ন করে, ইহা যে বলিব তাহাও হইবে না। কারণ, কারণের কারণত্বই শক্তি। শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন। কারণ হইতে শক্তির ভেদ কোন ভেদই নহে।

বিশ্বের বৈচিত্র্যের সাংখ্য মতে কোন উপপত্তি নাই।

বিচিত্র শক্তি কল্পনা নিরর্থক কারণ শক্তি কোনও অতিরিক্ত পদার্থ নহে।

ইহা অবশ্য সত্য যে, অনেক দর্শনাচার্য পৃথক শক্তি স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন যে, মণিমন্ত্র প্রভৃতির সমবহিত বহ্নি দাহের সৃষ্টি করে না; কিন্তু অসমবহিত বহ্নি করে। সুতরাং আমাদের বলিতে হয় যে, বহ্নি বহ্নিরূপে দাহের জনক নহে; দাহের অনুকূল কোনও শক্তির আশ্রয়রূপেই ইহা দাহ জন্মাইয়া থাকে। এই শক্তি মণিমন্ত্র প্রভৃতির সমবধানে ধ্বংস হয়, এবং উত্তেজক পদার্থের সমবধানে অথবা মণি প্রভৃতির অপসারণে আবার জন্মায়। সংক্ষেপে বহ্নিত্ব-বিশিষ্ট বহ্নি দাহের কারণ নহে। দাহানুকূল শক্তিবিশিষ্ট বহ্নিই দাহের কারণ। মণিমন্ত্র প্রভৃতির সহিত যখন ইহা সম্বন্ধযুক্ত না হয়, তখন ইহা দাহের অনুকূল শক্তির আশ্রয় হয় ও দাহ উৎপন্ন করে। কিন্তু যখন ইহা তাহাদের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয় তখন ইহার দাহানুকূল শক্তি নষ্ট হইয়া যায়, এবং বহ্নিত্বের আশ্রয়রূপে থাকিলেও, এই শক্তির আশ্রয়রূপে থাকে না বলিয়া কোন দাহ উৎপন্ন করিতে পারে না। অতএব বহ্নিগত এই শক্তিকেই কারণ বলিতে হয় এবং বহ্নি হইতে পৃথক যে একটি শক্তি নামক পদার্থ রহিয়াছে তাহা স্বীকার করিতে হয়।

শক্তি প্রসঙ্গে মীমাংসা মত।

ন্যায়াচার্যগণ শক্তি যে একটি পৃথক পদার্থ তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে কারণের কারণত্বই শক্তি। কারণত্ব ভিন্ন কোন শক্তি নাই। মণি প্রভৃতির সমবধানে বহ্নি যে দাহ জন্মাইতে পারে না, ইহা সত্য। কিন্তু তাহার অর্থ এই নহে যে, বহ্নি বহ্নিরূপে নহে, দাহানুকূল শক্তির আশ্রয়রূপেই দাহের কারণ, এবং যেহেতু মণি প্রভৃতির সমবধান এই শক্তিকে ধ্বংস করে, সেইহেতু মণি সমবহিত বহ্নি দাহ জন্মাইতে পারে না। ইহার প্রকৃত অর্থ হইল এই যে, মণি প্রভৃতির প্রতিবন্ধকের অভাববিশিষ্ট বহ্নিই

ন্যায়মত।

দাহের কারণ। অর্থাৎ বহ্নি বহ্নিরূপেই দাহের কারণ। কিন্তু কোনও কারণই প্রতিবন্ধক উপস্থিত থাকিলে কার্য উৎপন্ন করিতে পারে না। সুতরাং, মণি প্রভৃতি দাহের প্রতিবন্ধক যখন উপস্থিত থাকে, তখন বহ্নি দাহ উৎপন্ন করিবে কি করিয়া? প্রকৃতপক্ষে কোনও কার্যের প্রতি তাহার উৎপত্তির প্রতিবন্ধকের অভাবও কারণ। দাহের প্রতি বহ্নিও যেমন কারণ, মণি প্রভৃতির অভাবও তেমনই কারণ। সুতরাং, যখন মণি ও বহ্নি উভয়ই থাকে তখন একটি কারণের, অর্থাৎ মণির অভাবের, অভাব থাকে বলিয়া দাহের সকল কারণ উপস্থিত থাকে না, এবং সেইজন্যই মণি সমবহিত বহ্নি, দাহ জন্মাইতে পারে না। অতএব, মণি প্রভৃতির সমবধানে বহ্নি দাহ জন্মাইতে পারে না বলিয়া যে আমাদের কারণের কারণত্বের অতিরিক্ত শক্তি বলিয়া কোন কিছু স্বীকার করিতে হইবে, তাহা বলা চলিবে না। এখন হয়ত তুমি আশঙ্কা করিতে পার যে, মণির অভাব দাহের কারণ হইবে কি করিয়া? কেননা, ভাব পদার্থগুলিকেই আমরা কারণরূপেই ব্যবহৃত হইতে দেখিয়া থাকি। আমরা দেখি যে, মৃত্তিকা কারণ, তন্তু কারণ, কুম্ভকার কারণ, তন্তুবায় কারণ ইত্যাদি। ইহারা সকলেই ভাবপদার্থ। অভাব পদার্থের কারণরূপে ব্যবহার দেখা যায় না। বস্তুতঃ অভাব পদার্থের পক্ষে কারণ বা উৎপাদক হইবার যোগ্যতা কোথায়? ভাব পদার্থই উৎপাদক হইতে পারে। ভাবপদার্থই কারণ হইতে পারে। অভাব পদার্থের পক্ষে কারণ হওয়া সম্ভব নহে এবং সেইজন্য মণি প্রভৃতির অভাবকে কি করিয়া দাহের কারণ বলা যাইবে?

তোমার এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে ন্যায়াচার্যগণ বলিবেন যে, অভাব পদার্থ যে কার্য হইতে পারে, তাহা ত' স্বীকার করিতে হয়। ঘটকে নষ্ট হইতে, কাপড়কে ছিঁড়িয়া যাইতে আমরা দেখি। সুতরাং ঘটাদির ধ্বংসরূপ অভাব যে উৎপন্ন হয়, তাহা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। এখন, অভাবপদার্থ যদি কার্য হইতে পারে তাহা হইলে ইহা কারণ হইতে পারিবে না কেন? এক অর্থে এই সংসারে কার্য অথবা কারণ বলিয়া কিছুই নাই। কোনও পদার্থের গাত্রে কার্য অথবা কারণ কথাটি লেখা থাকে না। একই কাদাচিৎক পদার্থকে একভাবে দেখিলে যেমন কার্য বলিতে হয়, অন্যভাবে দেখিলে ঠিক তেমনই কারণ বলিতে হয়। কার্যত্ব ও কারণত্ব প্রকৃতপক্ষে দুইটী চাকুরীর নাম। ধূমকে বহ্নির সহিত তুলনা করিলে কার্য বলা হয় এবং অঞ্জনের সহিত তুলনা করিলে কারণ বলা হয়। অর্থাৎ উৎপাদ-বিনাশশীল কাদাচিৎক পদার্থগুলিকে একদিক হইতে দেখিয়া কার্য বলা হয়, এবং অপর দিক হইতে দেখিয়া কারণ বলা হয়। যখন কোন পদার্থকে অন্য কোন পদার্থের নিয়ত পূর্বভাবী বলিয়া দেখি, তখন তাহাকে কারণ এবং অপর পদার্থটিকে

কার্য বলি। এইরূপ, যাহাকে কারণ বলিয়া বুঝিলাম তাহাকেই যখন আবার কোন নিয়ত পূর্ববর্তী পদার্থের পরভাবী বলিয়া বুঝি, তখন তাহাকে কার্য বলি এবং সেই নিয়ত পূর্বভাবীটিকে কারণ বলিয়া থাকি। অতএব কারণ বা কার্য বলিতে অদ্ভুত রহস্যময় কিছু বুঝা হয় না। নিয়ত পূর্বভাবী বা নিয়ত পূর্বভাবীর পরভাবী পদার্থ বুঝা হয়। এখন, অভাব যেমন কোনও নিয়ত পূর্বভাবীর পরভাবী হইতে পারে, ঠিক তেমনই আবার কোনও পরভাবীর নিয়ত পূর্বভাবীও হইতে পারে। অর্থাৎ অভাব যেমন কার্যও হইতে পারে, ঠিক তেমনই কারণও হইতে পারে। কোনও কিছু নিয়ত পূর্বভাবী কিনা তাহা অন্বয় ও ব্যতিরেক নির্ণয় করিয়াই নির্ণয় করিতে হয়। যেমন, বহ্নি যে ধূমের নিয়ত পূর্বভাবী তাহা আমরা ধূম যেখানে আছে, সেখানে যে বহ্নি আছে (অন্বয়) এবং বহ্নি যেখানে নাই, সেখানে যে ধূম নাই (ব্যতিরেক) ইহা দেখিয়াই নির্ণয় করি। এইরূপ কুম্ভকার যে ঘটের নিয়ত পূর্বভাবী, ইহা আমরা যখনই ঘট উৎপন্ন হয়, তখনই কুম্ভকার থাকে এবং যখন কুম্ভকার থাকে না, তখন ঘট উৎপন্ন হয় না, ইহা দেখিয়াই বুঝি। এইরূপ কোনও অভাবপদার্থ কোনও ভাবপদার্থের কারণ অর্থাৎ নিয়ত পূর্বভাবী কি না, তাহাও আমরা অন্বয় ও ব্যতিরেক নির্ণয়পূর্বক নির্ণয় করিতে পারি। যেমন মণি প্রভৃতির অভাব দাহের নিয়ত পূর্ববর্তী বা কারণ কিনা তাহা আমরা যেখানে দাহ আছে সেখানে মণি প্রভৃতির অভাব আছে কিনা, এবং যেখানে মণি প্রভৃতির অভাব নাই অর্থাৎ মণি প্রভৃতি আছে সেখানে দাহ নাই কিনা, তাহা দেখিয়া ঠিক করিতে পারি। অতএব মণি প্রভৃতির অভাবকে আমরা দাহের কারণ বলিতে পারি। অবশ্য কারণ বলিতে যদি শক্তি প্রয়োগকারী উৎপাদক বুঝা হয়, তাহা হইলে অভাব পদার্থকে কারণ বলা যায় না। কিন্তু এইরূপে বুঝিব কেন? কুম্ভকার প্রভৃতিকে যাদুকর বলিয়া না বুঝিয়া নিয়ত পূর্ববর্তী পদার্থ বলিয়াই বুঝা উচিত। সংক্ষেপে কারণ বলিতে নিয়ত পূর্ববর্তী পদার্থই বুঝা হয় বলিয়া, বা কারণত্ব অতিরিক্ত কোনও শক্তির আশ্রয় স্বরূপ রহস্য-ময় কোন কিছুকে বুঝা হয় না বলিয়া কোনও কার্যের অন্বয় ব্যতিরেক সিদ্ধ নিয়ত পূর্ববর্তী কোনও অভাবকে তাহার কারণ বলা যাইতে পারে। সুতরাং মণি প্রভৃতির অভাবকে দাহের কারণ বলিলে কোনও অপরাধ করা হয় না। যাহাই হউক, শক্তি বলিয়া শক্তিমান হইতে ভিন্ন কোন কিছু স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। সুতরাং

সাংখ্যমতে বিশ্বের বৈচিত্র্যের উপপত্তি হইতে পারে না।

এক জাতীয় কারণ ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় শক্তির আশ্রয়-রূপে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় কার্য উৎপন্ন করিয়া থাকে এইরূপ কথারও কোন অর্থ নাই। বস্তুর এক প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন শক্তির আশ্রয়রূপে ভিন্ন ভিন্ন কার্য উৎপন্ন করে, ইহা সাংখ্যাচার্যগণ

স্বীকার করিতে পারেন না। কারণ শক্তি যদি শক্তিমান হইতে অভিন্ন হয়, তাহা হইলে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় শক্তি আর থাকিল না, এবং শক্তি যদি শক্তিমান হইতে ভিন্ন হয়, তাহা হইলে এক প্রকৃতি আর কারণ হইল না। অতএব, এক প্রকৃতি হইতে যে এই বিচিত্র জগৎ উৎপন্ন হয়, তাহা বলা চলে না। এই জগৎ প্রকৃতির পরিণাম—এই সাংখ্যমত গ্রাহ্য নহে।

আকর গ্রন্থপঞ্জী

(ক) সাংখ্যমত স্থাপন—(১) সবদর্শন সংগ্রহ, দর্শনাঙ্কুর টীকা সহ।
(২) সাংখ্যসূত্র ১।৬১, ১।১১২-৩৭, অনিরুদ্ধবৃত্তি সহ।
(৩) সাংখ্যকারিকা—৩, ৯, ১১, ১৪, ১৫, ১৯, ২০, ২২, ২৫, ও ২৬, মাঠর বৃত্তি এবং তত্ত্বকৌমুদী সহ।

(খ) সাংখ্যমত খণ্ডন—(১) ন্যায়সূত্র ৪-১, ৪৮-৫০ বিশ্বনাথ বৃত্তি ও তর্কবাগীশ টিপ্পনী সহ।
(২) বার্তিক এবং তাৎপর্যটিকা ৪. ১. ২১.
(৩) ন্যায়কুসুমাঞ্জলি—১।৪-৭, ১০-১৪; প্রকাশ, সৌরভ ও তর্কবাগীশ বিবৃতি সহ।
(৪) ভাষাপরিচ্ছেদ, ২, ১২, এবং ৪৯ মুক্তাবলী দিনকরী, রামরুদ্রী ও মুক্তাবলী-সংগ্রহ সহ।
(৫) ব্যাপ্তিপঞ্চক মাথুরী, ২য় লক্ষণ।
(৬) সিদ্ধান্ত লক্ষণ জাগদীশী।

বিবর্তবাদ

সুখ, দুঃখ ও মোহস্বরূপ ব্যক্ত জগৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ নামক তিনটি গুণযুক্ত প্রকৃতির পরিণাম এই সাংখ্যমত যে ন্যায়াচার্যগণের সম্মত নহে, ইহা আমরা দেখিয়াছি। এখন দেখা যাউক যে জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত হইতে পারে কি না। জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত ইহা অদ্বৈতাচার্যগণ বলিয়া থাকেন। তাঁহারাও সাংখ্যমত গ্রহণ করেন না। তাঁহারাও বলেন যে, এই জগৎ অচেতন প্রকৃতির পরিণাম হইতে পারে না। কুণ্ডল, বলয় প্রভৃতি যে সকল সুখ, দুঃখ ও মোহস্বরূপ সুবর্ণাবকার দেখা যায় তাহারা স্বর্ণকার নামক কোনও চেতন কর্তা-জন্য। অতএব, ব্যক্ত জগৎ সুখ, দুঃখ ও মোহস্বরূপ বলিয়া আমাদের বলিতে হয় যে, ইহা কোনও চেতন কারণ জন্য। সাংখ্যাচার্যগণ যে হেতুর সাহায্যে তাঁহাদের কথা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করেন সেই হেতু প্রকৃতপক্ষে বিরুদ্ধ কথাই প্রমাণ করে। উপরন্তু, এইরূপ কোন হেতু হইতে পারে কি, অথবা পক্ষে, অনুমতির উদ্দেশ্যে থাকিতে পারে কি? ব্যক্ত জগৎকে সুখ, দুঃখ ও মোহস্বরূপ বলা যায় কি? বিবেচনা করিয়া দেখিলে চন্দন প্রভৃতি পদার্থকে সুখ, দুঃখ ও মোহস্বরূপ বলা চলে না। কারণ, চন্দন প্রভৃতি পদার্থ বাহ্য জগতের এবং চক্ষু প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয়। সুখ প্রভৃতি পদার্থ আন্তর পদার্থ ও মানস প্রত্যক্ষের বিষয়। বস্তুতঃ চন্দন যদি সুখ স্বরূপই হয়, তাহা হইলে হেমন্ত-কালেও চন্দন ব্যবহারে সুখের স্ফূরণ হওয়া উচিত। কারণ, চন্দন গ্রীষ্মকালে চন্দন থাকে এবং হেমন্তে অচন্দন হইয়া যায়, ইহা আমরা বলিতে পারি না। এইরূপ উজ্জ্বল যদি সুখ স্বরূপই হয়, তাহা হইলে নিদাঘে প্রখর তপন তাপে যখন সমগ্র জগৎ তাপিত হইয়া উঠে, তখনও স্নানে বা পানে, তাহার ব্যবহার করিলে, সুখেরই অভিব্যক্তি হওয়া উচিত। কিন্তু তাহা হয় না। সাংখ্যাচার্যগণও গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে সুখের আশায় ফুটন্ত জল স্নান বা পানের জন্য ব্যবহার করেন না বা করিতে বলেন না। অতএব চন্দন প্রভৃতি বাহ্য পদার্থকে সুখ প্রভৃতি আন্তর পদার্থের কারণ, জনক বলাই উচিত; তাহাদের সুখাদি স্বরূপ, ত্রিগুণময় বলা উচিত নহে। এখন, ব্যক্ত জগৎ যদি ত্রিগুণময় না হয়, তাহা হইলে ইহা যে ত্রিগুণময় অব্যক্তের পরিণাম, এই কথারও কোন অর্থ থাকে না। সংক্ষেপে এই ব্যক্ত জগৎ যে অচেতন,

অদ্বৈতাচার্যগণ সাংখ্যমত গ্রহণ করেন না, তাঁহাদের মতে সাংখ্যের প্রকৃতি সাধক অনুমানটি বিরুদ্ধ এবং স্বরূপা-সিদ্ধি নামক দোষ দুষ্ট।

অব্যক্ত প্রকৃতির পরিণাম এই সাংখ্যমত গ্রহণ করা যায় না। চেতনের দ্বারা প্রেরিত না হইলে অচেতনের সৃষ্টি কার্যে কোনও প্রবৃত্তিই জন্মিতে পারে না।

সাংখ্যাচার্যগণ অবশ্য চেতনা অনধিষ্ঠিত অচেতন পদার্থ যে প্রবৃত্ত হইতে পারে, তাহা বলিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, বৎসের পুষ্টির জন্য অচেতন দুগ্ধাদি প্রবর্তিত হয়। সুতরাং প্রকৃতিও যে সেইরূপ সৃষ্টি-কার্যে প্রবর্তিত হয় তাহা বলা যাইতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, অচেতন দুগ্ধাদি কি চেতনার দ্বারা অধিষ্ঠিত না হইয়াই বৎসরে বিবৃদ্ধির জন্য প্রবর্তিত হয়? ইহা কি সত্য নহে যে, পরমেশ্বরই এইরূপ স্থলে অধিষ্ঠাতারূপে বর্তমান থাকেন? অদ্বৈতাচার্যগণের মতে অচেতন দুগ্ধাদি চেতন প্রেরিত না হইয়া বৎসের পুষ্টির জন্য প্রবৃত্ত হয় না। দুগ্ধাদির প্রবৃত্তি চেতন প্রেরিত। ঈশ্বরের অধিষ্ঠাতৃত্বই এই প্রবৃত্তির জনক। ইহার মূলে রহিয়াছে ঈশ্বরের করুণা।

সৃষ্টির মূলে রহিয়াছে পরমেশ্বরের করুণা।

বস্তুতঃ সৃষ্টির মূলেই রহিয়াছে ঈশ্বরের করুণা। অবশ্য, বিশ্বে দুঃখের প্রাচুর্য দেখিয়া ইহা যে করুণাময় পরমেশ্বরের সৃষ্টি নহে, এইরূপ কথা মনে আসিতে পারে। ইহা মনে হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নহে যে, যে জগৎ দুঃখনাগের বিষাক্ত নিশ্বাসে প্রতিক্ষণেই দগ্ধ হইতেছে সেই জগৎ করুণাময় ঈশ্বর জন্য নহে। কিন্তু তথাপি বিচার করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, এই জগৎ ঈশ্বরজন্য। ঈশ্বর করুণাময় বলিয়াই এই জগৎ নির্মাণ করিয়াছেন। জীবগণের দুঃখ বা বৈষম্য তাহাদের কর্মের জন্য। তাহাদের কর্মই তাহাদের সুখ, দুঃখ প্রভৃতির কারণ। এই জগতে কেহ যে দুঃখ পায় এবং কেহ যে পরম সুখে কাল যাপন করে, কেহ মনুষ্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করে এবং কেহ যে তির্যগ্‌যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, ইহার কারণ এই নহে যে ঈশ্বর নির্দয় বা সর্বজীবে অসমদর্শী। তিনি প্রকৃতপক্ষে মাধ্যস্থ। তাহার দ্বেষ্যও কেহ নাই, প্রিয়ও কেহ নাই। তিনি ইচ্ছা করিয়া তোমাকে সুখী এবং আমাকে দুঃখী করেন নাই। তুমি শুভকর্ম করিয়াছিলে, তাই কর্মফলদাতা ঈশ্বর তোমাকে সুখী করিয়াছেন। আমি অধর্ম করিয়াছিলাম, তাই তিনি আমাকে দুঃখী করিয়াছেন। জীবের বিচিত্র-কর্ম থাকার জন্য ঈশ্বর বিচিত্র ফলভোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহার বৈষম্য দোষও নাই নৈর্ঘৃণ্য দোষও নাই। সংক্ষেপে ঈশ্বর সৃষ্টি-কার্যে জীবের কর্মকে অপেক্ষা করেন। যে জীব যেমন কর্ম করে, সেই জীব সেইরূপ ফল পায়। জীবের সুখের কারণ যেমন তাহার শুভকর্ম বা ধর্ম, তাহার দুঃখের কারণও ঠিক সেইরূপ

জীবগণের দুঃখ তাহাদের কর্মের জন্য; ঈশ্বর সৃষ্টি-কার্যে জীবের কর্মকে অপেক্ষা করেন।

তাহার অশুভ কর্ম বা অধর্ম। জীবের কর্ম নিরপেক্ষ ভাবে যদি তিনি সৃষ্টির কারণ হইতেন, তাহা হইলে তিনি যে কেন সকল জীবকেই সুখী করিয়া সৃষ্টি করেন নাই, তাঁহার সৃষ্ট জগতে কেন যে বৈষম্য রহিয়াছে, তাহা জিজ্ঞাসা করা চলিত। কিন্তু যেহেতু তিনি সৃষ্টি কার্যে জীবের কর্মের অপেক্ষা করেন, সেই হেতু তাঁহাকে পক্ষপাতী বা নির্দয় বলা চলে না।

এখন, সৃষ্টি কার্যে ঈশ্বর জীবের কর্মকে অপেক্ষা করেন, ইহা শুনিয়া হয়ত মনে হইতে পারে যে তিনি সর্বেশ্বর নহেন। কারণ, কোনও কর্তা যখন কোন কিছুকে উৎপন্ন করিবার জন্য তাঁহার কর্তৃত্ব নিরপেক্ষ কোন সহকারী কারণের সাহায্য গ্রহণ করেন, তখন সেই কর্তাকে আর সেই কার্যের পূর্ণ কর্তৃত্ব সম্পন্ন কারণ বলা যায় না। অতএব জীবের দুঃখকে তাহার কর্মজন্য বলিয়া ঈশ্বর যে করুণাময় এই পক্ষ রক্ষা করিতে পারি বটে, কিন্তু ঈশ্বর যে সর্বশক্তিমান, সর্বেশ্বর, তাঁহার শক্তি বা ইচ্ছা যে কোথাও কুণ্ঠিত হয় না, ব্যাহত হয় না, ইত্যাদি কথা আর বলিতে পারি না। সুতরাং ঈশ্বরকে করুণাময় বলিব, না সর্বেশ্বর বলিব, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারা যায় না। ঈশ্বরকে যদি করুণাময় বলা হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে সর্বশক্তিমান্ বলা যায় না এবং তাঁহাকেযদি সর্বশক্তিমান্ বলা হয়, তাহা হইলে তাঁহার করুণাময়ত্বের হানি হয়।

কর্ম সাপেক্ষে সৃষ্টি করেন বলিয়া ঈশ্বরকে যে অসর্বেশ্বর বলিব তাহা হইবে না, কারণ জীবের কর্মের কারয়িতাও তিনি।

এইরূপ পক্ষের উত্তরে ন্যায় বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনাচার্যগণের মোট কথা হইল এই যে, জীবের কর্ম নিরপেক্ষ ঈশ্বর জগতের কারণ না হইলেও, ঈশ্বর সর্বেশ্বর। কারণ তিনি জীবের কর্মকে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, বা অনুগ্রহ করিতে সৃষ্টি করেন। যে কর্মকে অপেক্ষা করিয়া ঈশ্বর সৃষ্টি করেন, সেই কর্মের প্রযোজক কর্তাও ঈশ্বর। তিনিই ঐ কর্মের কারয়িতা। তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত ঐ কর্ম বা তাহার ফলপ্রাপ্তি হইতে পারে না। জীব যখন যে কর্ম করে সেই কর্ম তিনিই তখন তাহাকে করাইয়া থাকেন। জীবের যে কোন কর্তৃত্ব নাই তাহা নহে। তাহার প্রযোজ্য কর্তৃত্ব রহিয়াছে। পিতা যখন পুত্রকে কোন কিছু করিতে বলেন, তখন পুত্র অচেতন পদার্থের ন্যায় পিতৃ আজ্ঞা পালন করেন না। তাঁহারও রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি আছে। তাঁহারও ইচ্ছা ও প্রযত্ন হয়। তাঁহাকেও কর্তা হইতে হয়, এবং সেইজন্য ভোক্তাও হইতে হয়। অবশ্য তাঁহার কর্তৃত্ব প্রযোজ্য কর্তৃত্ব। পিতা তাঁহাকে কর্তা করেন বলিয়াই তিনি কর্তা হন। পিতা প্রযোজক কর্তা এবং পুত্র প্রযোজ্য কর্তা। এইরূপ সকল কর্মেরই ঈশ্বর প্রযোজক কর্তা এবং জীব প্রযোজ্য কর্তা। ঈশ্বর সকল কর্মেরই কারয়িতা ও ফল

বিধাতা। জীবের কর্মেও ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব বিদ্যমান। সৃষ্টি কার্যে জীবের কর্মকে অপেক্ষা করিলেও ঈশ্বর সর্বেশ্বর।

কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে যে, যেরূপ কর্ম করিলে, পুত্রকে দুঃখ পাইতে হইবে, সেইরূপ কোন কর্ম করিতে কোন জ্ঞানী ও স্নেহশীল পিতা তাঁহার পুত্রকে বলেন না। সেইরূপ যেরূপ কর্ম করিলে জীবগণকে দুঃখ পাইতে হইবে, সেইরূপ কর্ম ঈশ্বর জীবগণকে কেন করাইয়া থাকেন? ইহা অবশ্য বুঝিতে পারা যায় যে, জীব একবার যে কর্ম করিয়া ফেলিয়াছে, তাহার ফল সে ভোগ করিতে বাধ্য। কিন্তু ঈশ্বর যখন জীবের সর্ব কর্মের কারয়িতা, তখন তিনি কেন জীবকে অধর্ম, অশুভ কর্ম করাইয়া থাকেন? ইহার উত্তরে এই কথা বলিলে চলিবে না যে, জীব পূর্ব পূর্ব জন্মে যেরূপ কর্মের অভ্যাস করিয়াছে এই জন্মে সেই পূর্ব কর্মের অভ্যাস বশতঃ সেইরূপ কর্ম করিতেই বাধ্য হয়, বা ঈশ্বর জীবের পূর্ব পূর্ব জন্মের কর্ম অনুসারেই উত্তর উত্তর জন্মে কর্ম করাইয়া থাকেন। কারণ, জীবের সকল জন্মেরই পূর্বজন্ম থাকিতে পারে না। তাহার এমন কোন জন্ম নিশ্চয়ই থাকে, যাহার পূর্বে কোন জন্ম ছিল না, বা যাহা সর্বথা প্রথম জন্ম। এই জন্মের কর্মের কারয়িতা যদি করুণাময় ঈশ্বর হন, তাহা হইলে সেই কর্মরাশি শুভ কর্মই হইবে। এবং যেহেতু পূর্ব পূর্ব জন্মের কর্ম অনুসারে তিনি জীবগণকে উত্তর উত্তর জন্মে কর্ম করাইয়া থাকেন, সেই হেতু সকল জন্মেই জীবকে শুভ কর্ম করাইবেন, এবং কোনও জীব কখনও দুঃখী হইবে না। অতএব, ঈশ্বর যদি দুঃখী জীবের কর্মের অধিষ্ঠাতা হন, তাহা হইলে তিনি করুণাময় হইতে পারেন না; এবং তিনি যদি করুণাময় হন, তাহা হইলে সর্বকর্মের কারয়িতা হইতে পারেন না। আমরা একই সঙ্গে ঈশ্বরকে করুণাময় ও সর্বশক্তিমান বলিতে পারি না।

কিন্তু জীব অশুভ কর্ম করে কেন?

এইরূপ পূর্বপক্ষীর বিরুদ্ধে ন্যায় ও বেদান্তাচার্যগণ বলেন যে সংসার অনাদি বলিয়া এইরূপ আপত্তি উঠিতেই পারে না। সংসার যদি অনাদি না হইত সর্বথা প্রথম জন্ম বলিয়া জীবের কোনও জন্ম যদি থাকিত, তাহা হইলে এইরূপ আপত্তি উঠিতে পারিত। কিন্তু সর্বদা প্রথম জন্ম বলিয়া জীবের কোনও জন্ম নাই। সংসার অনাদি। সৃষ্টির অর্থ সর্বদা প্রথম সৃষ্টি নহে। চক্রবৎ সৃষ্টি ও প্রলয় চলিতেছে। অতএব, ঈশ্বর সর্বকর্মের কারয়িতা হইয়াও পূর্ব পূর্ব জন্মে অশুভ কর্মে অভ্যস্ত জীবকে উত্তর উত্তর জন্মে শুভকর্ম করাইতে পারেন না। কিন্তু ইহাতে তাঁহার সর্বেশ্বরতার কোন হানি

পূর্ব পূর্ব জন্মের কর্মের অভ্যাস অনুসারে ঈশ্বর উত্তর উত্তর জন্মে জীবকে কর্ম করাইয়া থাকেন এবং সৃষ্টি অনাদি বলিয়া ঈশ্বরকে নির্দয় বলিবার কোন হেতু থাকিতে পারে না।

হয় না। তিনি সর্বশক্তিমান। কিন্তু সর্বশক্তিমত্তার অর্থ কোনও কিছুর সামর্থ্য লোপ করিবার শক্তির অধিকারী হওয়া নহে। অশুভ কর্মের যাহা সামর্থ্য, তাহাও যেমন সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর লোপ করিতে পারেন না, শুভকর্মের যে সামর্থ্য তাহাও তেমনই তিনি লোপ করিতে পারেন না। কোনও কর্ম যতদিন না ফল প্রসব করে, ততদিন তাহার লোপ হইতে পারে না। জীবের অনাদি অশুভ কর্ম ফল পাইলেই ক্ষয় হইয়া যাইতে পারে। অশুভ কর্মের অবশ্যম্ভাবী ফল দুঃখ ভোগ। দুঃখ ভোগ হইলেই তাহা বিনষ্ট হয়। ঈশ্বর করুণাময় বলিয়াই অশুভ কর্মের অধিষ্ঠাতা হন, এবং দুঃখ ফল দান করিয়া জীবের অশুভ কর্ম নাশ করেন। অতএব জীবের দুঃখ ঈশ্বর যে নিষ্ঠুর ও অসর্বেশ্বর তাহা বুঝায় না। বরং তিনি যে করুণাময় ও সর্বশক্তিমান তাহাই বুঝায়। সৃষ্টির পূর্বে অর্থাৎ প্রলয়কালে জীবগণের শরীর না থাকিলেও বা জীবগণ দুঃখ না পাইলেও, তাহাদের শুভাশুভ কর্ম থাকে। ফল না পাইলে ইহারা ক্ষয় পায় না বলিয়া এবং জীবগণ মুক্ত হইতে পারে না বলিয়া পরমেশ্বর জীবগণের দুঃখনাশের জন্যই করুণাবশে সৃষ্টি করিয়া থাকেন। অতএব, সৃষ্টির মূলে রহিয়াছে ঈশ্বরের করুণা। চেতনা অনধিষ্ঠিত অচেতন প্রকৃতি স্বতঃই সৃষ্টিকার্যে প্রবৃত্ত হয়, এই সাংখ্যমত গ্রাহ্য নহে।

প্রকৃতি কেন সৃষ্টি কার্যে প্রবৃত্ত হয়? পুরুষের ভোগের জন্য ?

সত্য কথা বলিতে কি, অচেতন প্রকৃতি কি করিয়া সৃষ্টিকার্যে প্রবৃত্ত হয় শুধু তাহাই যে বুঝিতে পারা যায় না তাহা নহে, কেন, কি অর্থলাভের জন্য যে ইহা প্রবৃত্ত হয় তাহাও বুঝিতে পারা যায় না। প্রকৃতি পুরুষের ভোগের জন্য প্রবর্তিত হইতে পারে না। কারণ. সাংখ্যমতে পুরুষের কোন সত্যকারের, তাত্ত্বিক ভোগ হইতে পারে না। যে সুখপ্রাপ্তির জন্য বা দুঃখ পরিহারের জন্য যত্ন করে, তাহারই প্রকৃত ভোগ হইতে পারে। কিন্তু সাংখ্যের পুরুষের সুখ প্রাপ্তি বা সেইজন্য যত্ন, অথবা দুঃখ পরিহার বা সেইজন্য যত্ন নাই। অতএব, তাহার তাত্ত্বিক ভোগ হইবে কি করিয়া ? প্রকৃতপক্ষে, প্রকৃতি পুরুষের ভোগের জন্য প্রবর্তিত হইতে পারে না। কারণ পুরুষের ভোগ বলিতে আমরা কি বুঝিব ? অবশ্যই শব্দ প্রভৃতির উপলব্ধি। কিন্তু কতবার উপলব্ধি ? একবার অথবা নিঃশেষে ? একবার

না, পুরুষের কোন তাত্ত্বিক ভোগ হইতে পারে না, এবং ইহাতে সৃষ্টি ক্ষণমাত্র স্থায়ী হয় অথবা মোক্ষ অসম্ভব হয়।

হইতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে সৃষ্টি অল্পক্ষণ মাত্র স্থায়ী হইবে। নিঃশেষেও হইতে পারে না। কারণ তাহা হইলে প্রকৃতির সৃজন-শক্তির কোনও শেষ নাই বলিয়া অনন্তকাল ধরিয়া পুরুষকে ভোগ করিতে হইবে এবং মোক্ষের উচ্ছেদ হইয়া যাইবে। অতএব পুরুষের একবার অথবা নিঃশেষে

ভোগের জন্য প্রকৃতি প্রবর্তিত হয়, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। তুমি যে বলিবে, একবার, ভোগের জন্যও নহে অথবা নিঃশেষে ভোগের জন্যও নহে কিন্তু ইহার মাঝামাঝি সাংখ্যক ভোগের জন্য তাহা হইবে না। কারণ, এই মাঝামাঝি সংখ্যাটি কত ? এবং তুমি যত বলিতেছ, তাহার যে কমও নহে বেশীও নহে, তাহা তুমি কেমন করিয়া জানিলে ? এইরূপ তুমি যে বলিবে যে যতদিন না পুরুষ নিজেকে ও প্রকৃতিকে বুঝিতে পারে, ততদিন সে ভোগ করিয়া থাকে, তাহাও হইবে না। কারণ, এইরূপ বোধ হইলেই যে কোন ভোগের নিবৃত্তি হইবে তাহা বুঝিতে পারা যায় না। ইহার অর্থ কি এই যে অবিদ্যার জন্যই ভোগ হয় এবং অবিদ্যা নিবৃত্ত হইলেই ভোগের অন্ত হয় ? তাহা হইলে, অবিদ্যা-অতিরিক্ত অচেতন প্রকৃতি হইতে জগৎ উৎপন্ন হয়, ইহা বলিবার আর প্রয়োজন কি ? অবিদ্যা হইতেই জগৎ উৎপন্ন হয় ইহা বলাই অর্থাৎ পরিণামবাদ নহে, বিবর্তবাদই যে যুক্তিযুক্ত ইহা বলাই উচিত নহে কি ?

এইরূপ, পুরুষের মোক্ষের জন্য যে প্রকৃতি প্রবর্তিত হয় ইহাও বলা যায় না। কারণ, পুরুষ নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব। কর্ম, অনুভব, বাসনা প্রভৃতি তাহার নাই। সুতরাং পুরুষের মুক্তির জন্য প্রকৃতি প্রবর্তিত হয়, এই কথা অর্থহীন। শুধু অর্থহীনই নহে, ভয়াবহও বটে। কারণ, মুক্ত পুরুষকে বাঁধিব এবং তাহার পর ছাড়িয়া দিব, এইরূপ যদি কোন উদ্দেশ্য প্রকৃতির থাকে, তাহা হইলে পুরুষের আর কোন আশা নাই। জগতের কামিনীগণ যদি স্থির করেন যে পুরুষদের আমরা চক্রাকারে বাঁধিতে এবং বাঁধন খুলিয়া দিতে থাকিব তাহা হইলে ময়ূরের কবলে সর্প পড়িলে যেরূপ করুণ অবস্থার উদ্ভব হয় সেইরূপ কোন অবস্থার সৃষ্টি হইবে না কি ? এবং এইরূপ করুণ অবস্থার মধ্যে তোমার বা আমার মত সংসারীরা হয়ত মাঝে মাঝে তৃপ্তি পাইলেও পাইতে পারে কিন্তু অসংসারী আশ্রমবাসীগণের কি হইবে ? দুষ্মন্ত, এমন কি বিশ্বামিত্রের কথাও ছাড়িয়া দিলাম, কিন্তু নারদ, শুকদেব প্রভৃতি ঋষিগণের অবস্থা কি হইবে ? অতএব, মুক্ত পুরুষকে বদ্ধ করিয়া পুনরায় মুক্ত করিবার জন্য যে প্রকৃতি প্রবর্তিত হয়, তাহাও বলা যায় না। উপরন্তু, প্রকৃতি যদি পুরুষের মোক্ষের জন্যই প্রবর্তিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে শব্দ প্রভৃতি পুরুষভোগ্য পদার্থের জননীই বা বলা হয় কেন ? তুমি যে বলিবে, ভোগ না করিলে পুরুষ মুক্তি পায় না বলিয়া প্রকৃতি ভোগ্য পদার্থ প্রসব করে, তাহাও হইবে না। কারণ, আমরা এই মাত্র দেখিলাম যে ভোগ-কামনাহীন পুরুষকে প্রকৃতি যদি একবার ভোগের পথে আনিতে পারে তাহা হইলে

পুরুষের মোক্ষের জন্যও প্রকৃতি প্রবর্তিত হইতে পারে না।

পুরুষের পক্ষে আর ভোগমুক্ত হওয়া সম্ভব হয় না। অতএব, প্রকৃতি যে পুরুষের মোক্ষের জন্য প্রবর্তিত হয়, ইহাও বলা যায় না।

বস্তুতঃ প্রকৃতি কেন পুরুষের মোক্ষের সাধক হইবে? প্রকৃতি স্বভাব-চঞ্চল এবং অচেতন। তাহার কোন বিচারী কার্যক্রম নাই। সেইজন্য পুরুষ যখন বুঝিতে পারিবে যে প্রকৃতি সংযোগই তাহার সকল দুঃখের হেতু তখন প্রকৃতি যে তাহাকে ছাড়িয়া যাইবে তাহা কেমন করিয়া বলি? তুমি কম্বলকে ছাড়িতে চাহিলেও কম্বল তোমাকে ছাড়িতে চাহিবে কেন? সুতরাং আমাদের বলিতে হয় যে পুরুষ যখন নিজেকে বুঝিতে পারে, যখন তাহার বিবেকখ্যাতি হয়, অবিদ্যা নাশ পায় তখন প্রকৃতির উচ্ছেদ হইয়া যায় এবং পুরুষ মুক্তি পায়। কিন্তু তাহাও আমরা বলিতে পারি না। কারণ, তাহা হইলে আমাদের আরও বলিতে হয় যে, যে কোন পুরুষের বিবেকখ্যাতি হইলে সকল সংসারের উচ্ছেদ হয় এবং সকলেরই মোক্ষ হয়। অতএব, কাহারও কখনও মোক্ষ হয় না, অথবা যে কোন ব্যক্তির মোক্ষ হইলে সকলের মোক্ষ হয় এবং সংসারের অত্যন্ত উচ্ছেদ হয়, এই দুইটি অসম্ভব কথার একটিকে সাংখ্যাচার্যগণকে বলিতে হয়। এখন, সাংখ্যাচার্যগণ যে বলিবেন, যে যে পুরুষের অবিদ্যা বিনষ্ট হয়, সেই পুরুষই মুক্ত হয়, সুতরাং একজন জীবের মুক্তি অন্য জীবের মুক্তি বুঝায় না, তাহাও হইবে না। কারণ, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে যতদিন অবিদ্যা থাকে, ততদিনই সংসার থাকে, এবং অবিদ্যার ধ্বংস হইলেই সংসারও ধ্বংস হয়। এবং ইহা স্বীকার করাও যাহা, আর অবিদ্যা অতিরিক্ত কোনও অচেতন প্রকৃতি যে এই জগতের উপাদান কারণ নহে, ইহা বলাও তাহা। সংক্ষেপে আমাদের পরিণামবাদ ত্যাগ করিয়া বিবর্তবাদ গ্রহণ করিতে হইবে। আমাদের বলিতে হইবে যে যেমন ব্যবহারিক সৎ শুক্তিরূপ অধিষ্ঠানে অজ্ঞানরূপ উপাদান হইতে প্রাতিভাসিক রজত উৎপন্ন হয় ঠিক সেইরূপ পারমার্থিক সৎ ব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠানে অজ্ঞানরূপ উপাদান হইতে ব্যবহারিক জগৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে। অজ্ঞান এক হইলেও জীবভেদ ইহারই কার্য এবং সেইজন্য ইহা প্রতি জীবে ভিন্ন। সুতরাং কোনও একজনের জীবগত অবিদ্যা বিনষ্ট হইলে সকল জীবগত অবিদ্যা বিনষ্ট হয় না, বা সকল সংসারে উচ্ছেদ ও সকল জীবের মোক্ষ হইয়া যায় না। যাহাই হউক, এই জগৎ যে প্রকৃতির পরিণাম এই সাংখ্যমত গ্রাহ্য নহে। ইহা যে অধিকারী ব্রহ্মের বিবর্ত, এই মতই আদরণীয়।

কোনও ব্যক্তির মোক্ষে সকলের মোক্ষ হয়, অথবা কাহারও মোক্ষ হয় না—এই দুইটি পক্ষের একটিকে সাংখ্যাকারগণকে গ্রহণ করিতে হয়।

এই অনুপপত্তি মায়াবাদ অঙ্গীকার করিয়াই দূর করা যাইতে পারে।

জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত— ইহা শুনিয়া হয়ত অনেকে জিজ্ঞাসা করিবেন, যে জগৎ কি মিথ্যা যে জগৎকে আমরা ব্রহ্মের বিবর্ত বলিব ? শুক্তি রজতকে আমরা শুক্তির বিবর্ত বলি, কারণ ঐ রজত মিথ্যা। শুক্তিতে আমাদের যে মিথ্যা রজতজ্ঞান হইয়া থাকে, ঐ রজত তাহার বিষয়। এইরূপ রজ্জুসর্পকে আমরা সর্পের বিবর্ত বলি— কারণ ঐ সর্প মিথ্যা সর্প, রজ্জুতে আমাদের যে মিথ্যা সর্পজ্ঞান হয়, ঐ সর্প তাহার বিষয়। কিন্তু জগৎকে আমরা ব্রহ্মের বিবর্ত বলিব কেন ? ইহা কি মিথ্যা ? শুক্তিরজত মিথ্যা, কারণ শুক্তিতে রজতের যে প্রতীতি হয়, তাহা পরে বাধিত হয়। আমরা পরে জানিতে পারি যে, যে ইদংকে আমরা রজত বলিয়া বুঝিয়াছিলাম, সেই ইদংটি রজত নহে, শুক্তি। এইরূপ রজ্জুসর্প মিথ্যা, কারণ পরে আমরা বুঝিতে পারি যে, যে ইদংকে আমরা সর্প বলিয়াছিলাম, তাহা সর্প নহে, রজ্জু। কিন্তু আমাদের জগৎ বা প্রপঞ্চপ্রতীতি কি কখনও এই ভাবে বাধিত হয় ? আমরা যাহাদের ঘট পট প্রভৃতি বলিয়া দেখি তাহারা যে ঘট, পট প্রভৃতি নহে, ব্রহ্ম এইরূপ প্রতীতি কি আমাদের কাহারও কখনও হয় ? আরও দেখ, শুক্তিরজতকে রজতরূপে ব্যবহার করিতে যাইলে আমরা বিফল হই। কোনও শুক্তিকে রজতরূপে বুঝিয়া যখন তাহাকে পাইবার জন্য আমরা তাহার নিকটে উপস্থিত হই তখন তাহার নীলপৃষ্ঠ প্রভৃতি দেখিতে পাই, এবং আমার রজত প্রবৃত্তি যে বিফল হইল তাহা বুঝিতে পারি। কিন্তু প্রপঞ্চ সম্পর্কে কি এইরূপ কথা বলা চলে ? আমরা যে ঘট পট প্রভৃতির ব্যবহার করি সেই ব্যবহার কি কখনও বিফল হয় ? অতএব এই জগৎ সার্বজনীন অনুভব ও ব্যবহারসিদ্ধ। ইহাকে মিথ্যা বলিবার কোন যোগ্য হেতু নাই। সুতরাং ইহাকে কাহারও বিবর্ত বলা অনুচিত।

এই প্রপঞ্চ ব্রহ্মের বিবর্ত

এইরূপ পূর্বপক্ষীগণের বিরুদ্ধে অদ্বৈতাচার্যগণ বলেন যে জগৎকে মিথ্যাই বলিতে হইবে। প্রতীত হয় বলিয়া তুমি জগৎকে মিথ্যা বলিতে চাহিতেছ না। কিন্তু প্রশ্ন এই যে তুমি কি অপ্রতীত পদার্থকেই মিথ্যা বল ? অবশ্যই বলিতে পার না। কারণ, সুষুপ্তি বা মূর্ছাকালে এই জগতের প্রতীতি থাকে না। তুমি কি বলিবে যে জগৎ তখন মিথ্যা হইয়া যায় ? এইরূপ, ব্যবহারসিদ্ধ বলিয়া তুমি জগৎকে মিথ্যা বলিতে চাহিতেছ না। কিন্তু প্রশ্ন এই যে যাহা ব্যবহারসিদ্ধ তাহাকেই কি আমরা সত্য বলিতে পারি ? তুমি বা আমি বা রত্নবিষয়ে কোনও অজ্ঞ ব্যক্তি যখন কোনও অসাধু মণিকারের নিকট হইতে একটি নকল অর্থাৎ মিথ্যা হীরাকে সত্য হীরা বলিয়া ক্রয় করি ও হীরা বলিয়াই অলঙ্কাররূপে ব্যবহার করিয়া যাই, তখন ঐ মিথ্যা হীরাটি সত্য হীরার মত ব্যবহৃত হইলেও, মিথ্যা হীরাই থাকিয়া যায়। হীরকরূপে ব্যবহৃত হইতেছে বলিয়া,

কারণ ইহা মিথ্যা

উহাকে যে সত্য হীরক বলা যাইবে তাহা যাইবে না। এইরূপ অনেক সময় স্বাপ্ন তৃষ্ণা স্বাপ্ন বারির দ্বারাই নিবৃত্ত হয়। কিন্তু তুমি কি বলিবে যে ঐ স্বাপ্ন বারি সত্য বারি? সংক্ষেপে, যাহা ব্যবহারসিদ্ধ তাহাই সত্য, এইরূপ কথা বলা যায় না, এবং সেইজন্যই এই প্রপঞ্চকে যে অনুভূত হয় বলিয়া বা ব্যবহারসিদ্ধ বলিয়া, মিথ্যা নহে বলিব তাহা হইবে না।

এই প্রপঞ্চ মিথ্যাই। কারণ মিথ্যা বলিতে মায়াময় বা অনির্বচনীয় পদার্থকেই বুঝিতে হয়। দৃষ্টান্তের দ্বারা কথাটিকে বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। শুক্তিতে আমাদের যে রজতজ্ঞান হয়, তাহা মিথ্যা। এই মিথ্যাজ্ঞানের বিষয় যে রজত তাহার স্বরূপ কি? বিচার করিয়া দেখিলে ইহাকে মায়াময়ই বলা উচিত। ইহার প্রতীতি হয়। সেইজন্য ইহাকে গগন কমলের ন্যায় অসৎ বলা যায় না। কিন্তু ইহাকে সৎও বলা যায় না। কারণ, পরে যখন আমাদের অধিষ্ঠানবুদ্ধি হয় তখন বুঝিতে পারা যায় যে ইহা শুক্তি এবং কোন কালেই রজত নহে। অতএব দেখা যাইতেছে যে শুক্তি রজতের সত্তা মায়াময়। ইহা সৎ হইতেও ভিন্ন, আবার অসৎ হইতেও ভিন্ন। ইহার কোনও যোগ্য বর্ণনা আমরা দিতে পারি না। ইহার নির্বাচন অসম্ভব। যাহা সৎ হইতেও ভিন্ন এবং অসৎ হইতেও ভিন্ন, তাহা যে প্রকৃতপক্ষে কি, তাহা আমরা বলিয়া উঠিতে পারি না। তাই আমরা তাহাকে অনির্বচনীয় বা মায়াময় বলিয়া থাকি। এখন, শুক্তি রজত যে অনির্বাচ্য বা মায়াময় তাহা অনেকে স্বীকার করেন না। অনেকে বলেন যে শুক্তিতে যখন রজতের জ্ঞান হয় তখন প্রকৃতপক্ষে রজতের স্মরণই হয়, গ্রহণ বা অনুভব হয় না। এই সকল দর্শনাচার্যগণের মতে শুক্তিতে আমাদের যে ইহা রজত এইরূপ জ্ঞান হয়, তাহা প্রকৃতপক্ষে একটি জ্ঞান নহে—দুইটি জ্ঞান এবং ইহাদের একটি গ্রহণ ও অপরটি স্মরণ। ইদং-এর জ্ঞানটি গ্রহণ এবং রজতের জ্ঞানটি স্মরণ। অর্থাৎ ইহা রজত, এই জ্ঞানস্থলে ইদং-এর সাক্ষাৎকার হয় এবং রজত স্মৃত হয়। এবং আমরা শুক্তিকে রজত বলিয়া দেখি বলিয়া যে শুক্তিতে রজত জ্ঞানটি অযথার্থ হয় তাহা নহে; আমরা ইদং-এর সাক্ষাৎরূপ অনুভব হইতে রজতের স্মরণ-রূপ জ্ঞানকে পৃথক করি না বলিয়াই জ্ঞানটি অযথার্থ হয়। অতএব, শুক্তিতে প্রতীত রজতকে মায়াময় বা অলৌকিক বলিয়া মনে করিবার কোনও কারণ নাই। ইহা প্রকৃতপক্ষে পূর্বে অনুভূত এবং বর্তমানে স্মৃত রজত ভিন্ন আর কিছুই নহে। অদ্বৈতা-চার্যগণ এই মত গ্রহণ করেন না। তাঁহারা বলেন যে শুক্তিতে প্রতীত রজতকে স্মৃত রজত বলিয়া মনে করা যায় না। কারণ রজতে রজত জ্ঞান কালে, আমরা যেমন ইহা রজত বলিয়া বুঝি, শুক্তিতে রজতজ্ঞান কালেও আমরা ঠিক তেমনই, 'ইহা রজত'

অখ্যাতিবাদ গ্রাহ্য নহে

বলিয়া বুঝি। সম্যক্ ও অসম্যক্ স্থলের মধ্যে এই ব্যাপারে যদি কোন বৈষম্য থাকিত, তাহা হইলে প্রথম স্থলে রজত যে অনুভূত হয় এবং দ্বিতীয় স্থলে তাহা যে স্মৃত হয় তাহা বলা চলিত। কিন্তু সকলেই জানেন যে ইহাদের মধ্যে কোন বৈষম্য নাই। সম্যক্‌স্থলে রজতার্থির যেমন রজতে প্রবৃত্তি হয়, অসম্যক্‌স্থলেও তাহার ঠিক তেমনই প্রবৃত্তি হয়। বস্তুতঃ অনেক সময় প্রবৃত্তি বিফল না হইলে বুঝিতেই পারা যায় না যে অনুভবটি অযথার্থ। আরও দেখ, সম্যক্‌স্থলে যেমন রজতত্ববিশিষ্টের বোধ হয়, অসম্যক্‌স্থলেও ঠিক তেমনই হয়। সেইজন্য আমরা বলিতে পারি না শুক্তিতে রজত জ্ঞান কালে ইদং-এর সাক্ষাৎকারের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রজতের স্মৃতি হইয়া থাকে। অর্থাৎ এই বোধ একটি বিশিষ্টবোধ, দুইটি বোধের অবিবেক নহে। এই বোধটিকে যদি একটি বিশিষ্টবোধ বলা না হয়, তাহা হইলে পরে যখন শুক্তিতে ইহা শুক্তি এইরূপ বোধ হয়, তখনও যে একটি বিশিষ্ট বোধ উৎপন্ন হইল তাহা বলা যায় না, এবং তাহার জন্য ইহা শুক্তি, এই অধিষ্ঠান জ্ঞান যে ইহা রজত এই জ্ঞানকে বাধিত করে, তাহাও বলা যায় না। অতএব, শুক্তিতে প্রতীত রজত অনুভূতই, স্মৃত নহে। রজত দেখিতেছি বা দেখিয়াছিলাম এইরূপ কথাই আমরা বলি। রজত স্মরণ করিতেছি বা করিয়াছিলাম, এইরূপ কথা কখনও বলি না। শুক্তি রজতকে স্মর্যমাণ বলা চলে না। তুমি যে বলিবে যে সত্যসত্যই যখন পুরোবর্তি প্রদেশে রজত নাই, তখন ইন্দ্রিয়ের সহিত সন্নিকর্ষের অভাবে তাহার কোনও অনুভব হইতে পারে না, এবং সেই জন্যই এই রজতকে স্মর্যমাণ রজত বলিয়া মনে করা ছাড়া উপায় নাই, তাহা হইবে না। কারণ ঐ রজত যে মায়াময় বা অলৌকিক বলিয়াই ঐরূপ নহে, তাহা তোমাকে কে বলিল? অতএব শুক্তি রজতকে বা মিথ্যাজ্ঞানের বিষয়কে স্মর্যমাণ পদার্থ বলিয়া মনে করা যায় না। এইরূপ, ইহাকে স্মৃতিরূপ সন্নিকর্ষ বলে অনুভূত দেশান্তরীয় কালান্তরীয় কোন পদার্থ বলিয়াও মনে করা যায় না। কারণ, ঐরূপ কোনও সন্নিকর্ষ প্রসিদ্ধ নহে।

অন্যথাখ্যাতিবাদও গ্রাহ্য নহে

ন্যায়াচার্যগণ অবশ্য এরূপ সন্নিকর্ষ স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন যে আমরা অনেক সময় চন্দনের সুরভির চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিতে পারি। চক্ষুর সহিত সৌরভের কোনও লৌকিক সন্নিকর্ষ থাকিতে পারে না। অথচ আমাদের এই প্রত্যক্ষ হয়। সুতরাং কোনও অলৌকিক সন্নিকর্ষ, অর্থাৎ সৌরভের পূর্ব অনুভব জন্য সংস্কারের উদ্বোধ জন্য স্মৃতিরূপ জ্ঞানাত্মক সন্নিকর্ষ স্বীকার করিতে হয়। এইরূপ শুক্তিতে রজত জ্ঞান কালেও রজতের পূর্বানুভবজনিত সংস্কার উদ্‌বুদ্ধ হইয়া এমন কোন এক জ্ঞানের জন্ম দেয়, যাহা অন্যদেশে অন্যকালে অবস্থিত রজতকে প্রত্যক্ষ করায়, এই কথা বলা যাইতে পারে। ইহাই ন্যায়াচার্যগণের অভিমত। কিন্তু অদ্বৈতাচার্যগণ ইহা স্বীকার

করেন না। তাঁহারা বলেন যে এইরূপ সন্নিকর্ষ স্বীকার করিলে অনুমানের উচ্ছেদ হইয়া যায়। শুক্তির সহিত চক্ষুর সন্নিকর্ষ হইলে দেশান্তরে, কালান্তরে অনুভূত রজতের অনুভব জন্য সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়া সেই রজতকে প্রত্যক্ষ করাইতে পারে এমন কোনও স্মৃতিরূপ সন্নিকর্ষের জন্ম যদি দিতে পারে, তাহা হইলে পর্বতে ধূম দেখিলে পূর্বানুভূত মহানসীয় বহ্নির অনুভব জন্য সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়া পর্বতীয় বহ্নির সজাতীয় সেই বহ্নির প্রত্যক্ষ করাইতে পারে এমন কোন স্মৃতিরূপ সন্নিকর্ষের জন্ম কেন দেয় না। তুমি যে বলিবে যে জন্ম দিলেই বা কি হইবে, মহানসীয় বহ্নিই অনুভূত হইবে, সাধ্য পর্বতীয় বহ্নি অননুভূত থাকিবে বলিয়া অনুমিতি হইবে, তাহা হইবে না। কারণ, অনুমানের ক্ষেত্রে পর্বতীয় বহ্নি বহ্নিত্ব-বিশিষ্টরূপেই জ্ঞাত হয়, পর্বতীয়রূপে জ্ঞাত হয় না। অন্ততঃ ধূমকে হেতু করিয়া বহ্নিকে যখন জানি, তখন বহ্নিত্বাবচ্ছিন্নরূপেই তাহাকে জানি। অতএব, স্মৃতিরূপ সন্নিকর্ষ স্বীকার করিলে কেন যে অনুমানের উচ্ছেদ হইবে না, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। শুক্তি রজতকে আমরা দেশান্তরীয় কালান্তরীয় রজত বলিতে পারি না। ইহাকে মায়াময় বা অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন অনির্বাচ্য রজতই বলিতে হইবে।

মিথ্যা পদার্থ যে মায়াময় বা অনির্বাচ্য তাহা আমরা দেখিলাম। এখন এই প্রপঞ্চ মিথ্যা কিনা তাহা বিচার করিয়া দেখা যাউক। এই প্রপঞ্চ যদি সৎ ও অসৎ হইতে বিলক্ষণ হয়, ইহার স্বরূপ যদি অনির্বাচ্য হয়, তাহা হইলে ইহাকেও মিথ্যা বা মায়াময় বলিতে হইবে। অতএব, প্রশ্ন এই যে এই প্রপঞ্চ অনির্বাচ্য কি না। অনেক দর্শনাচার্য এই প্রপঞ্চ যে মিথ্যা নহে তাহা বলিয়া থাকেন। তাঁহারা মনে করেন যে ইহার স্বরূপ নির্বাচন করা যায়। কিন্তু বিচার করিলে বুঝিতে পারা যায় যে প্রপঞ্চের স্বরূপ বুঝিতে পারা যায় না। যাঁহারা প্রপঞ্চের স্বরূপ বুঝিতে পারি এইরূপ কথা বলেন তাঁহাদের শ্রীহর্ষ মিশ্র প্রভৃতি পণ্ডিতগণ সুশিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে জগৎকে বুঝিবার জন্য যে কার্য, কারণ প্রভৃতি কথা ব্যবহার করা হয় তাহার কোনও অর্থ বুঝিতে পারা যায় না। কার্য কারণ হইতে ভিন্ন, না অভিন্ন। অসৎ কার্যবাদিগণ বলেন যে কার্য কারণ হইতে ভিন্ন। কিন্তু তাহাই যদি হইল, তাহা হইলে কার্যের উৎপত্তি কেমন করিয়া হইতে পারে? এই উপাদান হইতে এই কার্য উৎপন্ন হয়, এই উপাদান ব্যবস্থা সম্ভব হয় কেমন করিয়া? তুমি ঘট তৈয়ারী করিবার জন্য মৃত্তিকা বিশেষ গ্রহণ কর, পট তৈয়ারী করিবার জন্য সুতা লও, এইরূপ অন্যান্য ক্ষেত্রেও। এখন প্রশ্ন এই যে ঘট যদি মৃত্তিকা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নই হয়, মৃত্তিকাতে ইহা যদি কোনরূপে বিদ্যমান না থাকে,

এই প্রপঞ্চের স্বরূপ নিরূপণ করা যায় না তাই ইহা মিথ্যা বা মায়াময়।

তাহা হইলে ঘট নির্মাণের জন্য মৃত্তিকা গ্রহণ না করিয়া তন্তু বা অন্য কিছু লও না কেন ? অতএব কার্য যে কারণ হইতে ভিন্ন তাহা বলা যায় না। এইরূপ কার্য যে কারণ হইতে অভিন্ন তাহাও বলা যায় না। কারণ কার্যের যে উৎপত্তি হয়, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু যাহা থাকে, তাহাকে কি আর কেহ উৎপন্ন করিবার চেষ্টা করে ? তুমি যে বলিবে যে কার্যকে উৎপন্ন করা হয় না, অভিব্যক্ত করা হয়, তাহা হইবে না। কারণ, কার্যের অভিব্যক্তি কি কার্য হইতে ভিন্ন ? যদি ভিন্ন না হয়, তাহা হইলে কার্যের অভিব্যক্ত হওয়াও যাহা, উৎপন্ন হওয়াও তাহা। আর যদি ভিন্ন হয় তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধ কি ? ঘটের অভিব্যক্তি কেন পটের অভিব্যক্তি হইয়া যায় না ? ধরিয়া লইলাম যে ঘটের অভিব্যক্তির সহিত ঘটের কোন বিশেষ অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ আছে এবং সেই জন্যই ঘটের অভিব্যক্তি পটের অভিব্যক্তি হইয়া যায় না। কিন্তু প্রশ্ন এই যে এই বিশেষ সম্বন্ধটি কি অভিব্যক্তির সহিত উৎপন্ন হয়, অথবা পূর্ব হইতেই থাকে ? ইহা যে উৎপন্ন হয়, তাহা বলিতে পারা যায় না। কারণ পূর্ব হইতেই এই সম্বন্ধ যখন ঘটের সম্বন্ধ ছিল না, তখন উৎপত্তির পর কেন যে ইহা ঘটের না হইয়া পটের হইয়া যাইবে না তাহা বুঝিতে পারা যায় না। এইরূপ ইহা উৎপন্ন হয় না, ইহাও বলিতে পারা যায় না। কারণ এই সম্বন্ধের একটি সম্বন্ধী (অভিব্যক্তি) যখন পূর্বে ছিল না, তখন এই সম্বন্ধ পূর্ব হইতে থাকিবে কি করিয়া ? আরও দেখ, মৃত্তিকা, ঘট, চূর্ণ, পিণ্ড, ইহারা সকলেই যদি অভিন্ন হইত, তাহা হইলে ইহাদের পৃথক পৃথক নাম এবং ব্যবহার থাকিত না। তুমি যে বলিবে যে ইহারা আসলে এক হইলেও ইহাদের মধ্যে ব্যূহগত বা বিন্যাসগত ভেদ আছে, তাহাও হইবে না। কারণ বিন্যাসগত ভেদও ভেদ। অসৎকার্যবাদীরা এই ভেদকে অত্যন্ত ভেদ বলিয়া মনে করিয়া ভুল করিতে পারেন। কিন্তু এই ভেদ কোনও ভেদই নহে, অবয়বী ও অবয়বের মধ্যে কোন ভেদই নাই, ইত্যাদি কথা মনে করা বাতুলতা। অতএব কার্যকে কারণ হইতে ভিন্নও বলা যায় না, অভিন্নও বলা যায় না। কার্যের স্বরূপ নির্বাচন করা তোমার বা আমার বা কাহারও সাধ্য নহে। ইহা প্রকৃতপক্ষে অনির্বাচ্য। কার্য মাত্রই মায়াময়। ইহা সৎও নহে অসৎও নহে। ভাবিয়া দেখ দেখি, যাহাকে সৎ বলা হয় তাহার কি কোনও কারণের প্রয়োজন আছে ? ন্যায়াচার্যগণ আকাশকে নিত্য বলেন, কালকে নিত্য বলেন, পরমাণুকে নিত্য বলেন, এবং আরও অনেক কিছুকেই নিত্য বলেন এবং আরও বলেন যে নিত্যের কোন কারণের অপেক্ষা নাই। আমরাও তাহাই বলি, আমরাও বলি যাহাই সৎ তাহাই নিত্য এবং তাহার কোনও কারণের অপেক্ষা নাই। এইরূপ যাহা অসৎ তাহারও কোন কারণের

কার্য মাত্রই মায়াময়।

অপেক্ষা নাই। শশক-বিষাণের কি কোন কারণের অপেক্ষা আছে? কেহ কি কখনও তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়াছে? অতএব যাহা সৎ তাহারও কোন কারণের অপেক্ষা নাই এবং যাহা অসৎ তাহারও কোন কারণের অপেক্ষা নাই। যাহা সৎও নহে, অসৎও নহে তাহারই কারণের অপেক্ষা আছে। অর্থাৎ কার্য মাত্রই মায়াময়। তাহার স্বরূপ নির্বাচন করা যায় না। এখন জগৎ যে, একটি কার্য, তাহা তুমি এবং আরও অনেকে বলিয়া থাক, যদিও ভাবিয়া দেখ না যে ইহার অর্থ হইল জগৎকে মিথ্যা বলা। আমরা যখন জগৎকে মিথ্যা বলি তখন প্রকৃতপক্ষে কোন নূতন কথা বলি না। তোমাদেরই মত আমরা জগৎকে দৃশ্য বলি, সাবয়ব বলি, কার্য বলি। তবে তোমরা খেয়াল কর না যে এইরূপ বলা আর মায়াময় বলা এক। আমাদের এই খেয়াল আছে। এইখানেই তোমাদের হইতে আমাদের পার্থক্য। আমরা জানি যে জগৎ প্রকৃতপক্ষে মায়াময়। প্রকৃত বোদ্ধার কাছে ইহা একটি হেঁয়ালী। ইহার স্পষ্ট প্রতীতি হয়, অথচ ইহার কোনও অর্থও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যাদুকর যখন তাঁহার টুপীর মধ্য হইতে পালে পালে শশক বাহির করিতে থাকেন, তখন আমরা অবাক বিস্ময়ে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকি। শশকগুলিকে আমরা দেখি তাই অস্বীকার করিতে পারি না। আবার টুপীর ভিতরে যে এত শশক থাকিতে পারে না, তাহাও বুঝি—এবং সেইজন্য শশকগুলিকে সত্য বা বাস্তব বলিয়া স্বীকারও করিতে পারি না। ভাবি অদ্ভুত, আশ্চর্য, অনির্বচনীয়। বোদ্ধাগণের নিকট এই জগৎ তাহাই। ইহা আছে, অথচ ইহার থাকা উচিত ছিল না। যাদুকরের শশকগুলি যেমন কিছু-কাল পরে মিলাইয়া যায় এই দৃশ্য জগতের যাবৎ পদার্থও ঠিক তেমনই কিছুকাল থাকে এবং তাহার পরে মিলাইয়া যায়। এই প্রপঞ্চে কোন নিত্য পদার্থ আমরা প্রত্যক্ষ করি কি? আমরা কি দেখি না যে গন্ধভারে আমন্থর বসন্তের উন্মাদনা আসিতে না আসিতেই উন্মাদিনী কালবৈশাখীর নৃত্য শুরু হয়? আমরা কি বুঝি না যে শরতের প্রসন্ন প্রভাত তপনেই হেমন্তের শিশিরসিক্ত কুন্দপুষ্পে অশ্রুভরা সাজি সাজাইবার ইঙ্গিত বিদ্যমান? এই দৃশ্য জগতে কেবল পুষ্করপলাশগত বারি বিন্দুই অস্থির নহে; ধন বল, মান বল, যৌবন বল, কান্তা বল, পুত্র বল, আবার গিরি, নদী, বন, উপবনই বল সব কিছুই সতত চঞ্চল, ইন্দ্রধনুচ্ছটার ন্যায় ইন্দ্রজাল স্বরূপ। তোয়বুদ্বুদসম সতত চঞ্চল দৃশ্য জগৎ মিথ্যা, মায়াময়। কেবল ইহার সাক্ষী সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই নিত্য এবং সত্য। ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই সত্য নহে। ব্রহ্মই ঋত আর সব কিছুই অনৃত। এই প্রপঞ্চ মিথ্যা। নিস্তত্ত্বা, কার্যমাত্রগম্যা অচিন্ত্য মায়া-শক্তির বা অজ্ঞানের সৃষ্টি, পরিণামবিহীন অবিকারী ব্রহ্মের বিবর্ত মাত্র।

জগৎকে কার্য বলার অর্থই হইল মায়াময় বলা।

এখন তুমি যে বলিবে যে অজ্ঞান কিনা জ্ঞানাভাব হইতে জগতের সৃষ্টি হইতে পারে না, তাহা হইবে না। কারণ, অজ্ঞান যে একটি অভাব পদার্থ তাহা তোমাকে কে বলিল? আমি যখন জানি যে, আমি অজ্ঞ, আমাকে বা অন্য কাহাকেও জানি না, তখন যাহা আমার বোধের বিষয় হয় তাহা কি জ্ঞানাভাব? অবশ্যই নহে। অজ্ঞান যদি জ্ঞানাভাব হইত, তাহা হইলে আমি অজ্ঞ এইরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান হইত না। কারণ অভাব পদার্থের কোন প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। অর্থাৎ যাহার সহিত কোন না কোন ইন্দ্রিয়ের কোন না কোন সন্নিকর্ষ হয়, তাহারই প্রত্যক্ষ হইতে পারে। কিন্তু অভাবের সহিত কি কাহারও কোন ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইতে পারে? আমরা ভূতলে যে ঘট নাই বা ঘটাভাব যে আছে তাহা অনুভব করি। কিন্তু এই ঘটাভাবের সহিত কি আমাদের কোনও ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হয়? আমাদের চক্ষু সন্নিকৃষ্ট হয় ভূতলের সহিত। অতএব ভূতলের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ আমাদের হয় বা হইতে পারে। কিন্তু ঘটাভাবের আমাদের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইবে কি করিয়া? তুমি যে বলিবে যে ভূতলে ঘটাভাব থাকার অর্থ কেবল ভূতল থাকা, তাহা হইবে না। কারণ, ঘটাভাব ও ভূতলের মধ্যে আধেয় ও আধার ভাব বর্তমান রহিয়াছে। ভূতলে ঘটাভাব থাকার অর্থ কেবল ভূতল থাকা হইতে পারে না। আর তাহা ছাড়া তুমি যদি অভাব বলিতে অধিকরণই বুঝ, তাহা হইলে ত' কাজ মিটিয়াই গেল। কারণ, তোমার মতে অভাব বলিয়া ভাব পদার্থ ভিন্ন পদার্থ নাই। সুতরাং অজ্ঞান বলিতে তুমি কোন অভাব অর্থাৎ জ্ঞানাভাব বুঝিতে পার না।

এই প্রপঞ্চের উপাদান ভাবরূপ অজ্ঞান

এখন তুমি যে বলিবে যে ন্যায়াচার্যগণের মত আমি অভাবকে অতিরিক্ত এবং প্রত্যক্ষবেদ্য পদার্থ বলিব, এবং সেইজন্য আমি অজ্ঞ, প্রভৃতি স্থলে আমার জ্ঞানাভাবেরই যে প্রত্যক্ষ হয় তাহা বলিব, তাহা হইবে না। কারণ অভাবের প্রত্যক্ষ হয় ইহা স্বীকার করিলেও আমি অজ্ঞ এই অনুভবকে জ্ঞানাভাবের অনুভব বলা যায় না। অভাবের প্রত্যক্ষ হইতে হইলে যাহার অভাব তাহার, অর্থাৎ অভাবীয় প্রতিযোগীর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন এবং যে অধিকরণে অভাবের জ্ঞান হইতেছে সেই অধিকরণেরও জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। যেমন, আমি যখন দেখি যে ভূতলে ঘটাভাব রহিয়াছে, তখন আমাকে ভূতল দেখিতে হয় এবং ঘটের জ্ঞান রাখিতে হয়। আমি যদি ঘট কাহাকে বলে তাহা না জানিতাম, তাহা হইলে ভূতলে যে ঘট নাই তাহা বলিতে পারিতাম না। আমি পিথিকেনথ্রোপাস কখনও দেখি নাই

অজ্ঞানের ভাবরূপত্বের পক্ষে প্রমাণ

এবং কিসে যে এইরূপ বিদ্‌ঘুটে নাম শক্ত, তাহাও আমি জানি না। আমি জানি না ইহা একটি প্রাণীর নাম, না নদীর নাম, না পাহাড়ের নাম, না কোনও দেশের নাম, না কোন সেনাপতির নাম, না কোনও মহাবীরের প্রেয়সীর নাম। আমি জানি না ইহার রূপ কি, গুণ কি, কর্ম কি। সুতরাং, আমার রান্নাঘরে যে পিথিকেনথ্রোপাস নাই তাহা আমি কি করিয়া বলিব? আমাব রান্নাঘরে ইহা রহিয়াছে দেখিতেছি এবং তাহা রহিয়াছে দেখিতেছি; কিন্তু যেহেতু আমি জানি না যে ইহাদের কাহাকেও পিথিকেন্‌থ্রোপাস বলে কিনা সেই হেতু আমার পক্ষে রান্নাঘরে যে ঐ বিদ্‌ঘুটে নামধারী পদার্থটি নাই, তাহা বলা সম্ভব নহে। অতএব ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে অভাবীয় প্রতিযোগীর, যাহার অভাব তাহার, জ্ঞান যাহার নাই, তাহার অভাব জ্ঞান হইতে পারে না। এইরূপ অধিকরণকে যদি আমি প্রত্যক্ষ না করি, তাহা হইলে সেই অধিকরণে অভাব প্রত্যক্ষ করিব কেমন করিয়া? আমি কি কলিকাতায় বসিয়া বলিতে পারি যে হাওয়াই দ্বীপে যে শাদা ভালুক নাই তাহা আমি দেখিতেছি? অতএব অধিকরণের প্রত্যক্ষ না হইলে এবং প্রতিযোগীর জ্ঞান না থাকিলে, অভাব প্রত্যক্ষ যে হইতে পারে না তাহা বলিতে হয়। আরও দেখ. যে অধিকরণে অভাবীয় প্রতিযোগীর জ্ঞান হয় সেই অধিকরণে সেই প্রতিযোগীর অভাবের জ্ঞান হইতে পারে না। আমি যখন তোমাকে আমার সামনের আসনে বসিয়া থাকিতে দেখিতেছি, তখন তুমি যে ঐ আসনে বসিয়া নাই তাহা বলিতে পারিব না। অতএব অভাব প্রত্যক্ষ করিতে হইলে প্রতিযোগীর জ্ঞান রাখিতে হইবে, অধিকরণকে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে এবং ঐ অধিকরণে প্রতিযোগীকে প্রত্যক্ষ করিলে চলিবে না। এইবার বিচার করিয়া দেখ আমি অজ্ঞ এই প্রত্যক্ষ আত্মাতে জ্ঞানাভাবের প্রত্যক্ষ কি না। অবশ্যই নহে। কারণ, আত্মা জ্ঞানস্বরূপ। আত্মাতে জ্ঞানাভাবের বোধ করিতে যাইলে প্রথমেই জ্ঞানের অর্থাৎ জ্ঞানাভাবের প্রতিযোগীর জ্ঞান হইয়া যাইবে এবং সেইজন্য ঐ অধিকরণে আর জ্ঞানাভাবের প্রত্যক্ষ হইতে পারিবে না। টেবিলে আমার জ্ঞানাভাবের জ্ঞান হয়। কারণ টেবিল অচেতন জড় পদার্থ—জ্ঞানস্বরূপ নহে। কিন্তু আত্মায় বা জ্ঞানময়ে, আমার জ্ঞানাভাবের জ্ঞান কি করিয়া হইবে? আরও দেখ, জ্ঞান স্বপ্রকাশ। জ্ঞান জ্ঞানের বিষয় না হইয়াও অপরোক্ষ হয়। আমরা যে ভাবে ঘট জানি বা পট জানি, সেই ভাবে জ্ঞানকে জানি না। যখনই জ্ঞান বিষয় প্রকাশ করে তখনই নিজকেও প্রকাশিত করে। এইজন্যই আমরা জ্ঞানকে আলোকের সহিত তুলনা করি। কোনও দীপের সাহায্যে যখন তুমি ঘট প্রভৃতি পর-প্রকাশ্য পদার্থ দেখ, তখন কি আবার দীপকে দেখিবার জন্য আর একটি দীপ লইয়া আইস? অবশ্যই আস না? দীপ ঘটের মত পর-প্রকাশ্য

পদার্থ নহে। ইহা স্ব-প্রকাশ্য—পর-প্রকাশ্য পদার্থকে প্রকাশ করিবার কালে ইহা নিজেকেও প্রকাশিত করে। জ্ঞানও সেইরূপ তাহার বিষয়কে প্রকাশ করিবার কালে নিজকেও প্রকাশ করে। এখন, ইহাই যদি জ্ঞানের স্বভাব হয়, তাহা হইলে আত্মাতে জ্ঞানাভাবের জ্ঞান কেমন করিয়া হইবে ? আত্মাতে যখনই জ্ঞানাভাবকে জানিতে যাইব, তখনই ঐ জ্ঞানাভাবের জ্ঞানের জ্ঞান, অর্থাৎ জ্ঞানও যে ঐ অধিকরণে রহিয়াছে এই জ্ঞান আমার হইয়া যাইবে। সুতরাং আত্মাতে জ্ঞানাভাবের প্রত্যক্ষ জ্ঞান কিছুতেই হইতে পারে না। আমি অজ্ঞ, এই জ্ঞানটি যে আত্মাতে জ্ঞানাভাবের জ্ঞান তাহা বলিতে পারি না। বস্তুতঃ অন্ধকারে প্রথমোৎপন্ন প্রদীপ প্রকাশ যেমন তাহার বিষয়ের আবরক ভাবরূপ অন্ধকারকে বিনষ্ট করিয়া উৎপন্ন হয়, প্রমাজ্ঞানও তেমনই তাহার বিষয়ের আবরক ভাবরূপ অজ্ঞানকে ধ্বংস করিয়াই হইয়া থাকে। অজ্ঞানকে জ্ঞানাভাব বলা যাইতে পারে না।

বস্তুতঃ অজ্ঞান জ্ঞানাভাব হইলে সুষুপ্তিকালে যে ব্রহ্মতত্ত্বের বা আত্মতত্ত্বের অবভাস হয় না, তাহার কোনও উপপত্তি হয় না। অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে আত্মতত্ত্বের অবভাস হয় না। কিন্তু কেন ? আত্মা জ্ঞানস্বরূপ। সুতরাং সুষুপ্তিকালে তাহার অবভাস হওয়া উচিত। কিন্তু হয় না। সুতরাং বলিতে হয় যে কোনও আবরক সেই সময়ে আত্মাকে আবৃত করিয়া রাখে। দিবা দ্বিপ্রহরে প্রকাশ স্বভাব দিবাকরের মেঘের জন্য প্রকাশ না হইতে পারে; সেইরূপ কোনও আচ্ছাদকের জন্যই সুষুপ্তি-কালে জ্ঞান-স্বরূপ আত্মার অবভাস হয় না। কিন্তু এই আচ্ছাদকটি কি ? অবশ্যই অজ্ঞান। কিন্তু এই অজ্ঞান কি জ্ঞানাভাব ? অবশ্যই নহে। কারণ কোনও অভাব পদার্থ কোনও কিছুর আবরক হইতে পারে না। আবরক মাত্রই ভাব পদার্থ। অতএব যাহার দ্বারা আবৃত থাকার জন্য সুষুপ্তিকালে আত্মতত্ত্বের স্ফুরণ হয় না, তাহা অবশ্যই ভাবপদার্থ। এই আবরককে সদসৎ বিলক্ষণ অজ্ঞান না বলিয়া ভ্রান্তি জ্ঞান বা বিরোধী জ্ঞান যে বলিব তাহা হইবে না। কারণ সুষুপ্তিকালে ইহারা কেহই থাকে না। এইরূপ ইহাকে যে ভ্রান্তিজ্ঞান জন্য সংস্কার বলিব তাহাও হইবে না। কারণ, এই সংস্কার এই সময় থাকে বটে, কিন্তু অধ্যস্তের জ্ঞানজন্য সংস্কার অধিষ্ঠানতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। তাহা যদি হইত তাহা হইলে শুক্তিরজতের জ্ঞানের নাশ হইলেও তজ্জন্য সংস্কার আত্মাতে থাকে বলিয়া শুক্তির জ্ঞান আর কখনও হইতে পারিত না। অতএব সুষুপ্তিকালে আত্মতত্ত্বের যে স্ফুরণ হয় না, তাহার উৎপত্তি ভাবরূপ সদসৎ বিলক্ষণ অজ্ঞানের সাহায্যেই করিতে হইবে।

তুমি যে বলিবে যে প্রাক্তন কর্মবশতঃ সুষুপ্তিকালে আত্মতত্ত্বের অবভাস হয় না

তাহা হইবে না। কারণ এই কর্ম কি নিখিল চৈতন্যকে আবৃত করে, অথবা নিজের অবভাসক চৈতন্যাংশকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য অংশকে আবৃত করে? প্রথম পক্ষটি হইতে পারে না। কারণ অখিল চৈতন্যই যদি আবৃত থাকে তাহা হইলে কর্ম চৈতন্য বা কর্ম যে চৈতন্যকে আবৃত করিতেছে এই চৈতন্য থাকিবে না। সুতরাং এই পক্ষের কোন সাধক প্রমাণই থাকিবে না। এইরূপ, দ্বিতীয় পক্ষটিও হইতে পারে না। কারণ, একই নারী যেমন একই সময়ে একাংশে যুবতী ও অপরাংশে জরতী হইতে পারে না, ঠিক তেমনই চৈতন্য একই সময়ে এক অংশে কর্মের দ্বারা আবৃত এবং অপরাংশে অনাবৃত থাকিতে পারে না। ভাবরূপ অজ্ঞান আত্মাকে আবৃত করে বলিয়া সুষুপ্তিকালে আত্মতত্ত্বের অবভাস হয় না, এই পক্ষেও এই দোষটি যে রহিয়াছে, তাহা তুমি বলিতে পার না। কারণ আমি অজ্ঞ এইরূপ অপরোক্ষ অনুভবের অন্য কোনরূপে উপপত্তি হয় না বলিয়াই অজ্ঞান যে নিজের অবভাসক অংশকে পরিত্যাগ করিয়া অপর অংশকে আবৃত করে, ইহাই বলিতে হয়। কর্মের ক্ষেত্রে এই কথা বলা যায় না। কারণ কর্ম অ-দৃষ্ট অর্থাৎ প্রত্যক্ষ পদার্থ নহে। সুতরাং অজ্ঞানের ক্ষেত্রে যাহা বলিতে পারি কর্মের ক্ষেত্রে তাহা বলিতে পারি না। অতএব ভাবরূপ অজ্ঞানই যে সুষুপ্তিকালে আত্মাকে আবৃত করিয়া রাখে এবং সেই জন্যই তখন আত্মতত্ত্বের স্ফুরণ হয় না, ইহাই স্বীকার করিতে হয়। সংক্ষেপে অজ্ঞানকে জ্ঞানাভাব বলা যায় না। ইহা ভাবরূপ।

ভাবরূপ অজ্ঞান বা ব্রহ্মের মায়াশক্তিই অচিন্ত্য-রচনারূপ এই জগতের বীজ। ইহার কার্য যেমন সৎও নহে, অসৎও নহে ইহাও সেইরূপ সৎও নহে, অসৎও নহে।

মায়া অনির্বচনীয়।

অনুভূতির বিষয় হইয়া ভাসমান থাকে বলিয়া ইহাকে অসৎ বলা যায় না। আবার জ্ঞান বিনাশ্য বলিয়া ইহাকে সৎও বলা যায় না। বস্তুতঃ এই মায়াশক্তি নিস্তত্ত্বা। ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কোন বস্তু স্বরূপতা ইহার নাই। এখন, ব্রহ্মের সত্তা হইতে কোন পৃথক সত্তা ইহার নাই বলিয়া ইহাকে যে ব্রহ্মের স্বরূপ বলিব তাহা হইবে না। কারণ বহ্নির দাহিকা শক্তিকে কি বহ্নি-স্বরূপ বলিতে পারি? কিন্তু সদ্রূপ ব্রহ্মের শক্তি ব্রহ্মস্বরূপ বা সদ্রূপ না হইলেও যে অসদ্রূপ হইবে তাহা নহে। কারণ, মায়া যদি আকাশ কুসুমের মত অসৎ হইত তাহা হইলে জগতের কারণ হইতে পারিত না। অতএব দেখা যাইতেছে যে মায়া আকাশ কুসুমের মত নিঃস্বরূপও নহে আবার বাধের অযোগ্যও নহে। ইহার স্বরূপ নির্ণয় করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে এই মায়াকে তিন প্রকার দৃষ্টিতে বুঝা যায়। শ্রৌতদৃষ্টিতে ইহা তুচ্ছ, যৌক্তিক দৃষ্টিতে ইহা অনির্বচনীয় এবং লৌকিক দৃষ্টিতে ইহা বাস্তবী। অর্থাৎ, লৌকিক দষ্টিতে মায়া সত্য। এই

জগৎ যে মিথ্যা, ইহা যে সত্য নহে, ইহা সাধারণ লোকে বুঝে না, এবং তাহারা মায়াকে সত্য বলিয়া মনে করে। ইহাতে অবশ্য বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। কারণ মায়া বিস্ময়ৈকশরীরা, অঘটনঘটনপটীয়সী। ইহার জন্যই আত্মা অন্যথাকৃত হয়। ইহার জন্যই নির্বিকার অসঙ্গ আত্মা জগদাদি দর্শন করে। কিন্তু লোক প্রসিদ্ধ দৃষ্টিতে বাস্তবী হইলেও যৌক্তিক দৃষ্টিতে মায়া অনির্বচনীয়। অনুভূত হয় বলিয়া ইহাকে অসৎ বলা যায় না। আবার বাধের অযোগ্য নহে বলিয়া ইহাকে সৎও বলা যায় না। আবার শ্রুতির অর্থ বিচারজনিত দৃষ্টিতে ইহা তুচ্ছ, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ তিন কালেই অবিদ্যমান। রজ্জুতে সর্পের ব্যবহারিক অভাব যেমন তিনকালেই বর্তমান, ব্রহ্মে মায়ার এবং তাহার কার্যের পারমার্থিক অভাবও তেমনই তিনকালেই বিদ্যমান।

তুচ্ছ, অনির্বচনীয় ও বাস্তবী মায়া।

এখন হয়ত তুমি বলিবে, এ কেমন কথা? মায়াকে ব্রহ্মের শক্তি বলিতেছ, আবার বলিতেছ ব্রহ্মে তাহার পারমার্থিক অভাব তিন কালেই বিদ্যমান—তোমার মাথা কি বিগ্‌ড়াইয়া গিয়াছে? তোমার এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলিব, না, মাথা খারাপ হয় নাই বলিয়াই এইরূপ কথা বলিতেছি। অর্থাৎ মায়ার স্ব-স্বরূপে কোন সত্তা নাই, অথচ ইহা ব্রহ্মের স্বরূপও নহে। এইরূপ মায়ার সহিত ব্রহ্মের কিরূপ সম্বন্ধ হইবে বল দেখি? ন্যায়মতে যাহাকে সংযোগ বলে সেইরূপ কোনও সম্বন্ধ ব্রহ্ম এবং মায়ার মধ্যে থাকিতে পারে না। কারণ মায়া কোন দ্রব্য পদার্থ নহে। এইরূপ সমবায় সম্বন্ধও থাকিতে পারে না। কারণ যাহাদের মধ্যে সমবায় সম্বন্ধ থাকে ব্রহ্ম এবং মায়া তাহাদের মত নহে। আবার তাদাত্ম্য সম্বন্ধও থাকিতে পারে না। কারণ, মায়া ও ব্রহ্মের স্বরূপের বৈলক্ষণ্য আছে। তাহা হইলে বেদ প্রতিপাদিত অসঙ্গ ব্রহ্মের সহিত মায়ার সম্বন্ধ কিরূপ হইবে? অবশ্যই বর্ণহীন আকাশের সহিত নীলিমার যে কল্পিত, আধ্যাসিক সম্বন্ধ, সেই অনির্বচনীয় তাদাত্ম্য সম্বন্ধই। অর্থাৎ আকাশের কোনও বর্ণ নাই অথচ আমরা তাহাকে নীল বলিয়া বুঝি। এইরূপ ব্রহ্মে মায়াশক্তির অভাব তিনকালেই রহিয়াছে, অথচ আমরা বলি যে মায়া ব্রহ্মেরই শক্তি। যাহাই হউক, অনির্বচনীয় মায়াশক্তিই এই জগতের বীজ। তাহাই জগৎরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এই মায়ার নিজস্ব কোনও সত্তা নাই। একমাত্র সদ্বস্তু ব্রহ্মই ইহার অধিষ্ঠান। কিন্তু ব্রহ্ম অধিকারী। তিনি বিকার প্রাপ্ত হইয়া জগৎরূপে পরিণত হন না। অতএব এই জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত। শুক্তিরজত যেরূপ শুক্তির বিবর্ত, এই প্রপঞ্চও সেইরূপ ব্রহ্মের বিবর্ত।

মায়া ও ব্রহ্মের মধ্যে আধ্যাত্মিক অদাত্ম্য সম্বন্ধ বিদ্যমান।

বিবর্তবাদিগণের কথা আমরা শুনিলাম। এখন ইহার উত্তরে কি বলা যাইতে পারে, তাহা দেখা যাউক। বিবর্তবাদিগণের প্রধান কথা দুইটি: (১) মিথ্যাজ্ঞানের বিষয় মিথ্যা বা মায়াময় এবং (২) অজ্ঞান ভাবরূপ। এই দুইটি কথার একটিও ন্যায়াচার্যগণ স্বীকার করেন না। সুতরাং তাঁহাদের বিবর্তবাদ গ্রহণ করার কথাও উঠে না। বিবর্তবাদীগণের প্রথম কথাটির উত্তরে ন্যায়াচার্যগণ বলিয়া থাকেন যে মিথ্যা জ্ঞানের বিষয় মিথ্যা বা অনির্বচনীয় নহে। ইহা প্রকৃতপক্ষে স্মৃতিরূপ সন্নিকর্ষ জন্য অনুভূত দেশান্তরীয় কালান্তরীয় পদার্থ। ন্যায়াচার্যগণের এই কথাটি প্রথমে বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। আমার যখন কোনও শুক্তিতে রজতজ্ঞান হয় তখন রজত যে স্পষ্টরূপেই প্রতীত হয়, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। রজতে রজত জ্ঞানকালে আমার যেরূপ স্পষ্ট রজত প্রতীতি হয়, শুক্তিতে রজত জ্ঞানকালেও আমার সেইরূপ স্পষ্ট রজত প্রতীতি হইয়া থাকে। উভয় ক্ষেত্রেই আমি বলি যে আমি রজত দেখিতেছি। আমার যদি রজতের প্রয়োজন থাকে তাহা হইলে উভয় ক্ষেত্রেই আমি রজত সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করি। অতএব যথার্থ রজত জ্ঞানস্থল হইতে অযথার্থ রজত জ্ঞানস্থলের কোন পার্থক্য এই ব্যাপারে দেখিতে পাওয়া যায় না। এইজন্য আমরা বলিতে পারি না যে সম্যকস্থলে আমার রজতের সাক্ষাৎকার হয় কিন্তু অসম্যকস্থলে আমার রজতের স্মরণ হইয়া থাকে। অতএব শুক্তি রজতকে আমরা যে স্মর্যমাণ রজত বলিব তাহা হইবে না। ইহা অবশ্য সত্য যে আমার অতীত রজত জ্ঞান এই জ্ঞানের জন্য কিছু পরিমাণে দায়ী। আমার যদি পূর্বে কোনদিন রজতবুদ্ধি না হইত, সত্যকারের রজত যদি আমি কোন দিন না দেখিতাম, তাহা হইলে আমার এই রজতজ্ঞান হইত না। আমি কোনদিন পেথিকেনথ্রোপাস দেখি নাই সেইজন্য আমি কোনদিন তোমাকে ঐ বিদ্‌ঘুটে নামধারী জীব বলিয়া বুঝি নাই। আমি অনেকদিন রামবাবুকে শ্যামবাবু বলিয়া বুঝিয়া অপ্রস্তুত হইয়াছি, উত্তমর্ণকে অধমর্ণ ভাবিয়া বিপদে পড়িয়াছি, গৃহিণীর সহোদরাকে গৃহিণী মনে করিয়া সম্বোধন করিতে গিয়া জননী বসুন্ধরা দ্বিধা হও বলিতে বাধ্য হইয়াছি, কিন্তু ইহাদের কাহাকেও কোনদিন ঐ দুরুচ্চার্য নামধারী পদার্থ বলিয়া মনে করি নাই। অতএব, কালান্তরীয় রজতানুভব যে বর্তমান রজত জ্ঞানের জন্য কিছু পরিমাণে দায়ী তাহা অস্বীকার করা যায় না। কালান্তরীয় রজতানুভব লুপ্ত হইয়া যায়, বিনাশ পায়। কিন্তু তজ্জন্য সংস্কার থাকে এবং এই সংস্কার যদি কোনরূপে উদ্‌বুদ্ধ হইতে পারে,

বিবর্তবাদ খণ্ডন।

মিথ্যা জ্ঞানের বিষয় মিথ্যা নহে।

শুক্তি রজত স্মর্যমাণ পদার্থ নহে, তবে স্মর্যমাণ সদৃশ।

তাহা হইলে রজতের স্মৃতি অথবা শুক্তি প্রভৃতি সদৃশ বস্তুতে রজতের সাক্ষাৎকার ঘটাইয়া দিতে পারে। শুক্তি রজত স্মর্যমাণ পদার্থ না হইলেও যে স্মর্যমাণ সদৃশ, তাহা অস্বীকার করা যায় না। যাহাই হউক শুক্তি রজত অনুভূত রজতই স্মর্যমাণ রজত নহে। কিন্তু, এই অনুভবের উপপত্তি হইবে কেমন করিয়া? পুরোবর্তী প্রদেশে বা যেখানে রজতের জ্ঞান হইতেছে সেখানে কোন রজত নাই। সম্যক্স্থলে পুরোবর্তী প্রদেশে রজত থাকে। অতএব তাহার সাক্ষাৎকার লইয়া কোন সমস্যা নাই। কিন্তু অসম্যক্স্থলে পুরোবর্তী প্রদেশে রজত নাই। যদি থাকিত তাহা হইলে স্থলটি অসম্যক্ না হইয়া সম্যক্ই হইয়া যাইত। সুতরাং তাহার সাক্ষাৎকার হইবে কেমন করিয়া? সম্যক্ ও অসম্যক্ স্থলের মধ্যে এই বৈষম্য থাকার জন্যই অনেকে শুক্তি রজতকে স্মর্যমাণ রজত বলিয়া মনে করেন। কিন্তু আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে ঐ রজতকে স্মর্যমাণ রজত বলা যাইবে না। সুতরাং আমাদের এই সমস্যার সমাধান অন্যরূপে করিতে হইবে। এই বিষয়ে বিবর্তবাদিগণ ও ন্যায়াচার্যগণ একমত। তাঁহারা সকলেই স্বীকার করেন যে শুক্তি রজত স্মর্যমাণ পদার্থ নহে, অনুভূত। কিন্তু এই অনুভবের উপপত্তি বিবর্তবাদিগণ একভাবে করেন, এবং ন্যায়াচার্যগণ করেন অন্যভাবে। বিবর্তবাদিগণের মতে শুক্তিতে রজত জ্ঞানকালে অজ্ঞানরূপ উপাদান দ্বারা একটি প্রাতিভাসিক রজত উৎপন্ন হয়—এবং সেইজন্যই আমাদের শুক্তিতে রজতের অনুভব হইয়া থাকে। ন্যায়াচার্যগণ ইহা স্বীকার করেন না। অজ্ঞান হইতে বা অজ্ঞানকে উপাদান করিয়া যে কোন কিছু হইতে পারে, তাহা তাঁহারা মানিতে চাহেন না। এইজন্য এই স্থলে কোন লৌকিক সন্নিকর্ষ না থাকিলেও অলৌকিক কোন সন্নিকর্ষ যে থাকে এবং সেইজন্য লৌকিক রজতই যে অনুভূত হয়, ইহাই তাঁহারা বলিয়া থাকেন। অতএব বিবর্তবাদিগণের মতে অনুভূত রজত অলৌকিক ও মায়াময়। ন্যায়াচার্যগণের মতে অনুভূত রজত লৌকিক, যদিও সন্নিকর্ষ অলৌকিক। অবশ্য সন্নিকর্ষকে অলৌকিক বলিতে ন্যায়াচার্যগণ বিবর্তবাদীদের ন্যায় কোন মায়াময় পদার্থ বুঝেন না। এই সন্নিকর্ষ যাহার সন্নিকর্ষ বা জ্ঞান হইতেছে, তাঁহার উপরই নির্ভর করে—ইহাই তাঁহারা অলৌকিক পদের দ্বারা বুঝাইতে চাহেন। অর্থাৎ তাঁহাদের মতে এই সন্নিকর্ষ যেন সকলের নহে। আমার যখন শুক্তিতে রজতের জ্ঞান হয়, তখন তোমার শুক্তিরই জ্ঞান হইয়া থাকে। তাই এই সন্নিকর্ষ অনেকটা আমার জন্যই—সকল লোকের নহে, লৌকিক নহে। যাহাই হউক বিবর্তবাদিগণের কথার সহিত ন্যায়াচার্যগণের

শুক্তি রজত অনুভূত পদার্থই। ন্যায় এবং অদ্বৈতমতে এই বিষয়ে কোন বিরোধ নাই। কিন্তু অদ্বৈতমতে এই অনুভবের একভাবে উপপত্তি করা হয়, ন্যায়মতে করা হয় অন্যভাবে।

কথা মিলে না। কিন্তু কাহাদের কথা মনে লাগে ? বিবর্তবাদিগণের কথা মনে লাগে কি ? ঐ কথা মানিলে কি অনেক অসুবিধায় পড়িতে হয় না ? বিচার করিয়া দেখা যাউক।

বিবর্তবাদিগণের মতে শুক্তিতে প্রতীত রজত কোন দেশান্তরীয় কালান্তরীয় পূর্বানুভূত রজত নহে। ইহা ঐ রজত জ্ঞানকালেই উৎপন্ন হয় এবং যখন অধিষ্ঠানের

অনির্বচনীয় খ্যাতিবাদ গ্রাহ্য নহে। কারণ, রজত যদি উৎপন্ন হয় তাহা হইলে তাহার ত্রৈকালিক নিষেধ কি ভাবে সম্ভব হয় ?

জ্ঞান হয়, যখন ভ্রম ভাঙিয়া যায়, তখন বুঝিতে পারা যায় যে যাহাকে আমি রজত বলিয়া বুঝিয়াছিলাম, তাহা শুক্তি এবং কোন কালেই রজতত্ব বিশিষ্ট নহে। এখন প্রশ্ন এই যে রজত জ্ঞান কালে রজত যদি উৎপন্নই হয় তাহা হইলে তাহার ত্রৈকালিক নিষেধ সম্ভব হয় কি করিয়া ? আমি ইহা বুঝি যে রজতজ্ঞানের পূর্বকালে ঐ রজত থাকে না, আমি ইহাও বুঝি যে উত্তরকালেও ঐ রজত থাকে না। কিন্তু জ্ঞানকালে ত' থাকে ? অতএব পুরোবর্তী প্রদেশে রজতের ত্রৈকালিক অভাব বা শুক্তিতে রজতত্বের অত্যন্তাভাব[১] যে আছে ইহা কেমন করিয়া বলিব ?

তুমি যে বলিবে যে প্রাতিভাসিক রজতত্বের অত্যন্তাভাব লইয়া কথা হইতেছে না, হইতেছে লৌকিক ব্যবহারিক রজতের ত্রৈকালিক অভাব লইয়া তাহা হইবে

লৌকিক রজত নিষেধের বিষয়—ইহা বলা যায় না। কারণ,

না। অর্থাৎ তুমি বলিতে পার যে যে-রজত জ্ঞান কালে প্রতীত হইয়াছিল, ঠিক সেই রজত নিষেধ জ্ঞানের বিষয় হয় না। রজত জানিবার সময় আমি প্রাতিভাসিক রজত জানিয়াছিলাম বটে, কিন্তু রজত নাই, ইহা বলিবার সময় আমি লৌকিক রজত যে নাই তাহাই বলি। 'ইহা রজত'—এই বাক্যের বিধেয়াংশে যে রজত রহিয়াছে, 'ইহা রজত নহে'—এই বাক্যের বিধেয়াংশে সেই রজত নাই। এইরূপ কথা তুমি বলিতে পার। কিন্তু তাহা হইবে না। কারণ, প্রতীত হইল এক রজত এবং নিষিদ্ধ হইল অন্য রজত এ আবার কিরূপ কথা ? উপরন্তু

বিধিমুখে যদি প্রাতিভাসিক রজত বিষয় হয় তাহা হইলে নিষেধ মুখেও তাহাই বিষয় হইবে।

এই দুইটি জ্ঞানের বিষয় যদি একই রজত না হয় তাহা হইলে দ্বিতীয় জ্ঞানের দ্বারা প্রথম জ্ঞানটি বাধিত হয় কিরূপে ? হ্রদে বহ্নি রহিয়াছে —এই জ্ঞানটি কি হ্রদে চৈতন্য নাই, এই জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয় ? অবশ্যই হয় না। ইহা হ্রদে বহ্নি অর্থাৎ বহ্নিত্বাবচ্ছিন্ন নাই, এই জ্ঞানের দ্বারাই বাধিত হয়— হ্রদে ধূম নাই বা হ্রদে শৈবাল রহিয়াছে, এমন কি

১ ধর্মের অত্যন্তাভাব এবং ধর্মীর অন্যোন্যাভাব সমনিয়ত বলিয়া এক।

হ্রদ বহ্নিমান নহে—এইরূপ জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয় না। সমান আকারের দুইটি জ্ঞানের মধ্যেই প্রতিবধ্য প্রতিবন্ধক ভাব বর্তমান থাকিতে পারে। ইহা রজত নহে, এই জ্ঞানটি যদি যথার্থই ইহা রজত এই জ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়, তাহা হইলে ইহা ব্যবহারিক রজত বিষয়ক বলিয়া প্রথম জ্ঞানটিও অবশ্যই ব্যবহারিক রজত বিষয়ক। আরও দেখ রজতত্ব-বিশিষ্ট নিষেধ জ্ঞানের বিষয় নহে, লৌকিক-পারমার্থিক-রজতত্ব-বিশিষ্ট-প্রাতিভাসিক রজতই এই জ্ঞানের বিষয় এইরূপ কথা বলিলে ব্যধিকরণ ধর্মাবচ্ছিন্নাভাবের কথা বলিতে হয়, এবং এইরূপ কোনও অভাব হয় না। কথাটিকে একটু খুলিয়া বলিতে হয়। অনেক দর্শনাচার্য ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্নাভাব বলিয়া এক প্রকার অভাব স্বীকার করেন। কিন্তু ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্নাভাব কি?

নিষেধ লৌকিক রজত বিষয়ক বলিয়া প্রতীক রজতও লৌকিক। নচেৎ বাধ হইতে পারে না।

না যে ধর্মের অধিকরণ যে ধর্মী নহে, সেই ধর্ম-বিশিষ্টরূপে সেই ধর্মীর অভাব। যেমন ঘটত্ব বিশিষ্টরূপে পটের অভাব বা পটত্ব বিশিষ্টরূপে ঘটের অভাব। আমরা যখন ঘটত্ব বিশিষ্টরূপে ঘটের অভাব বলি তখন এইরূপ অভাবের কথা বলি না। ঘটত্বরূপ ধর্মের অধিকরণ ঘট। ইহা ঘটত্বের অনধিকরণ নহে, বা ঘটত্বাভাবের অধিকরণ নহে। অতএব যখন ঘটের অভাব বলিতে ঘটত্ব বিশিষ্টরূপে ঘটের অভাব বুঝা হয় তখন এইরূপ অভাব বুঝা হয় না এবং ঐরূপ অভাব বুদ্ধিই আমাদের হইয়া থাকে। ভূতলে ঘট নাই, গৃহে পট নাই, গগনে রূপ নাই, অগ্নির গন্ধ নাই ইত্যাদি যখন বলি তখন ঘটত্ব-বিশিষ্ট রূপে ঘট, পটত্ব-বিশিষ্টরূপে পট, রূপত্ব-বিশিষ্টরূপে রূপ, গন্ধত্ব-বিশিষ্টরূপে গন্ধ প্রভৃতি যে নাই তাহাই বলি। এইরূপ অভাবই স্বীকৃত। কিন্তু ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্নাভাব স্বীকৃত নহে। ঘটত্ব বিশিষ্টরূপে পট নাই, এই কথার কোনও মূল্য নাই। যে ধর্মী যে ধর্মের অধিকরণ নহে, সেই ধর্ম বিশিষ্টরূপে সেই ধর্মীর অভাবের কথা অর্থহীন। অভাবীয় প্রতিযোগীর যাহা ধর্ম নহে তাহা অভাবীয় প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হইবে কেমন করিয়া? অর্থাৎ আমাদের কোনও অভাবের কথা বলিতে হইলে দুইটি অবচ্ছেদকের বা ঠিক্ ঠিক্ বুঝাইয়া দেয় এইরূপ দুইটি পদার্থের কথা বলিতে হয়। যেমন আমি যখন বলি যে ভূতলে ঘট নাই, তখন আমাকে প্রথমতঃ ঘটত্বরূপ অবচ্ছেদকের কথা বলিতে হয়। কারণ, ঘট নাই এই অভাবের প্রতিযোগী ঘট, কিন্তু দ্রব্য নাই এই অভাবের

ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্নাভাব হয় না। কারণ, প্রতিযোগীতে অবৃত্তি ধর্ম প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইতে পারে না।

অভাবের কথা বলিতে হইলেই অবচ্ছেদক ধর্ম ও সম্বন্ধের কথা বলিতে হয়।

প্রতিযোগী দ্রব্য। ঘট নাই বলিলে আমরা বুঝি কোন ঘটই নাই। এইরূপ দ্রব্য নাই বলিলে আমরা বুঝি কোন দ্রব্যই নাই। এখন ঘটও একটি দ্রব্য। অতএব দ্রব্য নাই বলিলে আমরা ঘটও যে নাই তাহা বুঝিতে পারি। দ্রব্য নাই এই অভাবের প্রতিযোগিতা ঘটেও রহিয়াছে। সুতরাং ঘটগত প্রতিযোগিতার নিরূপক অভাব বলিতে যেমন ঘট নাই এই অভাবটি পাওয়া যায়, সেইরূপ দ্রব্য নাই এই অভাবটিও লাভ করা যাইতে পারে। কিন্তু এই লাভ আসলে লোকসানই, কারণ ভূতলে যখন ঘট থাকে না, কিন্তু পট থাকে, তখন আমরা দ্রব্য নাই ইহা বলিতে পারি না কিন্তু ঘট যে নাই তাহা বলিতে পারি। অতএব ঘটনিষ্ঠ প্রতিযোগিতার নিরূপক অভাব বলিতে যে দুইটি অভাব লাভ হয়, তাহাদের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তাহা দেখাইতে হয়। কিন্তু ইহা দেখাইব কেমন করিয়া? অভাবীয় প্রতিযোগিতায় যদি বৈলক্ষণ্য না থাকে, তাহা হইলে অভাবে বৈলক্ষণ্য আসিবে কেমন করিয়া? অতএব আমাদের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক ধর্ম স্বীকার করিতে হয়। আমাদের বলিতে হয় যে অবচ্ছেদক ভেদে প্রতিযোগিতা ভিন্ন হয়, এবং সেইজন্য অভাবও ভিন্ন হইয়া যায়। ঘটত্বের দ্বারা অবচ্ছিন্ন ঘটনিষ্ঠ প্রতিযোগিতা, দ্রব্যত্বের দ্বারা অবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা হইতে ভিন্ন, এবং সেইজন্যই ঘট নাই, দ্রব্য নাই এই অভাব হইতে ভিন্ন। আমরা যখন ভূতলে পট বর্তমান থাকিলেও ঘট নাই বলি, তখন ঘটত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার নিরূপক যে অভাব, সেই অভাবেরই কথা বলি, দ্রব্যত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার নিরূপক অভাবের কথা বলি না। সংক্ষেপে এইরূপ স্থলে আমরা ঘটত্ব বিশিষ্টরূপে বা ঘটরূপে ঘট যে নাই তাহাই বলি। ঘটত্বই হইল ঘট নাই, এই অভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক। এইরূপ অবচ্ছেদকের, ধর্মবিধায় অবচ্ছেদকের, কথা আমাদের অভাবের কথা বলিতে হইলেই বলিতে হয়। সকল সময় আমরা ইহার প্রকাশ্য উল্লেখ করি না বটে, কিন্তু আমাদের বক্তব্যের মধ্যে ইহা সকল সময়ই নিহিত থাকে। তাহা যদি না থাকিত তাহা হইলে আমরা 'আছে' বলিয়াও 'নাই' বলিতে পারিতাম এবং 'নাই' বলিয়াও 'আছে' বলিতে পারিতাম। কিন্তু এইরূপ কাণ্ড আমরা কেহই করিতে পারি না। আমরা যদি বলি যে ভূতলে ঘট আছে, তাহা হইলে আর সেই সময়ে সেই ভূতলে যে ঘট নাই তাহা বলিতে পারি না। বস্তুতঃ আছে ও নাই এর মধ্যে বা ভাব এবং অভাবের মধ্যে প্রতিবধ্য প্রতিবন্ধক ভাব রহিয়াছে। একটির নিশ্চয় অপরটির নিশ্চয়কে বাধা দেয়, 'হ্রদে বহ্নি নাই', এই নিশ্চয়কালে হ্রদে যে বহ্নি রহিয়াছে এই নিশ্চয় হইতে পারে না। ইহা রজত নহে এই বুদ্ধি হইলে আর ইহা রজত এই বুদ্ধি হইতে পারে না। এখন, এইরূপ প্রতিবধ্য প্রতিবন্ধক ভাব থাকার অনুরোধে আমাদের অভাবের

জ্ঞানকালে অবচ্ছেদক ধর্মের অনুসরণ করিতে হয়। হ্রদে বহ্নি নাই বলিতে যদি বহ্নিত্বাবচ্ছিন্ন বহ্নি না বুঝি, তাহা হইলে তথায় মীন শৈবালাদি দ্রব্য পদার্থ আছে বলিয়া এবং দ্রব্য নাই বলিতে পারি না বলিয়া, হ্রদে যে বহ্নি নাই তাহাও বলিতে পারি না। অতএব অভাবের কথা বলিতে হইলেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক ধর্মের কথা বলিতে হয়।

শুধু তাহাই নহে। প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধের কথাও বলিতে হয়। মনে করা যাউক যে ভূতলে ঘট রহিয়াছে। কিন্তু কি সম্বন্ধে রহিয়াছে? অবশ্যই সংযোগ সম্বন্ধে রহিয়াছে। অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধে নাই। সমবায় সম্বন্ধে ঘটটি তাহার অবয়ব কপালে রহিয়াছে এবং ভূতলে নাই। অতএব ভূতলে যে কালে ঘট সংযোগ সম্বন্ধে রহিয়াছে সেইকালেই এক অর্থে ঘটের অভাবও তথায় রহিয়াছে। এখন, আমি যদি এই অভাবটিকে ধরিতে চাহি তাহা হইলে আমাকে বলিতে হইবে সমবায় সম্বন্ধে ঘট নাই। অর্থাৎ যে অভাবের কথা বলিতেছি, তাহার নিরূপক প্রতিযোগিতা সমবায় সম্বন্ধের দ্বারা অবচ্ছিন্ন। অতএব অভাবের কথা বলিতে হইলে সম্বন্ধ বিধায় অবচ্ছেদকের বা অবচ্ছেদক সম্বন্ধের কথা বলিতে হয়। বস্তুতঃ ইহা না বলিলে চলে না। আমাদের লৌকিক কথাবার্তায় আমরা ইহা উহ্য রাখিতে পারি। কিন্তু দার্শনিক বিচারকালে আমাদের ইহা বলিতেই হয়। হ্রদে বহ্নি নাই, ইহা আমরা বলিয়া থাকি—এবং এইটুকু কথাতেই আমাদের লৌকিক কাজকর্ম মিটিয়া যাইতে পারে। কিন্তু এই উক্তিতে সম্বন্ধের কথা খোলাখুলিভাবে না বলিলেও বলা আছে। সংযোগ সম্বন্ধেই বহ্নি যে হ্রদে নাই ইহাই আমরা এখানে বলিয়াছি। দার্শনিক বিচারকালে এই সম্বন্ধের কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতে হয়। কারণ, তখন দেখিতে পাওয়া যায় যে সংযোগ সম্বন্ধে বহ্নি হ্রদে না থাকিলেও অন্য সম্বন্ধে থাকে বা থাকিতে পারে। যেমন হ্রদে বহ্নি নাই, এই কথা বলিবার কালে হ্রদের তীরবর্তী অঞ্চলে যে সকল বহ্নিব্যক্তি উৎপন্ন হইতেছে, তাহারা যে কালিক সম্বন্ধে হ্রদেও রহিয়াছে তাহা বলা যায়। অতএব বহ্নি নাই এই অভাবটি বলিবার সময় আমাদের কেবল ধর্ম বিধায় অবচ্ছেদকের কথা বলিলেই চলে না, সম্বন্ধ বিধায় অবচ্ছেদকের কথাও বলিতে হয়। শুধু তাহাই নহে। ধর্ম বিধায় যাহা অবচ্ছেদক, তাহার অবচ্ছেদকতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধেও বুঝিয়া লইতে হয়। যেমন ঘট নাই, এই অভাবের প্রতি-যোগিতার অবচ্ছেদক ধর্ম ঘটত্ব। কিন্তু ঘটত্ব কি সম্বন্ধে প্রতিযোগিতাকে অবচ্ছিন্ন করিয়া থাকে? অবশ্যই সমবায় সম্বন্ধে। অতএব এই স্থলে প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ সমবায়। তাহা হইলে, ঘট নাই,

এবং অবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক সম্বন্ধও বুঝিয়া লইতে হয়।

এই অভাবটির অর্থ হইল সেই অভাবটি যাহার প্রতিযোগিতা সংযোগ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন এবং সমবায় সম্বন্ধে ঘটত্বাবচ্ছিন্ন।

এখন, ব্যধিকরণ ধর্মাবচ্ছিন্নাভাবে হয় না। কারণ অভাবীয় প্রতিযোগীর যাহা ধর্ম নহে তাহা প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হইতে পারে না। ঘটাভাবের প্রতিযোগী ঘট এবং এই অভাবীয় প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক ধর্ম ঘটত্ব। ঘটত্ব প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হইয়াছে, কারণ ইহা প্রতিযোগী ঘটের ধর্মও বটে। প্রতিযোগীর ধর্মও হইবে না অথচ প্রতিযোগিতাকে অবচ্ছিন্ন করিবে, তাহা হইবে না। কারণ অভাবের প্রত্যক্ষ প্রতিযোগীর জ্ঞান বা প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক বিশিষ্টের জ্ঞান থাকিলেই হইতে পারে। আমি ঘট নাই ইহা জানিব অথচ ঘট কাহাকে বলে তাহা জানিব না, তাহা হইতেই পারে না। এবং ঘট কাহাকে বলে তাহা জানিতে যাইলেই ঘটত্বকেও জানিতে হইবে। প্রতিযোগীর জ্ঞান হইলেই প্রতিযোগীর বিশেষণরূপে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্মও জ্ঞানে ভাসমান হইবে। প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক বিশিষ্টের জ্ঞান অভাব প্রত্যক্ষে হেতু। এইজন্যই অভাবের কোন নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। এখন প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক বিশিষ্টের জ্ঞান যদি অভাব প্রত্যক্ষে হেতু হয়, তাহা হইলে ব্যধিকরণ ধর্মাবচ্ছিন্নাভাব হইতে পারে না। কারণ অভাববোধ একটি বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্যবোধ। অভাব প্রত্যক্ষস্থলে প্রতিযোগী অভাবাংশে বিশেষণ হয় এবং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম প্রতিযোগীরূপ বিশেষণের বিশেষণরূপে ভাসিতে থাকে। ঘটাভাবের প্রত্যক্ষস্থলে ঘট অভাবাংশে বিশেষণ হয় এবং ঘটত্ব হয় ঘটের বিশেষণ। শুধু তাহাই নহে, ঘটত্বকে ঘটের বিশেষণ না করিয়া বা তাহার প্রতিযোগী-বৃত্তিত্বকে বিষয় না করিয়া ঘটাভাবের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। অতএব, প্রতিযোগিতা বা বিশেষণতার অবচ্ছেদক বিশিষ্টের জ্ঞান অভাববোধ নামক বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্যবোধে হেতু এবং সেইজন্যই ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্নাভাব হইতে পারে না।

অভাব বোধ বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্য বোধ; বিশেষণতাবচ্ছেদক বিশিষ্টের বোধ ইহাতে হেতু। অতএব, ব্যধিকরণ ধর্মাবচ্ছিন্নাভাব হয় না।

ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্নাভাব কাহাকে বলে এবং কেন যে হইতে পারে না, তাহা আমরা দেখিলাম। এখন দেখা যাউক যে অনির্বচনীয় খ্যাতিবাদে যদি বলা হয় যে লৌকিক রজতই নিষেধ জ্ঞানের বিষয় তাহা হইলে কেন এইরূপ অভাব অঙ্গীকার করিতে হয়। বিবর্ত্তবাদ অনুযায়ী শুক্তিতে রজত জ্ঞান কালে অজ্ঞান হইতে রজত উৎপন্ন হয়। অতএব তাহার ত্রৈকালিক নিষেধ কেমন করিয়া সম্ভব? এই প্রশ্নের উত্তরে যদি বলা হয়, যে প্রাতিভাসিক রজত নহে

অনির্বচনীয় খ্যাতিবাদ মানিতে হইলে ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্নাভাবও মানিতে হয়।

লৌকিক রজতই নিষেধ জ্ঞানের বিষয়, তাহা হইলে অবশ্যই ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্নাভাব স্বীকার করিতে হইবে। কারণ এইরূপ বলার অর্থ হইল এই ইহা রজত নহে, এইরূপ কথা যখন বলা হয়, তখন কোন রজত বা রজতত্বাবচ্ছিন্ন যে নাই বা রজতত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার নিরূপক যে অভাব সেই অভাব যে আছে তাহা বলা হয় না। এইরূপ লৌকিক রজত যে নাই তাহাও ঠিক বলা হয় না। কারণ, সহসা লৌকিক রজতকে নিষেধ করিতে যাইব কেন? অতএব বলিতে হয় যে লৌকিক রজতত্বাবচ্ছিন্ন যে প্রাতিভাসিক রজত তাহা নাই। এখন, লৌকিক রজতত্ব প্রাতিভাসিক রজতে আশ্রিত ধর্ম নহে। প্রাতিভাসিক রজত প্রকৃতপক্ষে প্রাতিভাসিক রজতত্বের অধিকরণ এবং লৌকিকরজতত্বের অনধিকরণ। সুতরাং অনির্বচনীয়খ্যাতিবাদ স্বীকার করিলে ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্নাভাবও স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু ঐরূপ কোনও অভাব হইতেই পারে না। অতএব অনির্বচনীয় খ্যাতিবাদ গ্রহণ করা যায় না। লৌকিক রজতত্ব বিশিষ্ট প্রাতিভাসিক রজতের কথা অর্থহীন।

প্রাতিভাসিক রজতে ব্যবহারিক রজতত্বের স্বাভাবিক সম্বন্ধে প্রসক্তি থাকিতে পারে না।

এখন তুমি যে বলিবে যে প্রাতিভাসিক রজতপ্রতীতিকে ব্যবহারিক রজতপ্রতীতি বলিয়া মনে হয় বলিয়া ব্যবহারিক রজতত্বের প্রাতিভাসিক রজতে প্রসক্তি আছে এবং সেইজন্যই ব্যবহারিক রজতত্ববিশিষ্ট প্রাতিভাসিক রজতের কথা অর্থহীন নহে, তাহা হইবে না। কারণপ্রাতিভাসিক রজতে ব্যবহারিক রজতত্বের প্রসক্তি আছে এই কথাটির অর্থ কি? প্রাতিভাসিক রজত ব্যবহারিক রজতত্বের আশ্রয় ইহা কি তুমি বলিতে পার? অবশ্যই পার না। কারণ তাহা হইলে প্রাতিভাসিক ও ব্যবহারিক এই দুই প্রকার রজত তুমি স্বীকার করিতে পার না। প্রাতিভাসিক রজত যদি ব্যবহারিক রজতত্বের আশ্রয় হয় তাহা হইলে তাহা ব্যবহারিক রজতই হইয়া যাইবে এবং মায়াময় বা অলৌকিক হইবে না। এখন তুমি যে বলিবে যে স্বাভাবিক সম্বন্ধে প্রাতিভাসিক রজত ব্যবহারিক রজতত্বের আশ্রয় নহে বলিয়া এইরূপ আপত্তি হইতে পারে না, তাহা হইবে না। অর্থাৎ ঘট স্বাভাবিক বা সমবায় সম্বন্ধে ঘটত্বের আশ্রয়, এবং এইজন্যই ইহাকে ঘট বলা হয়। কিন্তু অস্বাভাবিক সম্বন্ধে, যেমন একজ্ঞান বিষয়ভাব সম্বন্ধে পট অপট না হইয়াও ঘটত্বের আশ্রয় হইতে পারে। সেইরূপ স্বাভাবিক সম্বন্ধে ব্যবহারিক রজতই ব্যবহারিক রজতত্বের আশ্রয় হইতে পারে, কিন্তু কোনও অস্বাভাবিক সম্বন্ধে প্রাতিভাসিক রজতও ব্যবহারিক রজত না হইয়াই ইহার আশ্রয় হইতে

অস্বাভাবিক সম্বন্ধে এই প্রসক্তি থাকিতে পারে; কিন্তু প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ স্বাভাবিক সম্বন্ধ হয় বলিয়া ব্যবহারিক রজতত্ব-বিশিষ্ট প্রাতিভাসিক রজতত্বের অভাব হয় না।

পারে। অতএব প্রাতিভাসিক রজতে ব্যবহারিক রজতত্বের প্রসক্তি আছে ইহা বলিলে দুই প্রকার রজতের পার্থক্যের অপলাপ করিতে হয় না এবং ব্যবহারিক রজতত্ব বিশিষ্ট প্রাতিভাসিক রজতের অভাব যে অর্থহীন নহে, তাহা বলা যায়। এইরূপ কথা যে তুমি বলিবে তাহা হইবে না। কারণ কোনও অস্বাভাবিক সম্বন্ধে কোনও ধর্মের ধর্মীর সেই ধর্মবিশিষ্ট ধর্মী হিসাবে অভাবীয় প্রতিযোগী হওয়া সম্ভব নহে। যেমন কোনও অস্বাভাবিক সম্বন্ধে পট ঘটত্বরূপ ধর্মের ধর্মী হইতে পারে। তথাপি পটাভাবের নিরূপক প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক ধর্ম সমবায় সম্বন্ধে পটত্বই হইবে। অভাবীয় প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ স্বাভাবিক সম্বন্ধই হয়, অন্য কোন সম্বন্ধ হয় না। অতএব প্রতীত হয় প্রাতিভাসিক রজত এবং নিষিদ্ধ হয় ব্যবহারিক রজত এই কথার কোন মূল্য নাই।

প্রাতিভাসিক রজতে ব্যবহারিক রজতের ব্যবহার আছে বলিয়া যে এই প্রসক্তি আছে বলিব তাহা হইবে না। কারণ, এই ব্যবহার রহিয়াছে মিথ্যা জ্ঞানের বিষয়রূপ শুক্তিতে।

এখন তুমি যে বলিবে যে প্রাতিভাসিক রজতকে যেহেতু ব্যবহারিক রজত বলিয়া মনে করা হয় বা প্রাতিভাসিক রজত যেহেতু ব্যবহারিক রজত যেরূপ প্রবৃত্তি উৎপাদন করে সেইরূপ প্রবৃত্তিই উৎপাদন করিয়া থাকে সেইহেতু প্রাতিভাসিক রজত প্রতীত হইলেও ব্যবহারিক রজতই নিষেধ জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে, তাহা হইবে না। কারণ শুক্তিতে রজতজ্ঞানকালে আমরা কি প্রাতিভাসিক রজতকে ব্যবহারিক রজত বলিয়া মনে করি, না শুক্তিকেই ব্যবহারিক রজত বলিয়া মনে করি? এই প্রশ্নের উত্তর অতি সহজ। বিবর্তবাদীগণ প্রাতিভাসিক রজত উৎপন্ন হয় ইহা মনে করেন বলিয়াই সহজ উত্তরটি দেখিতে পান না। অর্থাৎ শুক্তিতে আমাদের ব্যবহারিক রজতেরই বোধ হয়। মাঝখান হইতে প্রাতিভাসিক রজত বলিয়া এক প্রকার রজতকে যে কেন হাজির করা হয় তাহা বুঝিতে পারা যায় না। ঐরূপ একপ্রকার রজতের কল্পনা করার জন্যই বিবর্তবাদের যত গোলযোগ। প্রকৃতপক্ষে নিষেধ জ্ঞানের বিষয় যেহেতু লৌকিক রজত, মিথ্যা জ্ঞানের বিষয়ও সেইরূপ লৌকিক রজত। মিথ্যা জ্ঞানের বিষয় যে মিথ্যা এই কথা নিষ্প্রমাণ। মিথ্যা জ্ঞান মিথ্যা কিন্তু তাহার বিষয় মিথ্যা নহে। ইহা প্রকৃতপক্ষে দেশান্তরীয়, কালান্তরীয় বাস্তব পদার্থই।

জ্ঞানলক্ষণা সন্নিকর্ষ রহস্য।

কিন্তু দেশান্তরীয় কালান্তরীয় পদার্থের প্রত্যক্ষ হইবে কেমন করিয়া? যাহা এখানে এখন উপস্থিত থাকে, তাহাই আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। তুমি আমার সম্মুখে উপবিষ্ট রহিয়াছ, তোমায় দেখিতেছি। চায়ের পেয়ালাখানি সামনে রহিয়াছে গন্ধ পাইতেছি। তুমি

আমাকে চিমৃটি কাটিলে প্রত্যক্ষ করিলাম। যাহা দেশান্তরে কালান্তরে থাকে না, এখানে এখন থাকে তাহাই যে প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়া থাকে ইহাই দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব দেশান্তরীয় কালান্তরীয় পদার্থ যে কি করিয়া অনুভূত হয়, প্রত্যক্ষের বিষয় হয় তাহা বুঝিতে পারা যায় না। এইরূপ কথা তুমি বলিতে পার। কিন্তু ন্যায়াচার্যগণ এইরূপ কথা তোমায় বলিতে দিবেন না। তাঁহারা বলিবেন যে দেশান্তরীয় কালান্তরীয় পদার্থও প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে। তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ কেমন করিয়া? বলিতেছি। শুক্তিতে যখন তোমার রজত জ্ঞান হয় তখনই তোমার প্রথম রজত জ্ঞান হয় না। তাহা পূর্বেও অবশ্যই তোমার রজতজ্ঞান হইয়া থাকে। এখন, এই যে তোমার পূর্বেকার রজতজ্ঞান তাহা অবশ্যই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন আর ইহা নাই। কিন্তু তথাপি ইহা সমূলে নষ্ট হয় নাই। তাহার চিহ্ন থাকিয়া গিয়াছে। সংস্কার উৎপন্ন করিয়া আত্মাকে লাঞ্ছিত করিয়া গিয়াছে। এই সংস্কার মাঝে মাঝে উদ্বুদ্ধ হইতে পারে, এমন কি হইয়াও থাকে। তোমার মনে পড়ে যে তুমি রজত দেখিয়াছিলে। কিন্তু তোমার এই মনে পড়া অর্থাৎ রজত স্মৃতি কিরূপ পদার্থ? সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়া কি কোন মানস প্রতিমা নির্মাণ করে? এবং ঐ মানস প্রতিমা কি নীরবে অঙ্গুলি তুলিয়া তোমার পূর্বানুভূত রজতকে নির্দেশ করে? অবশ্যই নহে। রজতকে যখন তুমি দেখিয়াছিলে তখনও যেমন সোজাসুজি দেখিয়াছিলে রজতকে যখন তুমি স্মরণ কর তখনও তেমনই সোজাসুজিই জানিয়া থাক; তাহা হইলে স্মৃতিরূপ জ্ঞানটির স্বভাব কিরূপ? একটু বিবেচনা করিলেই দেখিতে পাইবে যে এই জ্ঞানটি যেন জন্মগ্রহণ করিয়াই তাহার বিষয়ের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে। প্রত্যক্ষের সহিত তুলনা করিয়া ব্যাপারটিকে বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। ইন্দ্রিয়ের সহিত অর্থের সন্নিকর্ষ হয় এবং প্রত্যক্ষটি অর্থকে বিষয় করিয়া উৎপন্ন হয়। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধের জন্য জ্ঞানের স্বরূপের অতিরিক্ত কোনও সম্বন্ধের যদিও প্রয়োজন নাই, তথাপি জ্ঞান উৎপন্ন হইবার পূর্বে ইন্দ্রিয় প্রভৃতির সহিত বিষয়ের কোন সম্বন্ধ আবশ্যক। এই সম্বন্ধ যেন জ্ঞানকে ঘটাইয়া থাকে। এখানে জ্ঞান যেন লাজুক বধূটির মত, বিষয় আসিয়া তাহাকে জাগায়। কিন্তু স্মৃতির ক্ষেত্রে কি হয়? এখানে ইন্দ্রিয়ের সহিত বা কোন কিছুরই সহিত অর্থের সন্নিকর্ষ থাকে না। সংস্কার কোনরূপে উদ্বুদ্ধ হইয়া যায় এবং এমন এক জ্ঞানকে জন্ম দেয়, যাহা জন্মিবার সঙ্গে সঙ্গেই অহীরাবণের মত তাহার বিষয়কে আক্রমণ করিয়া বসে। এখন আর জ্ঞান লাজুক বধূ নহে—শৃঙ্গার নিপুণা নায়িকা। জ্ঞানটি নিজেই তাহার বিষয়ের সহিত সন্নিকৃষ্ট হয় বা নিজেই সন্নিকর্ষ। সংস্কার জন্য স্মৃতির স্বভাব দেখিলাম। এখন দেখি সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইলেই স্মৃতি হয় কি না।

স্মরণের স্বরূপ।

সংস্কারগুলি অকারণে উদ্বুদ্ধ হয় না ; কোন কিছু তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করে বা খোঁচা দেয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই উত্তেজক পরম্পরায় ইন্দ্রিয়ের সহিত অর্থের সন্নিকর্ষ। যেমন, আমার সম্মুখে শুক্তিটি রহিয়াছে, তাহার সহিত আমার নয়নের মিলন হইল। এই মিলনের ফলে আমার একটি নির্বিকল্প জ্ঞান বা শুক্তি শুক্তিত্ব প্রভৃতির একটি অ-বিশিষ্টবোধ হইল। এই বোধে শুক্তি ইদং রূপে ভাসিতেছে, শুক্তিত্বও রহিয়াছে, চাকচিক্যও রহিয়াছে এবং আরও অনেক কিছুই রহিয়াছে। কিন্তু তাহারা আল্‌গা আল্‌গা ভাবে রহিয়াছে। একটি অপরটি বিশিষ্ট হইয়া নাই। এই নির্বিকল্প জ্ঞান সকল জ্ঞানের মতই ক্ষণিক। ইহার নাশ হয়। কিন্তু শুক্তি বা এইজ্ঞানে ভাসমান পদার্থের পূর্বানুভব জন্য সংস্কারকে উত্তেজিত করিয়া ইহা নষ্ট হয়। তাই ইহার নাশের অব্যবহিত উত্তর ক্ষণে এমন একটি জ্ঞান জন্মে যাহাতে নির্বিকল্প বোধে আল্‌গা আল্‌গা ভাবে ভাসমান বিষয়গুলি শক্তভাবে বাঁধা পড়িয়া যায় বা আমি জানি যে ইহা একটি চাকচিক্য বিশিষ্ট শুক্তি। এই জ্ঞানটি সবিকল্প জ্ঞান। অতএব, সবিকল্প প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রেও পূর্বানুভব জন্য সংস্কার কাজ করে। কিন্তু তথাপি ইহা স্মৃতি নহে। কারণ, এই স্থলে সংস্কার ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষের অধীন হইয়া সচিবরূপে কার্য করে স্বতন্ত্রভাবে কার্য করে না। এখন, পূর্বানুভব জন্য সংস্কার যদি স্বতন্ত্রভাবে কার্য করিত, যদি পরম্পরায় উত্তেজক ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষের অধীন হইয়া কাজ না করিত তাহা হইলে স্মৃতি হইত, প্রত্যক্ষ হইত না। সংক্ষেপে পূর্বানুভূত সংস্কার যদি ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষের অধীন হইয়া সচিবরূপে কার্য করে, তাহা হইলে প্রত্যক্ষ অর্থাৎ সবিকল্প প্রত্যক্ষ হয়। কিন্তু ইহা যদি স্বাধীনভাবে, নরপতিরূপে কার্য করে তাহা হইলে স্মৃতি হয়। এখন, সচিব দুষ্ট হইতে পারে আবার সাধু সদ্‌গুণবানও হইতে পারে। নরপতি যখন নিজে অমনোযোগী হন, যখন তাঁহার নিজেরই বহু দোষ থাকে তখনই সচিব দুষ্ট হইয়া যায় এবং যে ব্যক্তি যেরূপ নহে সেই ব্যক্তিকে সেইরূপ বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু নরপতি যদি দক্ষ হন তাহা হইলে সচিব দুষ্ট হইতে পারে না, গুণবানই হয়। এইরূপ আমি অর্থাৎ প্রত্যক্ষের কর্তা যদি দোষযুক্ত হই অর্থাৎ আমার ইন্দ্রিয়গুলি যদি অসুস্থ বা অপটু হয়, উত্তম আলোক প্রভৃতির ব্যবস্থা যদি না থাকে এবং আমার অন্তরে যদি লোভ প্রভৃতি থাকিয়া যায় তাহা হইলে সচিবরূপে সংস্কারগুলি দুষ্ট প্রত্যক্ষ বা ভ্রান্ত প্রত্যক্ষই জন্মাইয়া দিবে। আমি যাহা যাহা নহে তাহাকে তাহাই বলিয়া বুঝিব। যেমন শুক্তির নির্বিকল্প জ্ঞানে অবশিষ্টরূপে ভাসমান চাকচিক্য দোষবলে রজতের পূর্বানুভব জন্য সংস্কারকে জাগাইয়া দিবে (অর্থাৎ শুক্তির

সংস্কার উদ্বোধ জন্য জ্ঞানের স্বভাব। অবিকল্প, ভ্রম প্রত্যক্ষ এবং স্মৃতি।

পূর্বানুভব জন্য সংস্কার জাগিবে না) এবং তাহার ফলে নির্বিকল্প জ্ঞানটি বিনষ্ট হওয়ার ঠিক পরক্ষণেই পূর্বানুভূত রজতত্ববিশিষ্ট রূপেই আমি ইদং বা শুক্তিকে দেখিব। এই জ্ঞানটিও প্রত্যক্ষ। কারণ, এখানেও সংস্কার ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষের সচিবরূপে, যদিও দুষ্ট সচিবরূপে, কার্য করিতেছে। অতএব দেশান্তরীয় কালান্তরীয় পদার্থের যে প্রত্যক্ষ হইতে পারে না তাহা তুমি বলিতে পার না। লৌকিক সন্নিকর্ষ তাহার সহিত না থাকিতে পারে, কিন্তু সংস্কার উদ্বোধ জন্য জ্ঞান জন্য বা স্মৃতি-আত্মক অলৌকিক সন্নিকর্ষ থাকে। এইরূপ সন্নিকর্ষ স্বীকার করিলে অনুমানের উচ্ছেদ হয় না। কারণ, অনুমিতি স্থলে কি হয় ? পর্বতে ধূম দেখিয়া বহ্নির অনুমিতি কখন হয় ? না, যখন তুমি রান্নাঘরে প্রথমে ধূম ও বহ্নির সামানাধিকরণ্য দেখিয়া ধূম যে বহ্নির ব্যাপ্য ইহা বুঝিয়াছ, তাহার পর পর্বতের শিখরদেশে অবিচ্ছিন্নমূল ধূমরেখা দেখিয়াছ, তাহার পর ধূম যে বহ্নির ব্যাপ্য ইহা স্মরণ করিয়াছ এবং তাহার পর পর্বত যে বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান্ ইহা বুঝিয়াছ তখনই তোমার পর্বতে ধূম দেখিবার পর বহ্নির অনুমিতি হয়। স্মৃত্যাত্মক সন্নিকর্ষ ইহার কোনটিকে বাধা দিবে যে তোমার বহ্নির অনুমিতি হইবে না ? তুমি যে বলিবে যে পর্বতে ধূম দেখিয়া আমার বহ্নি-স্মরণ বা ব্যাপ্তি-স্মরণ হইয়া গেল, এবং অনুমিতি হইবার অবকাশ রহিল না তাহা হইবে না। কারণ বহ্নির জ্ঞান তোমার হইল বটে, কিন্তু পর্বতে যে বহ্নি আছে তাহা তুমি জানিলে কি ? তুমি স্মরণ করিলে যে ধূম বহ্নিব্যাপ্য কিন্তু পর্বত বহ্নি-বিশিষ্ট ইহা তুমি জানিলে কি ? বহ্নির জ্ঞান হইলেই চলিবে, কারণ বহ্নিই সাধ্য ইত্যাদি কথা যে বলিবে তাহা হইবে না। কারণ পর্বত বহ্নিমান এই অনুমিতি স্থলে এই অনুমিতির বিধেয় বা এই জ্ঞানের প্রকাররূপে ভাসমান বহ্নিই তোমার সাধ্য, এবং বিধেয়তা উদ্দেশ্যতা নিরূপিত বলিয়া, অর্থাৎ প্রকারতা বিশেষ্যতা নিরূপিত বলিয়া, যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি পর্বত বহ্নিমান্ বা পর্বতে যে বহ্নি রহিয়াছে, ইহা জানিতে পারিতেছ, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইতে পারে না। সুতরাং পর্বতে ধূম দেখিয়া তোমার ব্যাপ্তি স্মরণ বা বহ্নিজ্ঞান হইতে পারে এবং হইয়াও থাকে, কিন্তু এইখানেই তুমি থামিতে পার না। পর্বত বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ ইহা বুঝিয়া পর্বত যে বহ্নিমান্, ইহা জানিয়া থাক। অতএব, স্মৃতিরূপ সন্নিকর্ষ স্বীকার করিলে অনুমানের উচ্ছেদ হয় না। আরও দেখ, পর্বতে ধূম দেখিয়া তুমি বা আমি বা কেহই বহ্নিকে প্রত্যক্ষ করি না। সুতরাং এখানে বহ্নিস্মরণ কোনও অলৌকিক প্রত্যক্ষের সন্নিকর্ষরূপে যে কাজ করিতেছে না, তাহা নিশ্চিত। কিন্তু এখানে জ্ঞান অলৌকিক সন্নিকর্ষরূপে কাজ না করিলেও কোথাও যে করিবে না, তাহা বলিতে পারি না। যখন দেখা যায় যে প্রত্যক্ষ হইয়াছে অথচ জ্ঞানরূপ সন্নিকর্ষ স্বীকার না

করিলে ইহার কোনও উপপত্তি হইতেছে না, তখন এইরূপ সন্নিকর্ষ না মানিলে চলিবে কেন ? অবশ্য এইরূপ সন্নিকর্ষ যদি কেবল মিথ্যা জ্ঞানের ক্ষেত্রেই স্বীকার করিতে হইত তাহা হইলে মিথ্যাজ্ঞানের বিষয়কে মায়াময় বলিব না সন্নিকর্ষকে অলৌকিক বলিব, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য হইত। কিন্তু এইরূপ সন্নিকর্ষ কেবল মিথ্যাজ্ঞানের ক্ষেত্রেই স্বীকার করিতে হয় না। তুমি যখন চন্দনের সৌরভের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়া থাক, তখন তোমায় বাধ্য হইয়াই এইরূপ সন্নিকর্ষ স্বীকার করিতে হয়। জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষস্থলে কেবল জ্ঞানেরই প্রত্যক্ষ হয় না, প্রত্যক্ষের বিষয়রূপ জ্ঞানের বিষয়েরও ভান হইয়া থাকে। সুতরাং এইরূপ সন্নিকর্ষ স্বীকার করিতেই হয়। এই সন্নিকর্ষ অলৌকিক কিন্তু অপ্রসিদ্ধ নহে। অনুমিতিস্থলে ইহা অনুপস্থিত কারণ ধূমদর্শনের পর কাহারও বহ্নির প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু মিথ্যাজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইহাকে স্বীকার করিতে হয়। অতএব অলৌকিক সন্নিকর্ষ স্বীকার করিলে যে অনুমানের উচ্ছেদ হয় তাহা বলা যায় না। যাহাই হউক মিথ্যাজ্ঞানের বিষয় মিথ্যা বা মায়াময় নহে। অলৌকিক সন্নিকর্ষ বশে অনুভূত কালান্তরীয় দেশান্তরীয় বাস্তব পদার্থ।

অজ্ঞানের ভাবত্ব খণ্ডন। আত্মাতে জ্ঞানাভাবের বোধ হইতে পারে।

বিবর্তবাদিগণের প্রথম কথাটি যে ন্যায়াচার্যগণের সম্মত নহে, তাহা আমরা দেখিলাম। এইবার দ্বিতীয় কথাটি তাঁহাদের সম্মত হইতে পারে কিনা, তাহা বিচার করিয়া দেখা যাউক। বিবর্তবাদিগণ আত্মাকে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া মনে করেন এবং আমি অজ্ঞ ইত্যাদি অপরোক্ষ বোধ যে জ্ঞানাভাব বিষয়ক নহে, কিন্তু ভাবরূপ অজ্ঞান বিষয়ক, ইহা বলিয়া থাকেন। কিন্তু ন্যায়াচার্যগণের মতে আত্মা জ্ঞানস্বরূপ নহে, জ্ঞানাশ্রয় মাত্র। সুতরাং তাঁহাদের মনে বিবর্তবাদিগণের এই যুক্তিটি কোনই রেখাপাত করিতে পারে না। এখন, রামানুজ দর্শনেও আত্মাকে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করা হয় কিন্তু তথাপি অজ্ঞানকে ভাবরূপ বলিয়া

রামানুজ মত

মনে করা হয় না। সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে আত্মায় জ্ঞানাভাবের প্রতীতি হয় না, এই কথার বিশেষ মূল্য নাই। অর্থাৎ রামানুজ দর্শনে স্ফুট ও অস্ফুট ভেদে দ্বিবিধ আত্ম প্রতীতি স্বীকার করা হয়, এবং বলা হয় যে স্ফুট আত্মপ্রতীতিকালে আত্মায় জ্ঞানাভাবের প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু অস্ফুট আত্মপ্রতীতিকালে আত্মায় জ্ঞানাভাবের প্রত্যক্ষ হইতে কোন বাধা নাই। সংক্ষেপে রামানুজ মতে স্ফুট আত্মপ্রতীতি জ্ঞানাভাবের অর্থাৎ অজ্ঞানের নাশক কিন্তু অস্ফুট আত্মপ্রতীতি জ্ঞানাভাবের বিরোধী নহে। অতএব, আমি অজ্ঞ ইত্যাদি বোধকালে আত্মার অস্ফুট প্রতীতি থাকে এবং সেইজন্য আত্মাতে জ্ঞানাভাবের জ্ঞান হইতে পারে। তুমি যে বলিবে যে স্ফুট ও অস্ফুট আত্মপ্রতীতি আমি

স্বীকার করিব কেন, তাহা হইবে না। কারণ অদ্বৈতমতেও সাক্ষী জ্ঞান এবং বৃত্তি জ্ঞান বলিয়া দুই প্রকার জ্ঞান স্বীকার করা হয় এবং বলা হয় যে অজ্ঞান সাক্ষীজ্ঞান নাশ্য নহে, বৃত্তিজ্ঞান নাশ্য। অর্থাৎ অজ্ঞান যে জ্ঞাননাশ্য ইহা অদ্বৈতাচার্যগণও স্বীকার করেন; সুতরাং জ্ঞানময় আত্মাতে কি করিয়া অজ্ঞানের প্রতীতি হইতে পারে, তাহার উপপত্তির জন্য অজ্ঞান যে সাক্ষীজ্ঞান নাশ্য নহে কিন্তু বৃত্তিজ্ঞান নাশ্য, তাহা বলিয়া থাকেন। এখন, অদ্বৈতমতে যেমন বৃত্তিজ্ঞান এবং সাক্ষীজ্ঞান বলিয়া দুই প্রকার জ্ঞানের কথা বলা হয়, রামানুজমতেও সেইরূপ স্ফুট ও অস্ফুট ভেদে দ্বিবিধ আত্মপ্রতীতি স্বীকার করা হইয়া থাকে। অতএব আত্মাকে জ্ঞানস্বরূপ বলিলেই যে আমি অজ্ঞ ইত্যাদি বোধ স্থলে, আত্মায় যে জ্ঞানাভাবের বোধ হয় না ইহা বলিতে হইবে, তাহা নহে। বিশেষ করিয়া ন্যায়াচার্যগণের মতে আত্মা জ্ঞানস্বরূপ নহে। সুতরাং তাঁহাদের নিকট বিবর্তবাদিগণের এই যুক্তিটির কোন মূল্যই নাই।

এইরূপ বিবর্তবাদিগণ জ্ঞান স্বপ্রকাশ বলিয়া আত্মায় জ্ঞানাভাবের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না বলিয়া যে দ্বিতীয় যুক্তিটি দেন তাহারও কোন মূল্য ন্যায়াচার্যগণের নিকট নাই। কারণ, ন্যায়াচার্যগণের মতে জ্ঞান স্বপ্রকাশ নহে।

জ্ঞান স্বপ্রকাশ নহে এবং তমঃ অভাব পদার্থ

অন্ধকারে প্রথমোৎপন্ন প্রদীপ প্রভা যেমন ভাবরূপ অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া উৎপন্ন হয়, প্রমাজ্ঞানও সেইরূপ ভাবরূপ অজ্ঞানকে নাশ করিয়া হইয়া থাকে, বিবর্তবাদিগণের এই অনুমানটিরও কোন মূল্য ন্যায়াচাযগণ দিতে পারেন না। কারণ অন্ধকার তাঁহাদের মতে ভাব পদার্থ নহে, অভাব পদার্থ। অনেকে অন্ধকারকে দশম দ্রব্যরূপ ভাব পদার্থ বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের মতে অন্ধকারের রূপ আছে, সুতরাং ইহা একটি দ্রব্য পদার্থ এবং যেহেতু ইহার নীলরূপ আছে এবং গন্ধ নাই, সেই হেতু ইহা ন্যায়সম্মত নয় প্রকার দ্রব্যের অতিরিক্ত। এখন, এই কথা ন্যায়াচার্যগণ স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে অন্ধকারকে আলোকের অভাব বলিয়া বুঝিলেই কাজ মিটিয়া যায়। ইহার যে রূপের কথা বলা হয় তাহা ভ্রম বশতঃ। আকাশের যেমন কোন রূপ নাই, অথচ ইহাকে নীল বলা হয়, অন্ধকারেরও সেইরূপ কোন রূপ নাই অথচ ইহাকে নীল বলা হয়। প্রকৃত কথা এই যে অন্ধকারকে দ্রব্য পদার্থ বলিব কেমন করিয়া? ইহার উৎপত্তি ও ধ্বংস দেখা যায়। সুতরাং দ্রব্য বলিতে হইলে ইহাকে জন্য দ্রব্যই বলিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলে আবার ইহার অবয়বের প্রশ্ন উঠিবে এবং অন্ধকার পরমাণু যে আছে, তাহা বলিতে হইবে। এখন, অন্ধকার পরমাণু প্রসিদ্ধ নহে। অতএব অন্ধকারকে দ্রব্য পদার্থ বা ভাব পদার্থ বলা যায় না এবং সেইজন্য বিবর্তবাদিগণের অনুমানের দৃষ্টান্ত বিফল দৃষ্টান্ত।

সুষুপ্তি কালে আত্মতত্ত্বের স্ফুরণ না হওয়া প্রসঙ্গে অদ্বৈতাচার্যগণ যাহা বলেন, তাহাও ন্যায়াচার্যগণের নিকট অর্থহীন। কারণ, আত্মা যখন স্বপ্রকাশ জ্ঞানস্বরূপই নহে—তখন সুষুপ্তিকালে যে আত্মতত্ত্বের স্ফুরণ হইবে না, ইহা ত জানা কথা। অতএব ন্যায়াচার্যগণের মতে ভাবরূপ অজ্ঞান মানিবার কোন কারণ নাই এবং সেই-জন্যই এই জগৎ যে অজ্ঞান রূপ উপাদান জন্য, তাহাও বলিবার কোন হেতু নাই।

সুষুপ্তিতে আত্মতত্ত্বের স্ফুরণ হইতেই পারে না।

বস্তুতঃ প্রপঞ্চকে মিথ্যা বলিবার কারণ কি? বিবর্তবাদিগণ নিত্য ব্যতীত আর কিছুতেই সৎ বলিয়া মনে করেন না। এবং সেইজন্যই জগৎকে মায়াময় বলিয়া থাকেন। কিন্তু নিত্যসৎ ব্যতীত আর কিছুই যে সৎ নহে, তাহা বলিব কেন? অস্থির পদার্থগুলি যে কাল-ভেদে সত্তা ও অসত্তা নামক ধর্ম দুইটির ধর্মী হইতে পারে, ইহা আমরা পূর্বেই সৎকার্যবাদ বিচার প্রসঙ্গে দেখাইয়াছি। কার্য উৎপত্তির পূর্বে অসৎ এবং উৎপত্তির পরে সৎ, এইরূপ কথা বলিলে কোন অন্যায় কথা বলা হয় না। পুনরায়, আমরা হয়ত প্রপঞ্চের স্বরূপ নিরূপণ করিয়া না উঠিতে পারি, কিন্তু সেইজন্য প্রপঞ্চ অনির্বাচ্য হইয়া যাইবে কেন? আরও দেখ, কোনও কিছুর যথার্থ অনুভব হইলেই তাহার অযথার্থ অনুভব হইতে পারে। আমার যদি যথার্থ রজতবুদ্ধি না হয়, তাহা হইলে আমার অযথার্থ রজতবুদ্ধিও হইতে পারে না। অদ্বৈতাচার্যগণ অবশ্য ইহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে পূর্বে যদি কোন দিন রজতানুভব হইয়া থাকে, তাহা হইলেই বর্তমানে অযথার্থ রজতবুদ্ধি হইতে পারে—এই পূর্ব অনুভবকে যথার্থ হইতে হইবে এমন কোন কথা নাই। কিন্তু অদ্বৈতাচার্যগণের এই কথা স্বীকার করা যায় না। উপরন্তু, চিদ্রূপ ব্রহ্ম কি করিয়া তাহার অত্যন্ত বিসদৃশ জগতের অধিষ্ঠান হইবে? কোনও দোষের জন্য যখন কোনও ভ্রান্তি হয়, তখন অবশ্য অধিষ্ঠান ও অধ্যস্তের মধ্যে কোনও সাদৃশ্য না থাকিলেও চলে। কিন্তু ভাবরূপ অজ্ঞান নামক যে দোষের কথা বিবর্তবাদিগণ বলেন, তাহা বিচারসহ নহে। সুতরাং জগৎ কি করিয়া ব্রহ্মে অধ্যস্ত হইবে? প্রসন্নমনে বিবর্তবাদ গ্রহণ করা যায় না। এই জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত নহে।

বিবর্তবাদ প্রসঙ্গে আরও কিছু কথা।

আকর গ্রন্থপঞ্জী

(ক) বিবর্তবাদ স্থাপন—(১) সর্বদর্শন সংগ্রহ, শাংকরদর্শন, দর্শনাঙ্কুর টীকা সহ।

(২) পঞ্চদশী— ২।৪৭-৫৩, ৬।৩৩-৩৭, ১২৫-৫২, রামকৃষ্ণ টীকা সহ।

(৩) খণ্ড-খণ্ডন খাদ্য—১৪০ কণ্ডিকা।

(৪) বিবরণ প্রমেয় সংগ্রহ, (বসুমতী সং) প্রথম খণ্ড—১২৪—১৫৬, ১৭৪—১৮০।

(৫) বেদান্ত পরিভাষা—প্রত্যক্ষ পরিচ্ছেদ, আশু-প্রবোধিনী ব্যাখ্যা সহ।

(৬) বেদান্তসার, সুবোধিনী, বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী সহ ৪৩-৫৪ পৃঃ (বেদান্তবাগীশ সংস্করণ)।

(খ) ঐ খণ্ডন—

(১) ব্যধিকরণ দীধিতি, (গাদাধরী পৃঃ ৩১৮-১৯), প্রকাশ, প্রসারিণী এবং গঙ্গাব্যাখ্যাসমন্বিত জাগদীশী সহ।

(২) মুক্তাবলী।

(৩) তর্কবাগীশ, ন্যায়দর্শন।

(৪) সর্বদর্শন সংগ্রহ, রামানুজ দর্শন।

(৫) তাৎপর্য টীকা (কলিকাতা সংস্কৃত সিরিজ সং, ১১৮পৃঃ) পরিশুদ্ধি (এশিয়াটিক সোঃ সং ৬০৬-৬২২) সহ।

(৬) অনুমান গাদাধরী ৭৮৫-৭৯০ পৃঃ।

(৭) মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য লিখিত, ভাষারত্ন গ্রন্থের ভূমিকা।

—

প্রথম খণ্ড। পঞ্চম অধ্যায়।

পরমাণুবাদ

সুখ, দুঃখ ও মোহস্বরূপ প্রকৃতি, বা সদসৎ বিলক্ষণ অজ্ঞান যে ন্যায়াচার্যগণের মতে জগতের উপাদান কারণ হইতে পারে না, ইহা আমরা দেখিয়াছি। আমরা আরও দেখিয়াছি যে ন্যায়াচার্যগণের মতে ক্ষিতি অপ্‌ তেজ ও মরুৎ—এই চারিপ্রকার পরমাণুই জগতের উপাদান কারণ। এখন এই পরমাণুবাদ বিচারসহ কিনা তাহা দেখা যাউক। পরমাণু প্রসঙ্গে ন্যায়াচার্যগণের মূল বক্তব্য হইল এই যে

অবয়ব অবয়বী অপেক্ষা ক্ষুদ্র হইতে বাধা

অবয়বীরূপ কার্যদ্রব্যের অবয়বরূপ উপাদান কারণ পরিমাণে কার্য অপেক্ষা ক্ষুদ্রই হইয়া থাকে এবং মূল উপাদান কারণ বা যে উপাদান কারণ কারণই, কার্য নহে, তাহা পরম ক্ষুদ্র। যেমন আমার কাপড়টি। ইহা দৈর্ঘ্যে ১৮ ফুট এবং প্রস্থে ৫ ফুট। সুতরাং গণিতের নিয়মে ইহার কালি হইল ৯০ বর্গফুট। এখন, আমার কাপড়ে এমন কোনও সুতা আছে কি যাহার কালি ৯০ বর্গফুট হইবে? অবশ্যই নাই। তাহা যদি থাকিত, তাহা হইলে সেই সুতাটিই পরিধান করিতে (অথবা গলায় দিতে) পারিতাম। অতএব, দেখা যাইতেছে যে আমার কাপড় নামক কার্যদ্রব্যের উপাদান কারণ সুতা, আমার কাপড় অপেক্ষা পরিমাণে ক্ষুদ্র। এইরূপ যে কলমটিতে আমি লিখিতেছি, তাহার নিবটি, তাহার একটি উপাদান কারণ এবং কার্য অপেক্ষা পরিমাণে ক্ষুদ্র। এইরূপ অন্যান্য ক্ষেত্রেও। তুমি বা আমি বা কেহই এমন কোন কার্য দেখি নাই, যাহার উপাদান কারণের পরিমাণ তাহা অপেক্ষা কম নহে। আমরা অবশ্য শুনিয়াছি যে রাক্ষসীদের দেশে এমন এক প্রকার কাঁকুড় পাওয়া যায় যাহা লম্বায় বার হাত হইলেও যাহার বীজ তের হাত লম্বা। কিন্তু এইরূপ কাঁকুড় আমরা কেহই দেখি নাই বা দেখিবার আশা রাখি না। এই কাঁকুড় অপ্রসিদ্ধ কাঁকুড়—ঠাকুরমার মায়ার ঝুলিতেই ইহা থাকে। প্রসিদ্ধ কাঁকুড়ের বীজ কাঁকুড় হইতে বিশেষ ক্ষুদ্রই, অনেকটা রসিকা বৈষ্ণবীর নাসিকাগ্রে সযত্নে অঙ্কিত রসকলির ন্যায়ই হইয়া থাকে। সুতরাং আমরা বলিতে পারি না যে কোন কোন ক্ষেত্রে অবয়ব অবয়বী হইতে বৃহৎ পরিমাণ হয়। বস্তুতঃ অবয়ব অবয়বী হইতে বৃহৎ হইবে কেমন করিয়া? অনেক অবয়ব মিলিত হইয়াই এক অবয়বীকে উৎপন্ন করে। সুতরাং অবয়বের পক্ষে অবয়বী অপেক্ষা ক্ষুদ্র হওয়া ব্যতীত উপায় নাই।

এখন, তুমি যে কোন একটি কার্যদ্রব্য, যেমন তোমার কাপড়টি লও, এবং

মূল্যের কথা না ভাবিয়া তাহাকে বিভক্ত করিতে বা ছিঁড়িতে থাক। প্রথমে অবশ্যই তুমি অনেকগুলি সুতা পাইবে। তাহার পর পাইবে ছোট সুতা, তাহার পর আরও ছোট সুতা, তাহার পর আরও আরও ছোট সুতা, ইত্যাদি। এখন প্রশ্ন এই যে তোমার এই বিভাগ কতকাল চলিবে? তুমি কি অনন্তকাল ধরিয়া বিভাগ করিয়া চলিবে? তোমার বিভাগ কি কোথাও নিবৃত্ত হইবে না, বিশ্রাম পাইবে না? অবশ্যই নহে। তোমার বিভাগের যদি কোথাও বিশ্রাম না থাকে, যদি এই বিভাগ অনন্ত হয়, তাহা হইলে তোমার কাপড়টির পরিমাণ কেন যে তাহার অবয়ব সুতার পরিমাণ অপেক্ষা বৃহৎ, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে না। কারণ তোমার কাপড়কে যখন তুমি বিভক্ত করিতে থাকে, তখন তোমার বিভাগ কুত্রাপি বিশ্রাম পায় না বা অনন্তকাল ধরিয়া চলে। এইরূপ, যখন তুমি তোমার কাপড়েরই অবয়বস্বরূপ কোনও সুতাকে বিভক্ত করিতে থাকে, তখনও তোমার বিভাগ অনন্তকাল ধরিয়া চলে। সুতরাং কাপড়ের অবয়ব সংখ্যাও অনন্ত, এবং সুতার অবয়ব সংখ্যাও অনন্ত এবং কোনও দ্রব্যের পরিমাণ তাহার অবয়ব সংখ্যার উপর নির্ভর করে বলিয়া অনন্ত সংখ্যক অবয়ব বিশিষ্ট কাপড়ের পরিমাণ তুল্য সংখ্যক অবয়ব বিশিষ্ট সুতার পরিমাণেরই সমান হইবে। কিন্তু তাহা হইতে পারে না। অতএব এই বিভাগ যে অনন্তকাল ধরিয়া চলিবে তাহাও বলিতে পারা যায় না।

অবয়বীর বিভাগ অনন্ত হইতে পারে না। যে পরম ক্ষুদ্র অবয়বে বিভাগ বিশ্রাম পায়, তাহাই পরমাণু।

এখন তুমি যে বলিবে যে কাপড় অনন্ত সংখ্যক বড় বড় অবয়ব বিশিষ্ট, এবং সুতা অনন্ত সংখ্যক ছোট ছোট অবয়ব বিশিষ্ট এবং সেই জন্যই কাপড়ের পরিমাণ সুতার পরিমাণ অপেক্ষা বৃহৎ, তাহা হইবে না। কারণ বড় বড় অবয়ব ও ছোট ছোট অবয়ব বলিয়া কোন কথাই এই প্রসঙ্গে হইতে পারে না। কাপড়ের কোনও অবয়ব নিরবয়ব নহে এবং সুতারও কোন অবয়ব নিরবয়ব নহে। কাপড়ের অবয়বগুলির বিভাগ হইতে পারে, এবং সুতার অবয়বগুলিরও বিভাগ হইতে পারে। কাপড়ে অবয়বের বিভাগের যেমন কোথাও বিশ্রাম নাই, সুতার অবয়বের বিভাগেরও তেমনই কোথাও বিশ্রাম নাই। সুতরাং কাপড়ের অবয়বগুলি সুতার অবয়বগুলি অপেক্ষা বড়, এই কথারও কোন অর্থ নাই। বিভাগের যদি কোথাও বিশ্রাম থাকিত তাহা হইলে এইটি ছোট এইটি বড ইত্যাদি কথার অর্থ থাকিত। কিন্তু বিভাগের যে কোথাও বিশ্রাম আছে তাহা যখন তুমি মানিতেছ না, তখন তুমি বলিতে পার না যে এইটি ছোট এবং এইটি বড়। নিবৃত্তিবিহীন অবিশ্রাম বিভাগধারায় ছোট ও বড়, ক্ষুদ্র পরিমাণ ও বৃহৎ পরিমাণ ইত্যাদি কথা অর্থহীন।

তাই কাপড়টি অনন্ত সংখ্যক বড় বড় অবয়ব বিশিষ্ট বলিয়া অনন্ত সংখ্যক ছোট ছোট অবয়ব বিশিষ্ট সুতা হইতে বড় ইত্যাদি কথাও অর্থহীন। সংক্ষেপে, বিভাগের যদি কোথাও নিবৃত্তি না থাকে, তাহা হইলে অবয়বী ও অবয়ব, সুমেরু ও সর্ষপ, নস্য ও নাসিকা, মক্ষিকা ও ঐরাবত প্রভৃতি সকলকেই সম-পরিমাণ বলিতে হয়। কিন্তু আমরা কেহই তাহা বলিতে পারি না। ইহারা যে অসমপরিমাণ, বা ইহাদের যে পরিমাণগত ভেদ আছে, তাহা আমরা সকলেই স্বীকার করি। বস্তুতঃ ইহারা যে অসমপরিমাণ তাহা পরিশ্রম করিয়া বুঝিবার বা বুঝাইবার প্রয়োজন হয় না। তুমি কি দেখিতে পাও না যে সর্ষপ ও মহীধর অসমপরিমাণ? তুমি কি জান না যে, যে নাসিকার গহ্বরে তুমি লক্ষ লক্ষ নস্যকণা অক্লেশে পাঠাইয়া দাও, সেই নাসিকা অবশ্যই নস্যকণার সমপরিমাণ নহে? তুমি কি বুঝ না যে একটি মক্ষিকা তোমার স্কন্ধে আরোহণ করিলে তুমি অনেক সময় জানিতেও পার না, কিন্তু একটি ঐরাবত যদি তোমার স্কন্ধে আরোহণ করে, তাহা হইলে তুমি এমন জানাই জানিবে যে ভবিষ্যতে তোমার আর কখনও কিছু জানিবার সুযোগ হইবে না? অতএব, আমরা বলিতে পারি না যে কোনও কার্যদ্রব্যকে আমরা অনন্তকাল ধরিয়া বিভক্ত করিতে পারি। কার্যদ্রব্যের বিভাগ অনন্ত হইতে পারে না। তাহার বিশ্রাম প্রয়োজন।

কিন্তু এই বিশ্রাম কোথায় হইবে? তুমি কি বলিবে যে এই বিভাগ ততক্ষণ চলিবে যতক্ষণ পর্যন্ত না দ্রব্যটি শূন্যে বিলীন হইয়া যায়? অর্থাৎ তুমি কি বলিবে যে জিনিষটিকে ভাঙিতে ভাঙিতে আমরা যখন দেখিব যে আর কিছুই অবশিষ্ট নাই কেবল শূন্যতা বা অভাব মাত্র রহিয়াছে, তখনই বিভাগের নিবৃত্তি হইবে? অবশ্যই নহে। কারণ কোনও কিছুকেই বিভক্ত করিতে করিতে এইরূপ শূন্যতায় পৌঁছান যায় না। কাপড়টি বিভক্ত করি, সুতা পাই, সুতাকে বিভক্ত করি, ছোট সুতা পাই, তাহাকে বিভক্ত করি আরও ছোট সুতা পাই, ইত্যাদি। কিন্তু কোথাও শূন্যতা বা অভাব মাত্র পাই না। বিভাগ মাত্রই সাধার, নিরাধার বিভাগের প্রসিদ্ধি নাই। সুতরাং বলিতে পারি না যে শূন্যতাতে আসিয়া বিভাগ বিশ্রাম পাইবে। তুমি যে বলিবে যে কাপড়, সুতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে, বিভাগের পর শূন্যতা না পাওয়া যাইলেও, শেষ বিভাগটি শূন্যতাই সৃষ্টি করে, তাহা হইবে না। কারণ অন্য কোনও বিভাগ শূন্যতার সৃষ্টি করিল না, আর ঐ বিভাগটিই করিল, ইহা কেমন করিয়া সম্ভব? তুমি যে বলিবে যে ঐ বিভাগটি শেষ বিভাগ বলিয়া শূন্যতার সৃষ্টি করে, তাহা হইবে না। কারণ শেষ বিভাগও বিভাগ, বিভাগরূপে তাহা অন্য বিভাগ হইতে পৃথক নহে। চরম বিভাগ বলিয়া যে তাহার বিভাগত্বের হানি হইবে তাহা হইবে

না। অবশ্য, যদি বিভাগ ধারার নিবৃত্তির অন্য কোনও ভাবে উপপত্তি করা না চলিত, তাহা হইলে বাধ্য হইয়াই বলিতে হইত যে চরম বিভাগটির কিছু বিশেষ আছে, বা অন্য বিভাগ শূন্যতার সৃষ্টি না করিলেও ইহা করে। কিন্তু নিরবয়ব অবয়বে বিভাগ বিশ্রাম পায়, এইরূপ বলিলেই যখন বিভাগের নিবৃত্তির উপপত্তি করা যাইতে পারে, তখন আর বিভাগের বিভাগত্বের হানি করিয়া প্রলয় বা শূন্যতাতেই বিভাগের নিবৃত্তি হইয়া থাকে, এইরূপ কথা বলিবার কোনও অর্থ থাকে না। বিভাগের নিবৃত্তি শূন্যতাতে নহে– অবিভাজ্য, পরমসূক্ষ্ম, নিরবয়ব অবয়বে।

এখন তুমি হয়ত বলিবে যে অবিভাজ্য, পরমসূক্ষ্ম, নিরবয়ব অবয়ব, এ আবার কেমন কথা? বিভাগের নিবৃত্তি প্রয়োজন, ইহা বুঝিলাম। শূন্যতাতে এই নিবৃত্তি হইতে পারে না ইহাও বুঝিলাম। কিন্তু নিরবয়ব অবয়বেই বা ইহার নিবৃত্তি হইবে কেন? তোমার এইরূপ প্রশ্ন শুনিয়া ন্যায়াচার্যগণ প্রতিপ্রশ্ন করিবেন, হইবে নাই বা কেন? তুমি স্বীকার করিতেছ যে বিভাগ অনন্ত হইতে পারে না। বিভাগের নিবৃত্তি থাকিতেই হইবে। শূন্যতাতেও যে এই নিবৃত্তি হইতে পারে না, তাহা তুমিও স্বীকার কর। সুতরাং বিভাগের নিবৃত্তির উপপত্তি তুমি কেমন করিয়া করিবে? অবশ্যই তোমায় বলিতে হইবে যে বিভাগ করিতে করিতে এমন কিছুতে আমরা আসিয়া উপস্থিত হই, যাহাকে আমরা আর বিভক্ত করিতে পারি না। এই কিছুটি কি? অবশ্যই অভাব পদার্থ বা শূন্যতা নহে—ভাব পদার্থ। কিন্তু কিরূপ ভাব পদার্থ? নিশ্চয়ই ঘট পট প্রভৃতির ন্যায় সাবয়ব বা সমবেত দ্রব্য নহে—নিরবয়ব বা অসমবেত দ্রব্য। কিন্তু কিরূপ নিরবয়ব? অবশ্যই গগন বা আত্মার ন্যায় বিভু বা সর্বগত নিরবয়ব দ্রব্য নহে। সুতরাং ইহা নিশ্চয়ই পরমক্ষুদ্র, মহৎসূক্ষ্ম, অবিভাজ্য, নিরবয়ব ভাব পদার্থ বা পরমাণু।

ইহাই পরমাণু সাধন প্রসঙ্গে ন্যায়াচার্যগণের মোট কথা! এখন পরমাণুবাদ ন্যায়াচার্যগণের সম্মত হইলেও, অনেক দর্শনাচার্যই ইহা স্বীকার করেন না। মহাযানী বৌদ্ধাচার্যগণ, অদ্বৈতাচার্যগণ এবং আরও অনেক পরমাণুবাদ খণ্ডন করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সকলের সকল কথা লইয়া এখানে আলোচনা করা যাইতে পারে না। তাই আমরা এখানে তাহা করিবার কোন চেষ্টা করিব না। আমরা কেবল পরমাণুবাদবিরোধী আচার্যগণের প্রধান বক্তব্যগুলিকে বুঝিবার চেষ্টা করিব এবং ন্যায়াচাযগণ ইহাদের উত্তরে কি বলিয়া থাকেন তাহাও দেখিবার চেষ্টা করিব।

পরমাণুবাদ বিরোধী আচার্যগণের মোট কথা হইল এই যে পরমাণু গগন-কমলের ন্যায় একান্ত অলীক। কোনও গগন-কমল একও নহে, অনেকও নহে।

নিরবয়বও নহে, সাবয়বও নহে। সেইরূপ কোনও পরমাণু একও নহে, অনেকও নহে, নিরবয়বও নহে, সাবয়বও নহে। কোনও পরমাণু সাবয়ব নহে। কারণ, পরমাণুবাদীরাই বলিয়া থাকেন যে পরমাণু এক বা নিরবয়ব। এইরূপ কোনও পরমাণু এক বা নিরবয়ব নহে। কারণ, অসর্বগত অথচ নিরংশ কোনও দ্রব্য পদার্থ থাকিতে পারে না, বা ন্যায়মত সম্মত হইতে পারে না। কিন্তু থাকিতে পারে না কেন? বলিতেছি। ন্যায়াচার্যগণ আকাশ নামে একটি বিভু পদার্থ স্বীকার করেন। এই আকাশ সর্বগত বলিয়া যে সকল অসর্বগত দ্রব্যের সংযোগী তাহাও স্বীকার করেন। এখন প্রশ্ন এই যে আকাশের সহিত কোনও পরিচ্ছন্ন দ্রব্যের সংযোগ কিরূপ? আকাশ কি প্রথম প্রণয়ভীরু বালিকা বধূর ন্যায় মূর্ত দ্রব্যগুলিকে উপরে উপরে, আল্‌তোভাবে ছুঁইয়া থাকে? অবশ্যই নহে। মূর্ত দ্রব্যের কেবল বাহিরের সহিতই ইহা যদি সংযুক্ত হয়, তাহা হইলে ইহাকে সর্বগত বলার কোনও অর্থ থাকে না। সর্বগত বলিয়া ইহা কেবল বাহিরের সহিতই সংযুক্ত হইতে পারে না, ভিতরের সহিতও ইহাকে সংযুক্ত হইতে হয়। আর, কার্যক্ষেত্রে, এইরূপই দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা যখন ভূমি খনন করি, তখন স্পষ্টই দেখিতে পাই যে ভূমির অভ্যন্তর প্রদেশেও আকাশ রহিয়াছে। মাটি কাটিবার সঙ্গে সঙ্গেই আলোকের মত আকাশ তথায় প্রবেশ করিতেছে ইহা যে বলিব, তাহা হইবে না। কারণ আকাশের কোন গতি নাই। অতএব ভূমির বহির্দেশেই যে আকাশের সহিত সংযোগ রহিয়াছে, তাহা নহে। ইহার অভ্যন্তর প্রদেশেও আকাশ সংযোগ রহিয়াছে। এখন, পরমাণুর সহিত আকাশের অবশ্যই সংযোগ আছে এবং এই সংযোগ কেবল পরমাণুর বহির্ভাগেই নাই, অভ্যন্তর ভাগেও অবশ্যই আছে। সুতরাং পরমাণু নিরংশ হইতে পারে না। ইহার যখন আকাশের সহিত দুইটি সংযোগ রহিয়াছে তখন অবশ্যই ইহার দুইটি প্রদেশ আছে, এবং এই দুইটি প্রদেশই তাহার অংশ বা অবয়ব। এখন, তুমি যে বলিবে যে পরমাণুর ভিতর ও বাহির আছে বটে এবং ইহাদের তাহার প্রদেশও বলা যায় বটে, কিন্তু ইহাদের তাহার অবয়ব বা অংশ বলা যায় না, তাহা হইবে না। কারণ প্রদেশ দুইটি কিরূপ প্রদেশ তাহা বিবেচনা করিয়া দেখ। এই দুইটি প্রদেশে দুইটি পৃথক সংযোগ উৎপন্ন হয়। অতএব, পরমাণুর প্রদেশ কথাটি কেবল কথার কথা নহে। ইহার প্রদেশ দুইটি বাস্তব, দুইটি পৃথক সংযোগের আশ্রয়, দুইটি পৃথক ধর্মের ধর্মী। ইহাদের যদি তুমি অবয়ব না বল, তাহা হইলে আর অবয়ব বলিবে কাহাকে? তুমি যে বলিবে কোনও কিছু যাহাদের সংযোগের ফলে উৎপন্ন হয়, তাহাদেরই তাহার অবয়ব বলে এবং পরমাণু

পূর্বপক্ষ। পরমাণু অলীক। কারণ ইহা একও নহে, অনেকও নহে।

উৎপাদহীন বলিয়া, ইহার কোনও অবয়ব নাই, বা দুইটি সংযোগের অধিকরণস্বরূপ দেশ দুইটি ইহার অবয়ব নহে, তাহা হইবে না। কারণ পরমাণুর যে উৎপাদ নাই, তাহা তুমি কেমন করিয়া জানিলে? তুমি ত' বলিয়া থাক যে পরমাণু নিরবয়ব বলিয়া নিত্য, সুতরাং এখন তোমার পক্ষে বলা চলে না যে পরমাণু নিত্য বলিয়াই নিরবয়ব। আরও দেখ কোনও দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন অবয়বেই ভিন্ন ভিন্ন সংযোগ আধেয় হইয়া থাকে। আমি যে লেখনীটির সাহায্যে লিখিতেছি, তাহার অগ্রভাগ কাগজের সহিত সংযুক্ত এবং মধ্যভাগ সংযুক্ত আমার অঙ্গুলীর সহিত। এই দুইটি দেশই ইহার অবয়ব। প্রত্যেকটি দ্রব্যের ক্ষেত্রেই ইহা বলা যায়। প্রত্যেকটি দ্রব্যেরই ভিন্ন ভিন্ন অবয়বে ভিন্ন ভিন্ন সংযোগ ঘটিয়া থাকে। সুতরাং পরমাণুতে যখন দুইটি সংযোগ উৎপন্ন হয়, এবং ঐ দুইটি সংযোগ যখন ভিন্ন দেশে থাকে, তখন তথাকথিত নিরবয়ব পরমাণুর ঐ প্রদেশ দুইটিকে তাহার দুইটি অবয়বই বলিতে হইবে, বা পরমাণু যে প্রকৃত পক্ষে নিরংশ নহে, সাংশ তাহা তোমাকে স্বীকার করিতেই হইবে।

তুমি অবশ্য বলিতে পার যে পরমাণুর ভিতর ও বাহির বলিয়া দুইটি বিভাগ নাই। অভ্যন্তর ও বাহির বলিতে ব্যবহিত ও অব্যবহিত উপাদান কারণকেই বুঝা হয়। যেমন কমলা লেবুটি। উপরের খোসাটিও যেমন ইহার উপাদান কারণ, ভিতরের কোয়াগুলিও ঠিক তেমনই ইহার উপাদান কারণ। তবে এই দুইটি উপাদান কারণের মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য রহিয়াছে। প্রথম উপাদান কারণটি অব্যবহিত বা অনাচ্ছাদিত, কিন্তু দ্বিতীয় উপাদান কারণটি ব্যবহিত বা আচ্ছাদিত; কোনও জন্য দ্রব্যের অব্যবহিত উপাদান কারণকেই তাহার বাহির বলিয়া বুঝা হয়, এবং ব্যবহিত উপাদান কারণকেই তাহার অভ্যন্তর বলিয়া বুঝা হয়। অতএব, অভ্যন্তর এবং বাহির কারণ শব্দ—ইহাদের প্রয়োগ করা হয় আচ্ছাদিত ও অনাচ্ছাদিত উপাদান কারণগুলিকে বুঝাইবার জন্য। এখন যেহেতু পরমাণু নিত্য বা অকার্য সেই হেতু ইহার কোন কারণ—আচ্ছাদিত বা অনাচ্ছাদিত—থাকিতে পারে না। এবং সেই জন্যই ইহার অভ্যন্তর বা বাহিরও থাকিতে পারে না। পরমাণু সম্পর্কে অভ্যন্তর বা বাহির শব্দের প্রয়োগ বন্ধ্যার সম্পর্কে পুত্রবতী বা কন্যাবতী শব্দের প্রয়োগের মতই ব্যর্থ। এখন, পরমাণুর যদি ভিতর ও বাহির বলিয়া দুইটি প্রদেশ না থাকে, তাহা হইলে তাহাতে আকাশের সহিত দুইটি সংযোগ থাকারও কোন প্রশ্ন হয় না। আকাশ সর্বগত বটে, কিন্তু সর্বগত বলিয়া যে তাহাকে অলীকের সহিত সংযুক্ত হইতে হইবে, এমন কোনও কথা নাই। যাহাই হউক, পরমাণুর ভিতর ও বাহির বলিয়া কিছুই নাই। সুতবাং আকাশের সহিত তাহার দুইটি সংযোগও নাই, এবং সেই জন্য ইহার কোন অংশই নাই। ইহা নিরংশ বা নিরবয়ব।

এইরূপ কথা তুমি বলিতে পার। কিন্তু এইরূপ কথার উত্তরেও কথা বলা যায়। যেমন, তোমার কথা মানিয়া লওয়া গেল। স্বীকার করা হইল যে পরমাণুর ভিতর ও বাহির বলিয়া কিছুই নাই। কিন্তু পরমাণু ত' আছে : এবং পরমাণুতে পরমাণুতে সংযোগও হইতে পারে। এখন, মনে কর যে কোন একটি পরমাণুর দুই দিক হইতে দুইটি পরমাণু আসিয়া তাহার সহিত মিলিত হইল। এই দুইটি আগন্তুক পরমাণু অবশ্যই ঐ পরমাণুটির দ্বারা ব্যবহিত হইবে। অর্থাৎ পূর্বদেশস্থ আগন্তুক পরমাণু অবশ্যই পশ্চিমদেশস্থ আগন্তুক পরমাণুর সহিত ধাক্কা খাইবে না। মধ্যস্থ পরমাণুর সহিত সংযুক্ত হইয়াই তাহারা সংযুক্ত হইবে। সুতরাং মধ্যস্থ পরমাণুটির অবশ্যই এপিঠ ওপিঠ-দুইপিঠ আছে। তাহার ভিতর ও বাহির না থাকিতে পারে, কিন্তু এপিঠ, ওপিঠ, দুইপিঠ থাকিবে না কেন? তাহার যে দুইটি সংযোগ আছে এবং এই দুইটি সংযোগ যে ভিন্ন দেশস্থ তাহা তুমি অস্বীকার করিবে? বেশ, তাহা হইলে মনে কর যে আরও চারিটি পরমাণু, উর্ধ্ব, অধঃ, উত্তর ও দক্ষিণ হইতে আসিয়া ঐ মধ্যস্থ পরমাণুটির সহিত সংযুক্ত হইল। তোমার একটি পরমাণু, তিনটি দ্ব্যণুকের সমষ্টিরূপ অবয়বী দ্ব্যণুকের অবয়বের অবয়ব,—সুতরাং বর্তমানে তুমি একটি চাক্ষুষ বা মহৎপরিমাণ দ্রব্য পাইলে। কিন্তু কি করিয়া পাইলে? অবশ্যই যদি ছয়দিকের পরমাণু ছয়টি মধ্যস্থ পরমাণুর সহিত, একই দেশে সংযুক্ত না হয়। মধ্যস্থ পরমাণুর যেই দেশে পূর্বদেশস্থ পরমাণুর সহিত সংযোগ থাকে, যদি সেই দেশেই অন্য পাঁচটি পরমাণুরও সংযোগ থাকিয়া যায়, তাহা হইলে এই পরমাণু সমুদায় বা পিণ্ডটি অণুমাত্রকই হইবে। তাহার কোনও প্রথিমা থাকিবে না। অতএব তোমাকে বলিতে হইবে যে মধ্যস্থ পরমাণুটির সহিত ছয়টি পরমাণুর সংযোগ সমান দেশস্থ নহে, ভিন্ন ভিন্ন দেশস্থ। মধ্যস্থ পরমাণুটির ছয়টি প্রদেশ আছে এবং সেই ছয়টি প্রদেশই ছয়টি পৃথক সংযোগের পৃথক অধিকরণ। পরমাণু নিরংশ নিরবয়ব নহে, সাংশ সাবয়ব। বস্তুতঃ মধ্যস্থ পরমাণুর একই দেশে ছয়টি সংযোগ থাকিবে কেমন করিয়া? তোমার মস্তকে যেখানে একটি কেশ থাকে সেখানে কি অন্য কোনও কেশ থাকিতে পারে? ভুতলে যেখানে একটি ঘটের সংযোগ রহিয়াছে, সেখানে কি অন্য কোনও ঘটের সংযোগ থাকিতে পারে? একজন পতিব্রতা নারীর যেমন একজনের অধিক স্বামী থাকিতে পারে না, তেমনই কোনও একটি দেশে একটির অধিক সংযোগও থাকিতে পারে না। মধ্যস্থ পরমাণুর সহিত যখন একই সঙ্গে ছয়দিক হইতে ছয়টি পরমাণু আসিয়া সংযুক্ত হয়, তখন তাহারা মধ্যস্থ পরমাণুর ছয়টি পৃথক পৃথক দেশেই সংযুক্ত হয়। অতএব, মধ্যস্থ পরমাণুটি বা কোন পরমাণুই নিরবয়ব নহে। কোনও পরমাণুকেই এক বলা যায় না। আরও দেখ, প্রত্যেকটি পরমাণুরই অবশ্যই দিগ্‌ভাগভেদ আছে।

তাহারা প্রত্যেকেই পূর্বদিকের সহিত যেমন সংযুক্ত হয়, ঠিক তেমনই আবার অন্য দিকের সহিতও সংযুক্ত হয়। এই সংযোগগুলিকেও তুমি এক বলিতে পার না। তুমি বলিতে পার না যে পরমাণুর যেই প্রদেশে পূর্বদিকের সহিত সংযোগ থাকে, ঠিক সেই প্রদেশেই অন্যান্য দিকের সহিতও সংযোগ থাকে। তুমি কেবল ইহাই বলিতে পার যে পরমাণুর কোন দিগ্ভাগভেদ নাই। কিন্তু তাহাও তুমি বলিতে পার না। কারণ, পরমাণুর যদি দিগ্ভাগভেদ না থাকে তাহা হইলে ছায়া আতপ প্রভৃতি কেমন করিয়া সম্ভব হইবে? সকালে আদিত্য যখন পূর্বাকাশে দেখা দেন তখন তোমার দেহের পশ্চিম অংশে ছায়া থাকে, এবং আদিত্য যখন পশ্চিম আকাশে ঢলিয়া পড়েন, তখন তোমার দেহের পূর্বাংশে ছায়া থাকে। তোমার দেহের যদি পূর্বাংশ ও পশ্চিমাংশ না থাকিত বা তোমার দেহটি যদি একটি দিগ্ভাগভেদহীন দ্রব্য হইত, তাহা হইলে তোমার একাংশে ছায়া এবং অন্য অংশে আতপ থাকিত না। এইরূপ, পরমার যদি দিগ্ভাগভেদ না থাকে, তাহা হইলে এইখানে ছায়া এবং ওইখানে আতপ, এইরূপ ব্যবহার থাকিতে পারে না? তুমি যে বলিবে যে পরমাণুর দিগ্ভাগভেদ না থাকিলেও অনেক পরমাণুর মিলনের ফলে যে দ্রব্যান্তর অবয়বীর উৎপত্তি হয় তাহার থাকে এবং সেইজন্যই অবয়বীর একস্থানে ছায়া এবং অন্যস্থানে আতপ থাকিতে পারে, তাহা হইবে না। কারণ, প্রথমতঃ নিরবয়ব পরমাণুরা যে কি করিয়া মিলিত হয় তাহাই বুঝিতে পারা যায় না। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে মধ্যস্থ একটি পরমাণুর সহিত ছয়টি পরমাণুর মিলনের ফলে মহৎ পরিমাণ কোনও পিণ্ডের উৎপত্তি হয়, ইহা যদি বলিতে হয় তাহা হইলে ঐ মিলন যে সমান দেশস্থ নহে, ভিন্ন দেশস্থ এবং পরমাণু যে নিরবয়ব নহে সাবয়ব তাহাও বলিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ পরমাণুতে যদি দিগ্ভাগভেদ না থাকে, তাহা হইলে পরমাণুর মিলনের ফলে যে অবয়বী উৎপন্ন হয়, তাহাতেই বা ইহা আসিবে কেমন করিয়া? অণুপরিমাণ পরমাণু হইতে মধ্যম পরিমাণ অবয়বী উৎপন্ন হয়, ইহা বুঝিতে পারা যায়। কারণ অবয়বীর পরিমাণ অবয়বের সংখ্যার উপর নির্ভর করে। কিন্তু পূর্বাদি প্রদেশ হীন পরমাণু হইতে তাদৃশ প্রদেশবান্ অবয়বীর উৎপত্তি কেমন করিয়া হইবে? উপরন্তু কোনও পরমাণুর পূর্বভাগ পরভাগ যদি না থাকে, তাহা হইলে আবরণেরই বা ব্যাখ্যা কেমন করিয়া করা যাইবে? তোমার পাগ্ড়ীটি মধ্যাহ্ন রৌদ্রের তেজ হইতে তোমার মস্তককে রক্ষা করিতে পারে—কারণ ইহার এক ভাগ তেজের সহিত সংযুক্ত হইয়া তাহার গতি প্রতিহত করে। অতএব পরমাণুর যদি পূর্বভাগ পরভাগ না থাকে, তাহা হইলে একটি পরমাণুর দ্বারা অন্য কোনও পরমাণুর আবরণ বা কোনও কিছুর দ্বারা কোনও কিছুরই আবরণ সম্ভব হইতে পারে না। সুতরাং,

পরমাণুকে নিরংশ বলিতে পারা যায় না। পরমাণু একও নহে, অনেকও নহে, নিরংশও নহে, সাংশও নহে, নিরবয়বও নহে, সাবয়বও নহে। ইহাকে বস্তু বলা অন্যায়। গগন-কমল প্রভৃতি অলীক পদার্থই ইহার তুলনা। সর্ষপ ও মহীধর প্রভৃতি দ্রব্যের অসমপরিমণিত্বের ব্যবহার কাল্পনিক। অনাদি মিথ্যা সংস্কারের বৈচিত্র্যই জগতে বিচিত্র মিথ্যা ব্যবহারের হেতু। পরমাণুবাদ আপাতঃ রমণীয় হইলেও গ্রাহ্য নহে—তত্ত্বের গভীরে প্রবেশে অনিচ্ছুক তার্কিকদের মিথ্যা অভিমানেই ইহার জন্ম।

পূর্বপক্ষ খণ্ডন।

পূর্বপক্ষীগণের কথা আমরা শুনিলাম। এখন আমরা এই প্রসঙ্গে ন্যায়াচাযগণের কি বলিবার আছে, তাহা দেখিবার চেষ্টা করিতে পারি। ন্যায়াচার্যগণের মতে পরমাণু একই, অনেক নহে, নিরংশই, সাংশ নহে, নিরবয়বই, সাবয়ব নহে। গগন-কমল প্রভৃতি অলীক পদার্থের সহিত ইহার তুলনা একান্ত অসঙ্গত। পূর্বপক্ষী আচার্যগণ মনে করেন যে নিরবয়ব পরমাণুর সংযোগের উপপত্তি নাই এবং সেই জন্যই তাঁহারা বলেন যে পরমাণু এক বা নিরবয়ব নহে। কিন্তু সত্যিই কি পরমাণুর সংযোগের কোন উপপত্তি নাই। বিচার করিয়া দেখা যাউক। সংযোগ যে কোনও দ্রব্যের এক প্রদেশে উৎপন্ন হয়, ইহা সত্য। এই জন্যই সংযোগকে অব্যাপ্যবৃত্তি পদার্থ বলে। অর্থাৎ, কোনও সংযোগ যে অধিকরণে থাকে, সেই অধিকরণে তাহার অভাবও থাকে। যেমন বৃক্ষের শাখায় কপি-সংযোগ থাকিলেও, তাহার মূলদেশে ইহার অভাব থাকে। এইরূপ, পর্বত শিখরদেশে বহ্নি সংযোগী হইলেও ইহার নিতম্বে বহ্নিসংযোগের অভাব থাকিতে পারে। এইরূপ সকল ক্ষেত্রেই। সংযোগের প্রকৃতিই এই যে ইহা তাহার আশ্রয় দ্রব্যকে ব্যাপিয়া থাকে না—তাহার আশ্রয় দ্রব্য, তাহার এবং তাহার অভাবের, উভয়েরই অধিকরণ হয়। কিন্তু এই জন্য নিরবয়ব দ্রব্যের সংযোগের কোনও অনুপপত্তি হয় না। পরমাণুর কথা, এখন থাক্। আত্মা এবং মনের কথা লওয়া যাউক। আত্মা নিরবয়ব এবং বিভু। মন অনুপরিমাণ এবং নিরবয়ব। অথচ ইহাদের মধ্যে সংযোগ থাকে। আর, না থাকিলেই বা চলিবে কেন? আত্মা ও মনের সংযোগ না হইলে যে কোন জ্ঞানই হইবে না। অতএব, আত্মা এবং মনের সংযোগ যে হয়, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু কি করিয়া হয়? ইহারা উভয়েই নিরবয়ব। অতএব, আমাদের বলিতে হয় যে সংযোগী হওয়ার জন্য সাবয়ব হওয়ার প্রয়োজন নাই কোনও অবয়বী যখন সংযোগী হয়, তখন তাহার সংযোগ তাহার কোন না কোন অবয়ব অবচ্ছেদেই হইয়া থাকে। বৃক্ষ যখন কপিসংযোগী হয়, তখন শাখাবচ্ছেদেই হয়। আমি যখন তোমায় স্পর্শ করি তখন আমার অঙ্গুলী অবচ্ছেদেই তোমার সংযোগ থাকে। অতএব, কোনও অবয়ববিশিষ্ট যখন সংযোগী হয়, তখন তাহার সংযোগ কোনও

অবয়ব বিশেষের দ্বারা অবচ্ছিন্ন বা বিশেষিত হয়। কিন্তু এইজন্য আমরা বলিতে পারি না যে সংযোগী হইতে হইলেই সাবয়ব হইতে হইবে, বা সকল সংযোগই সংযোগী দ্রব্যের অবয়ব বিশেষের দ্বারা অবচ্ছিন্ন। কারণ আত্মা ও মনের সংযোগের ক্ষেত্রে এই কথা খাটে না।

এখন তুমি যে বলিবে যে আত্ম-মনঃসংযোগের কথা ধরিলে চলিবে না, কারণ আত্মা বা মন কেহই বাহ্য প্রত্যক্ষের বিষয় নহে, বা বাহ্য প্রত্যক্ষের বিষয় রূপ কোনও পদার্থের সমবায়ী কারণ নহে, তাহা হইবে না। কারণ, বহিরিন্দ্রিয় গ্রাহ্য নিরবয়ব দ্রব্য সংযোগী হইতে পারে কি না, ইহা লইয়া এখানে কোন বিচার হইতেছে না—হইতেছে নিরবয়ব দ্রব্য সংযোগী হইতে পারে কিনা, তাহা লইয়া। আর তাহা ছাড়া, আত্ম-মনঃসংযোগের কথা যদি ছাড়িয়াই দেই, তাহা হইলেও কিছুই আসিয়া যায় না। কারণ অন্যান্য নিরবয়ব দ্রব্যেরও যে সংযোগ হইতে পারে, তাহা স্বীকার করিতে হয়। যেমন আকাশ। আকাশ সর্বগত। সকল পরিচ্ছিন্ন দ্রব্যের সহিতই ইহা সংযুক্ত। আমার সম্মুখে যে ঘটটি রহিয়াছে তাহার সহিত আকাশের সংযোগ আছে এবং আকাশের সহিতও তাহার সংযোগ আছে। অতএব আকাশ-ঘট-সংযোগ যেমন ঘটে রহিয়াছে, ঘটাকাশ-সংযোগও তেমনই আকাশে রহিয়াছে। তৈলপাত্র-সংযোগ যেমন পাত্রে থাকে, পাত্রতৈল-সংযোগও তেমনই তৈলে থাকে এবং সেই জন্যই সংযোগ সম্বন্ধে কোন কিছুতে অপর কোন কিছু থাকিলেই যদি তাহাকে সেই অপর কিছুটির আধার বলা হয়, তাহা হইলে তৈলকে যে কেন পাত্রের আধার বলিব না, এই অতি প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক প্রশ্ন ওঠে। যাহাই হউক ঘটাকাশ-সংযোগ আকাশে আছে। এখন প্রশ্ন এই যে এই সংযোগ কি আকাশের কোনও অবয়ব বিশেষের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়া আছে? অবশ্যই নাই। কারণ আকাশ নিরবয়ব। অতএব সংযোগ মাত্রই তাহার আশ্রয়ের অবয়ব বিশেষের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয় ইহা বলিতে পারা যায় না। এখন তুমি যে বলিবে যে, আকাশ নিরবয়ব হইলেও সর্বগত, তাহার কোনও মুখ্য প্রদেশ বা অবয়ব না থাকিলেও, তাহাতে প্রদেশ ব্যবহার হইতে পারে, কিন্তু পরমাণু একান্ত পরিচ্ছিন্ন বলিয়া তাহাতে গৌণ প্রদেশ ব্যবহারও হইতে পারে না, তাহা হইবে না। কারণ, আকাশ সর্বগত বলিয়া তাহাতে গৌণ প্রদেশ ব্যবহার হইতে পারে, ইহা তোমাকে কে বলিল? তুমি হয়ত ভাবিতেছ যে, আকাশ যেহেতু সর্বগত, অর্থাৎ কিনা সর্বত্রই ছড়াইয়া আছে সেইহেতু তাহাতে অত্র ও অন্যত্রের ব্যবহার হইতে পারে। কিন্তু তোমায় জিজ্ঞাসা করি, এই ছড়াইয়া থাকা কিরূপ? ইহা কি তোমার বিছানার চাদরটি যেমন ছড়ান অবস্থায় থাকে, সেইরূপ? অবশ্যই নহে। আকাশ সকল

ভুবনের একখানি অদৃশ্য উত্তরীয় নহে। আকাশ যে নিরবয়ব তাহা ভুলিও না, এবং সেইজন্য তোমার উত্তরীয়ে যেরূপ অত্র এবং অন্যত্রের ব্যবহার হয়, আকাশেও যে তাহাদের সেইরূপ ব্যবহার হয় তাহা ভাবিও না। প্রদেশ, অত্র, অন্যত্র শব্দ প্রকৃতপক্ষে কারণ বাচক। আকাশের কোনও কারণ নাই। ইহা নিত্য। সেইজন্য আকাশের অবয়ব বা প্রদেশের কথা অর্থহীন। তথাপি আমরা তাহার সম্পর্কে প্রদেশ কথাটি ব্যবহার করি। কারণ, সাবয়ব দ্রব্যেও যেমন সংযোগ উৎপন্ন হয়, আকাশেও তেমনই সংযোগ উৎপন্ন হয়। অতএব, আকাশে ভাগ না থাকিলেও ভাগভক্তি আছে, ইহা সাবয়ব না হইলেও এক অর্থে সাবয়ব দ্রব্যের সদৃশ। তাই আকাশে প্রদেশ শব্দের গৌণ ব্যবহার হয়। কিন্তু আকাশ সর্বগত বলিয়া এই ব্যবহার হয় না, নিরবয়ব বলিয়াই হয়। সুতরাং পরমাণুরও ভাগ না থাকিলেও ভাগভক্তি থাকিবে না কেন? তাহার কোন বাস্তব প্রদেশ না থাকিলেও কল্পিত প্রদেশ থাকিবে না কেন? প্রদেশ শব্দের মুখ্য ব্যবহার তাহাতে না থাকিলেও গৌণ ব্যবহার থাকিবে না কেন?

বস্তুতঃ কোন দ্রব্য সংযোগী হয় দ্রব্যরূপেই, সাবয়বরূপে নহে। কারণ, সংযোগ মাত্রই অনিত্য বা কার্য এবং এই কার্যের সমবায়ী কারণ অবশ্যই সংযোগী দ্রব্য বা যে দ্রব্যে সংযোগ উৎপন্ন হয় সেই দ্রব্য। এখন, বিচার করিয়া দেখা যাউক যে, কোনও দ্রব্য যে সংযোগের সমবায়ী কারণ হয়, তাহা কি দ্রব্য বলিয়া হয়, অথবা সাবয়ব বলিয়া হয়। বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, ইহা দ্রব্য বলিয়াই হয়। ঘটটি যখন ভূতল-সংযোগী হয়, তখন ঘটরূপে, অর্থাৎ ঘটত্বাবচ্ছিন্নরূপে, তাহাতে উৎপন্ন সংযোগের সমবায়ী কারণ হয় না। সংযোগরূপ কার্যের সমবায়ী কারণ ঘটটি যদি ঘটরূপে হইত, তাহা হইলে যাহা ঘট নহে, তাহাতে সংযোগ উৎপন্ন হইতে পারিত না। কিন্তু ঘটভিন্নে, যেমন পটে, সংযোগ উৎপন্ন হয়। অতএব ঘটটি ঘটরূপে সংযোগের সমবায়ী কারণ নহে; ন্যূনবৃত্তি ধর্ম বলিয়া ঘটত্ব সংযোগরূপ কার্যের ঘটগত সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদক ধর্ম নহে। এইরূপ, ইহা সৎ বা বিদ্যমান পদার্থ বলিয়াও সংযোগের সমবায়ী কারণ হয় না। তাহা যদি হইত তাহা হইলে যে কোন সৎপদার্থ বা সত্তাবিশিষ্ট পদার্থ সংযোগী হইতে পারিত। কিন্তু গুণ এবং কর্মপদার্থ সৎ হইলেও সংযোগী হয় না। অতএব, ঘটটি সৎ বা বিদ্যমান পদার্থ বলিয়াও সংযোগের সমবায়ী কারণ নহে; অতিরিক্ত বৃত্তি ধর্ম বলিয়া সত্তা, সংযোগের ঘটনিষ্ঠ সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদক ধর্ম নহে। এইরূপ সাবয়ব বলিয়াও ইহা সংযোগের সমবায়ী কারণ হয় না। কারণ, তাহা হইলে যাহা সাবয়ব নহে, যেমন আকাশ, তাহা সংযোগী হইতে পারে না। ন্যূনবৃত্তি ধর্ম বলিয়া সাবয়বত্বও সংযোগের

ঘটনিষ্ঠ সমবায়ী কারণতার অবচ্ছেদক ধর্ম হইতে পারে না। অতএব, দ্রব্যত্বই এই কারণতার অবচ্ছেদক ধর্ম। ঘটটি দ্রব্য বলিয়াই সমবায়ী কারণ হয়। দ্রব্যের সংযোগিত্ব তাহার স্বরূপ নিবন্ধন, ইহাতে তাহার অংশের বা অবয়বের কোন অপেক্ষা নাই। কোন কিছুকে সংযোগী হইতে হইলে দ্রব্য হইতে হইবে। তাহাকে যে সাবয়ব হইতে হইবে এমন কোন কথা নাই। অতএব, পরমাণু সাবয়ব না হইয়াও সংযোগী হইতে পারে। ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই।

যাহাই হউক দ্রব্যের সংযোগিত্ব তাহার স্বরূপ নিবন্ধন। ইহাতে তাহার অংশের কোন অপেক্ষা নাই। একটি পরমাণু একই সময়ে ছয়টি পরমাণুর সহিত সংযুক্ত হইতে পারে বলিয়া ইহা যে ষড়ংশ তাহা বলিবার কোনও কারণ নাই। বস্তুতঃ মধ্যস্থ পরমাণুটির যে পূর্ব, পশ্চিম প্রভৃতি দেশস্থ ছয়টি পরমাণুর সহিত ছয়টি সংযোগ জন্মে, তাহাদের এক একটিকে লইয়া বিচার করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, এক একটি সংযোগ দুইটি দুইটি করিয়া পরমাণুতেই জন্মে, এবং সেইজন্য ঐ সংযোগ ছয়টি সমানদেশস্থ হইতে পারে না। অর্থাৎ মধ্যস্থ পরমাণুটির পূর্বদেশস্থ পরমাণুটির সহিত যে সংযোগ জন্মায়, তাহা কেবল ঐ দুইটি পরমাণুতেই জন্মায়— পশ্চিম, উত্তর প্রভৃতি দেশস্থ পরমাণুতে জন্মায় না। এইরূপ মধ্যস্থ পরমাণুটির অধঃস্থ পরমাণুটির সহিত যে সংযোগ উৎপন্ন হয়, তাহা কেবল ঐ দুইটি পরমাণুতেই উৎপন্ন হয়; অন্য কোনও পরমাণুতে হয় না। এইরূপ অন্যান্য ক্ষেত্রেও। সুতরাং মধ্যস্থ পরমাণুটির সহিত ছয়টি পরমাণুর সংযোগ ছয়টি ভিন্ন দেশস্থই, সমানদেশস্থ নহে। কিন্তু সেইজন্য পরমাণুটির যে ছয়টি অবয়ব আছে, ইহা যে ষড়ংশ, তাহা সিদ্ধ হয় না। কারণ, দ্রব্যের সংযোগী হওয়া, তাহার সাবয়ব হওয়ার উপর নির্ভর করে না। গগনে যুগপৎ লক্ষ লক্ষ সংযোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু সেইজন্য বলা চলে না যে গগনের লক্ষ লক্ষ অবয়ব আছে। আরও দেখ, ঐ মধ্যস্থ পরমাণুতে ছয়টি পরমাণুর যুগপৎ সংযোগ একই স্থানে উৎপন্ন হয়, ইহাও যদি বলা যায় তাহা হইলেও আপত্তির কিছু থাকিতে পারে না বা পিণ্ডটি অণুমাত্রক হইয়া যায় না। কারণ, সংযোগগুলি সমানদেশস্থ হইলেও পরমাণুসমূহ সমানদেশস্থ হয় না। অতএব, নিরবয়ব পরমাণুর সংযোগের উপপত্তি নাই, এই কথা অশ্রদ্ধেয়।

নিরবয়ব পরমাণুর সংযোগের উপপত্তি যে হয় তাহা আমরা দেখিলাম। এখন দেখা যাউক যে, নিরবয়ব মধ্যস্থ পরমাণু দুইটি পার্শ্বস্থ পরমাণুর ব্যবধায়ক হইতে পারে কিনা। আমরা দেখিয়াছি যে, পূর্বপক্ষী আচার্যগণের মতে কোনও পরমাণুর দুই দিক হইতে দুইটি পরমাণু আসিয়া যখন তাহার সহিত সংযুক্ত হয় তখন ঐ পরমাণুটি আগন্তুক পরমাণু দুইটির ব্যবধায়ক হয় এবং সেইজন্য বলিতে হয় যে,

মধ্যস্থ পরমাণুর (তথা সকল পরমাণুর) পূর্ব ও পর বলিয়া দুইটি ভাগ আছে বা পরমাণু নিরবয়ব নহে। এইরূপ পূর্বপক্ষের উত্তরে ন্যায়াচার্যগণ যাহা বলিয়া থাকেন তাহার সারমর্ম এইরূপ : ব্যবধায়ক হইতে হইলেই যে, সাবয়ব হইতে হইবে এমন কোন কথা নাই। মধ্যস্থ কোনও দ্রব্য তাহার উভয় পার্শ্বস্থ দ্রব্যের ব্যবধায়ক হইয়া থাকে। এখন, প্রশ্ন এই যে ইহা সাবয়ব বলিয়াই এইরূপ হইয়া থাকে, অথবা স্পর্শ-বিশিষ্ট বলিয়াই এইরূপ হইয়া থাকে? আমার আসনটি ভূতল ও আমার মধ্যে ব্যবধান রচনা করে। কিন্তু ইহা সাবয়ব বলিয়াই এইরূপ করে, না স্পর্শবিশিষ্ট বলিয়াই এইরূপ করে? বিচার করিয়া দেখা যাউক। প্রথম দৃষ্টিতে উভয় পক্ষই যে যুক্তিসহ ইহাই মনে হয়। কারণ, আমরা যে সকল ব্যবধায়ক পদার্থ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, তাহারা সকলেই সাবয়ব এবং স্পর্শবান্। উপরন্তু যাহা স্পর্শবিশিষ্ট নহে, তাহা ব্যবধায়ক হয় না, যেমন আকাশ, এইরূপ অনুমানের সাহায্যে ব্যবধায়কত্ব যে স্পর্শবত্ব প্রযুক্ত ইহা দেখাইব, তাহা হইবে না। কারণ, যাহা সাবয়ব নহে, তাহা ব্যবধায়ক নহে, যেমন আকাশ, এইরূপ অনুমানও সম্ভব। সুতরাং পরমাণু সাবয়ব বলিয়া ব্যবধায়ক, না স্পর্শবান্ বলিয়া ব্যবধায়ক, এই প্রশ্নের উত্তর সহজে লাভ করা যায় না। উত্তর পাইতে হইলে আমাদের মনে রাখিতে হয় যে, পরমাণুর সাধক প্রমাণ আছে। অর্থাৎ পরমাণুর সাধক বলবান্ প্রমাণ রহিয়াছে বলিয়া আমাদের বলিতে হয় যে, কোনও দ্রব্য সাবয়ব বলিয়া ব্যবধায়ক হয় না, স্পর্শ-বিশিষ্ট বলিয়াই হয়। অন্যরূপে প্রকাশ করিয়া বলা যায় যে, বিভাজ্য অবয়বীর বিভাগ অনন্তও হইতে পারে না, প্রলয়ান্তও হইতে পারে না। ইহাকে পরমাণ্বন্তই বলিতে হয়। অতএব এখন, যখন পরমাণু ব্যবধায়ক হইতে পারে বলিয়া সাবয়ব এইরূপ কথা উঠিতেছে, তখন আমরা বলিতে পারি যে, সাবয়ব বলিয়া নহে, স্পর্শবিশিষ্ট বলিয়াই পরমাণু বা যে কোন দ্রব্য ব্যবধায়ক হয়। অবশ্য সাবয়ব না হইলে ব্যবধায়ক হওয়া যায় না, এইরূপ কথা যদি নিঃসন্দেহে বলা যাইত, তাহা হইলে আমরা আর বলিতে পারিতাম না যে, পরমাণু ব্যবধায়ক হইলেও সাবয়ব নহে। কিন্তু কোনও দ্রব্য স্পর্শবিশিষ্ট বলিয়াই ব্যবধায়ক, না সাবয়ব বলিয়া ব্যবধায়ক, তাহা তুমিও বলিতে পারিতেছ না আমিও বলিতে পারিতেছি না। উপরন্তু আমি নিরবয়ব পরমাণুর স্বপক্ষে প্রমাণ উপন্যস্ত করিতে পারিতেছি। অতএব, পরমাণু যে স্পর্শবিশিষ্ট বলিয়াই ব্যবধায়ক হইতে পারে তাহা বলিব না কেন? আরও দেখ, পরমাণুকে সাবয়ব বলিলে কি বিশেষ বিপদে পড়িতে হয় না? সাবয়ব বলিলেই বলিতে হয় যে, পরমাণু কার্যদ্রব্য বা ইহার উপাদান কারণ আছে। কিন্তু কাহাকে ইহার উপাদান কারণ বলিব? আমাদের অবশ্যই বলিতে হয় যে

প্রত্যেকটি পরমাণুই তাহার পূর্বজাত অপর কোন পরমাণুর কার্য। কিন্তু এইরূপ কার্য একান্ত অপ্রসিদ্ধ। আমরা এমন কোনও কার্য দেখি নাই যাহার উপাদান কারণ বা অবয়ব একটি মাত্র দ্রব্য। বস্তুতঃ এইরূপ কোনও কার্য হইতেই পারে না। কোনও কার্য একটি মাত্র উপাদান কারণ হইতে উৎপন্ন হয় ইহা বলাও যাহা, আর ঐ কার্যের কোন প্রাগভাব নাই ইহা বলাও তাহা। বস্ত্রের প্রাগভাগ আছে, কারণ কোনও একটি সুতা হইতে বস্ত্র উৎপন্ন হয় না। যতক্ষণ পর্যন্ত না বস্ত্রের উপাদান কারণগুলি এক বিশেষভাবে তন্তুবায় কর্তৃক পরস্পর সংযুক্ত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত বস্ত্রের উৎপত্তি হয় না. এবং সুতাতে বস্ত্রের প্রাগভাব থাকিয়া যায়। সুতরাং কোনও একটি পরমাণু যদি তাহার পূর্বজাত অপর একটি পরমাণু উপাদানক হয়, তাহা হইলে তাহার কোনও প্রাগভাব থাকিতে পারে না, এবং যাহার প্রাগভাব নাই তাহা কায হইবে কিরূপে? অতএব পরমাণুকে কার্য বলা, উৎপাদশীল পদার্থ বলা যায় না। ইহাকে নিত্যদ্রব্যই বলিতে হয়। সুতরাং তাহাকে নিরবয়বও বলিতে হয়, এবং সেইজন্যই তাহার ব্যবধায়কত্ব যে স্পর্শবিশিষ্ট হওয়ার জন্য, ইহা বলাই কর্তব্য। সংক্ষেপে পরমাণু ব্যবধায়ক হইতে পারে বলিয়া ইহাকে যে সাবয়ব বলিব তাহা হইবে না।

এইরূপ ছায়া আবরণ প্রভৃতির উপপত্তির জন্য পরমাণুর দিগ্‌ভাগভেদ আছে ইহা যে বলিব তাহা হইবে না। কারণ, পরমাণুর প্রকৃতই কোন দিগ্‌ভাগভেদ নাই। নিরবয়ব আকাশে যেমন গৌণ প্রদেশ ব্যবহার আছে, পরমাণুতেও তেমনই গৌণ দিগ্‌ভাগভেদ আছে। অর্থাৎ সকল দিকের সহিতই পরমাণুর সংযোগ আছে, এবং ঐ সকল সংযোগকেই পরমাণুর দিগ্‌ভাগভেদ বলিয়া কল্পনা করিয়া পরমাণুর যে দিগ্‌ভাগভেদ আছে, তাহা বলা হয়। কিন্তু সংযোগী হইতেই হইলেই সাবয়ব হইতে হয় না বলিয়া এই দিগ্‌ভাগভেদ ব্যবহার গৌণ বা কল্পিত। মুখ্যতঃ পরমাণুর এইরূপ কোনও ভাগ নাই। কোনও পরমাণুর প্রাচ্যাদি ব্যপদেশের অর্থ ই হইল এই যে ঐ পরমাণুটি প্রতীচ্যাদি অসংযোগী হইয়াও, প্রাচ্যাদি সংযোগী। সংক্ষেপে, পরমাণুতে প্রাচ্যাদির ব্যবহার পরমাণু যে সাবয়ব, তাহা বুঝায় না। এইরূপ, ছায়া ও আবরণের উপপত্তির জন্য পরমাণুকে সাবয়ব বলিবার প্রয়োজন নাই। কারণ, পরমাণু মূর্ত বা পরিচ্ছিন্ন পরিমাণ বিশিষ্ট এবং স্পর্শবিশিষ্ট বলিয়াই যে ছায়া ও আবরণ হয় তাহা বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ, ছায়া ও আবরণের জন্য পরমাণুর অবয়ব কল্পনার কোনও প্রয়োজন নাই। ইহারা অবয়বের অপেক্ষা করে না। আবরক দ্রব্যগুলি যে মূর্ত এবং স্পর্শবিশিষ্ট ইহা আমরা দেখিয়া থাকি। সুতরাং বলিতে পারি যে মূর্তত্ব ও স্পর্শতত্ত্ব প্রযুক্তই আবরণ হইয়া থাকে। ছায়ার ক্ষেত্রেও এইরূপ

কথা বলা যায়। ছায়া যদি প্রামাণিক হয়, অর্থাৎ পরমাণুতে ছায়া আছে বা ছায়া পরমাণু প্রযুক্ত ইহা যদি প্রমাণসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে পরমাণুতে তেজোগতি প্রতিবন্ধক কোনও সংযোগ বিশেষ উৎপন্ন হওয়ার জন্যই যে তাহা হয় ইহা বলা যায়। অতএব, ছায়ার উপপত্তির জন্য পরমাণুর যে অবয়ব আছে, তাহা বলার কোনও প্রয়োজন নাই।

অতএব পরমাণু সাবয়ব নহে। ইহা নিরবয়ব। অনেক নহে, এক। সাংশ নহে, নিরংশ। ইহাকে গগন কুসুমের মত অলীক বলা অর্থহীন। পূর্বপক্ষীগণ ইহাকে অলীক বলেন, এবং সেইজন্য বিভাজ্য অবয়বীর বিভাগ যে প্রলয়ান্ত, বা সুমেরু ও সর্ষপের বিষম পরিমাণত্বের ব্যবহার যে অনাদি অজ্ঞান জন্য ইত্যাদি কথা বলিয়া থাকেন। কিন্তু এইরূপ কথা বলার কোনও অর্থ নাই। কোনও বিভাগই নিরাধার নহে। এবং যে অনুভবের উপর নির্ভর করিয়া আমাদের লৌকিক ব্যবহার চলিতেছে তাহা যে অনাদি অজ্ঞান জন্য, এইরূপ কথা বলিবার অর্থ কি? অনেক দর্শনে ব্যবহারিক সত্তা হইতে পারমার্থিক সত্তাকে পৃথক করা হয়। কিন্তু এইরূপ স্বীকৃতির ফলে সমস্যা বাড়িয়াই যায়। এই সকল দর্শনে অস্থির পরিবর্তনশীল পদার্থগুলিকে সৎ বলিয়া স্বীকারও করা হয় না, আবার অলীকও বলা হয় না। এইজন্যই বলা হয় যে, তাহাদের পারমার্থিক সত্তা নাই, কিন্তু ব্যবহারিক সত্তা আছে। কিন্তু অনিত্য হইলে যে সৎ হওয়া চলিবে না, তাহা কে বলিল? যাহা সৎরূপে প্রতীয়মান হয়, যথার্থ জ্ঞানে ভাসমান হয় (এবং যাহা যথার্থ জ্ঞানে ভাসমান হয় না, তাহা অযথার্থ জ্ঞানেও ভাসমান হয় না), তাহাকে সৎ বলিব না কেন? এবং কোনও জ্ঞান যথার্থ কিনা তাহা যখন শেষ পর্যন্ত ব্যবহারের দ্বারাই স্থির করিতে হয়, তখন ব্যবহারসিদ্ধ সত্তা অতিক্রান্ত কোনও সত্তা স্বীকার করিতে যাইব কেন? সংক্ষেপে, এই জগৎ অনির্বাচ্য, শূন্যতাই সত্য, প্রপঞ্চের স্বরূপ নিরূপণ করা যায় না, ইত্যাদি কথাকে যেরূপ অনুভবের উপর নির্ভর করিয়া আমরা লোকযাত্রা নির্বাহ করিয়া থাকি, সেইরূপ অনুভবের সহিত মিলাইতে পারা যায় না, এবং এই অনুভবের অপলাপ অসম্ভব বলিয়া আমরা এই সকল কথা গ্রহণও করিতে পারি না। আমাদের বলিতে হয় যে, সুমেরু ও সর্ষপের বিষম পরিমাণত্বের ব্যবহার কাল্পনিক নহে, সত্য। সুতরাং বিভাজ্য অবয়বীর বিভাগ অনন্তকাল ধরিয়া চলিতে পারে না। আবার নিরাধার বিভাগ অপ্রসিদ্ধ বলিয়া এই বিভাগ প্রলয়ান্তও হইতে পারে না। অতএব, আমাদের বলিতে হয় যে, পরমাণুতেই এই বিভাগ বিশ্রাম পায়। লৌকিক ব্যবহারের ভিত্তিরূপ অনুভবকে অবলম্বন করিয়া যে দার্শনিক বিচার করা হয়, পরমাণুবাদ সেই বিচারসিদ্ধ।

আকর গ্রন্থপঞ্জী

পূর্বপক্ষ :— (১) বিংশতিকা কারিকা ১১-১৪, বৃত্তিসহ।
(২) তত্ত্বসংগ্রহ (গাইকোয়াড়) ৫৫৬ পৃঃ পঞ্জিকাসহ।
(৩) সর্বদর্শন সংগ্রহ—বৌদ্ধদর্শন-দর্শনাঙ্কুর টীকাসহ।
(৪) সাংখ্যসূত্র—৫।৮৭-৮৮, বৃত্তিসহ।
(৫) ব্রহ্মসূত্র—২।২।১২-১৭ শাঙ্কর ভাষ্য, ভামতীসহ।

সিদ্ধান্ত পক্ষ :—(১) ন্যায়সূত্র—৪।২।১৬, ভাষ্য, বার্তিক, টীকা, তর্কবাগীশকৃত টিপ্পনী সহ।
(২) আত্মতত্ত্ব বিবেক দীধিতসহ।
(৩) সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী।

প্রথম খণ্ড। ষষ্ঠ অধ্যায়

ঈশ্বরানুমান

আমরা দেখিয়াছি যে, ন্যায়মতে ক্ষিতি প্রভৃতি পরমাণু জগতের উপাদান বা সমবায়ী কারণ এবং ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ। এখন, বিচার করিয়া দেখা যাউক যে, ঈশ্বরকে জগতের কারণরূপে কল্পনা করিবার কোনও প্রয়োজন আছে কি না। অর্থাৎ, ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে যে,

সূচনা

জগৎ প্রকৃতির পরিণাম বা ব্রহ্মের বিবর্ত নহে। এইরূপ, ইহাও স্বীকার করা যাইতে পারে যে, অচেতন জড় বা ক্ষিতি প্রভৃতি পরমাণু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া জগৎ উৎপন্ন করে নাই। কিন্তু সেইজন্য আমরা ঈশ্বরকে কারণ বলিয়া কল্পনা করিব কেন? যখন কোন কিছুর উপপত্তির জন্য অপর কিছুকে কারণ বলিয়া কল্পনা করা হয়, তখন সেই অপর কিছুটির ইহার কারণরূপে প্রসিদ্ধি না থাকিলেও সৎ পদার্থরূপে বা বাস্তব পদার্থরূপে প্রসিদ্ধি থাকে। যেমন, যখন আমি বিসূচিকা নামক রোগের কারণরূপে একপ্রকার বীজাণুকে, কমা বীজাণুকে, কল্পনা করি তখন আমার কল্পনা অলীক কবি কল্পনা হয় না, কারণ কমা বীজাণুর বিসূচি-কার কারণরূপে প্রসিদ্ধি না থাকিলেও সৎ পদার্থরূপে প্রসিদ্ধি আছে। আমি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে রোগীর মল মূত্র প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়াছি এবং দেখিয়াছি যে তথায় এই বীজাণু উপস্থিত আছে। তাহার পর এই প্রসিদ্ধ পদার্থ-টিকেই আমি বিসূচিকার কারণ বলিয়া কল্পনা করিয়াছি। এইরূপ, ঈশ্বরকে যখন জগতের কারণ বলিয়া কল্পনা করা হইতেছে তখন বুঝিতে হইবে যে ঈশ্বর প্রসিদ্ধ পদার্থ—জগতের কারণরূপে তাঁহার প্রসিদ্ধি না থাকিলেও বস্তু বলিয়া তাঁহার প্রসিদ্ধি আছে। কিন্তু সত্যই ঈশ্বরের এইরূপ কোনও প্রসিদ্ধি আছে কি? অবশ্যই নাই। তাহা যদি থাকিত, তাহা হইলে অনেক আচার্য ঈশ্বর যে প্রমাণের অভাবে অসিদ্ধ এইরূপ কথা বলিতে পারিতেন না। সুতরাং ঈশ্বরকে জগতের কারণ বলিয়া কেন কল্পনা করিব? ইহা অবশ্য সত্য, যে অনেক সময় অপ্রসিদ্ধ পদার্থকেও কারণ বলিয়া কল্পনা করা হয়। কিন্তু ইহা আরও সত্য যে, যাহার উপপত্তির জন্য ইহাকে কারণরূপে কল্পনা করা হয়, তাহার কারণরূপেই যে ইহা প্রসিদ্ধ নহে অন্যরূপ প্রসিদ্ধিও যে ইহার আছে ইহা যতদিন পর্যন্ত না দেখা যায়, ততদিন পর্যন্ত ঐ কারণ কল্পনাকে বিশেষ মূল্য দেওয়া যায় না। যেমন, আমি বিসূচিকা রোগের কারণ

নির্ণয়কালে কমা বীজাণু বলিয়া একপ্রকার বীজাণু আছে তাহা না জানিতে পারি। কমা বীজাণু আমার নিকট একটি অত্যন্ত অপ্রসিদ্ধ পদার্থ হইতে পারে। কিন্তু তথাপি আমি কল্পনা করিতে পারি যে কোনও বীজাণুই এই রোগের কারণ। এখন, আমার এই কল্পনা প্রকৃত বৈজ্ঞানিক কল্পনা হইবে তখনই যখন আমি কমা বীজাণুকে অণুবীক্ষণের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করিব। অথবা, এই বীজাণু যদি পরমাণুর ন্যায় প্রত্যক্ষের একান্ত অবিষয় হয়, তাহা হইলে যে অনুমান বিসূচিকার কার্যত্বকে হেতু করে না, সেই অনুমানের সাহায্যে ইহার অস্তিত্ব প্রমাণিত করিতে পারিব। সুতরাং ঈশ্বর অপ্রসিদ্ধ হইলেও তাঁহাকে কারণরূপে কল্পনা করা সঙ্গত হইতে পারে, যদি কারণরূপে কল্পনা করার পর তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায় বা জগতের কার্যত্বকে যে অনুমান হেতু করে না সেই অনুমানের সাহায্যে তাঁহার অস্তিত্ব সিদ্ধ করা হয়। কিন্তু এইরূপ কোন প্রত্যক্ষ বা অনুমান আছে কি? নাই এবং থাকিতেও পারে না— ইহাই পূর্বপক্ষী আচার্যগণের এই প্রশ্নের উত্তর। সুতরাং ন্যায়াচার্যগণের এই প্রসঙ্গে কি বলিবার আছে, তাহা আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

ন্যায়াচার্যগণের প্রধান বক্তব্য এই যে, ঈশ্বরকে যখন অনুমানের সাহায্যে কারণ বলিয়া সিদ্ধ করা হয়, তখন ঈশ্বর যে জগতের কর্তা, তাহাই প্রমাণিত হয় না, তিনি যে অলীক নহেন, সদ্বস্তু তাহাও সিদ্ধ হয়। কারণ, কোনও অলীক পদার্থই কারণ হইতে পারে না। গগন কমল কোনও অনুভূত গন্ধের কারণ নহে, বন্ধ্যাসুত কোনও পুত্রের জনক নহে। আমরা যখন ঈশ্বরকে জগতের কর্তা বলিয়া প্রমাণ করি, তখন তিনি যে সদ্বস্তু তাহাও প্রমাণ করি। পূর্বপক্ষী আচার্যগণ অবশ্য বলিয়া থাকেন যে যে অনুমানের সাহায্যে ঈশ্বরকে জগতের কারণ বলিয়া প্রমাণ করা হয় সেই অনুমান ভিন্ন অন্য কোনও অনুমান বা প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণের সাহায্যে ঈশ্বর যে সদ্বস্তু তাহা প্রমাণিত করিতে হইবে। কিন্তু তাহাদের এইরূপ উক্তির একমাত্র কারণ এই যে, ঈশ্বরানুমানের প্রকৃত রহস্যটি তাঁহারা ধরিতে পারেন না। তাঁহারা দেখিতে পান না যে, এই অনুমানের প্রকৃত বক্তব্য এই নহে যে, ঈশ্বর জগতের কর্তা। ইহার বক্তব্য হইল এই যে, জগৎ নামক মহাকার্যের একজন উপাদান অভিজ্ঞ কর্তা আছে, এবং যিনিই সেই কর্তা, তিনিই ঈশ্বর। অতএব, যে অনুমানের দ্বারা ঈশ্বরকে জগতের কর্তা বলিয়া প্রমাণ করা হয়, সেই অনুমানের দ্বারাই তিনি যে সদ্বস্তু তাহাও প্রমাণ করা হয়। বস্তুতঃ এই ঈশ্বরানুমানটি ঈশ্বরের কারণতা সিদ্ধির অনুমান নহে, ইহা প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর সিদ্ধিরই অনুমান; এবং ন্যায়দর্শনে এইরূপ

ঈশ্বরানুমান রহস্য।

অন্ততঃ আরও সাতটি অনুমানের উপন্যাস করা হয়। আমরা ক্রমে ক্রমে তাহাদের সকলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি।

(ক) যেমন ঘট নামক কার্যটি সকর্তৃক, ক্ষিতি, অঙ্কুর প্রভৃতিও তেমনই কার্য বলিয়া সকর্তৃক ; এবং তোমার আমার মত কোনও জীব এই কর্তা হইতে পারে না বলিয়া, যিনি এই কর্তা, তিনিই ঈশ্বর। ইহাই ন্যায়-দর্শনে ঈশ্বরসাধক প্রথম অনুমান, এবং ন্যায়াচার্যগণের মতে এই অনুমানটি নির্দোষ বা সদ্ধেতুক। অর্থাৎ, কোনও হেতুর যদি পক্ষে সত্তা, সপক্ষে সত্তা, বিপক্ষে অসত্তা, অসৎপ্রতিপক্ষত্ব এবং অবাধিতত্ব, এই পাঁচটি ধর্ম থাকে, তাহা হইলে সেই হেতুকে সদ্ধেতু বলা হয়। যেমন, পর্বত রন্ধনশালার ন্যায় ধূমবান বলিয়া বহ্নিমান্, এই অনুমানের হেতু ধূম একটি সদ্ধেতু। ইহার এই পাঁচটি ধর্ম আছে। পর্বতে বা পক্ষে ধূম আছে—সুতরাং হেতুর পক্ষে সত্তা আছে। সাধ্য বহ্নি যাহাতে আছে সেই রন্ধনশালায় অর্থাৎ সপক্ষেও, ধূম আছে ; সুতরাং হেতুর সপক্ষেও সত্তা আছে। এইরূপ সাধ্য বহ্নি যাহাতে নিশ্চয়ই নাই, সেই হ্রদাদিতে অর্থাৎ বিপক্ষে ধূমও নাই—সুতরাং হেতুর বিপক্ষে অসত্তাও আছে। পুনরায়, পর্বতে যখন ধূমের জ্ঞান হইতেছে তখন তথায় বহ্নির অভাব সাধন করিতে পারে এইরূপ কোনও তুল্যবল বিরোধী হেতুর জ্ঞান হইতেছে না। সুতরাং এই হেতুর অসৎ প্রতিপক্ষত্ব ধর্মও আছে। এবং পর্বতে যে বহ্নি নাই, ইহা কোনও বলবান্ প্রমাণের দ্বারা নির্ণীত হয় নাই—সুতরাং এই হেতুর অবাধিতত্ব ধর্মও আছে। সংক্ষেপে, যে হেতুর পক্ষে সত্তা প্রভৃতি পাঁচটি ধর্ম থাকে, সেই হেতুকে সদ্ধেতু বলা হয়। এখন, প্রথম ঈশ্বরানুমানটির হেতু কার্যত্বের এই পাঁচটি ধর্ম আছে। যেমন, ক্ষিতি, অঙ্কুর প্রভৃতি পক্ষে কার্যত্বরূপ হেতুটি রহিয়াছে। পর্বত যেমন ধূমবান্, ক্ষিতি প্রভৃতিও ঠিক তেমনই কার্য, অর্থাৎ কার্যত্ববান্। সুতরাং এই হেতুটির পক্ষে সত্তা আছে। এইরূপ এই হেতুর সপক্ষে সত্তাও আছে। নিশ্চিত সাধ্যবান্ ঘটাদিতে কার্যত্বরূপ হেতুটি রহিয়াছে। বিপক্ষে অসত্তাও এই হেতুর রহিয়াছে। নিত্য আকাশাদি পদার্থ সকর্তৃক নহে এবং কার্যও নহে। এইরূপ, এই হেতুর তুল্যবল বিরোধী অন্য কোন হেতুর জ্ঞান ক্ষিতি প্রভৃতিতে হয় না। সুতরাং এই হেতুটি অসৎপ্রতিপক্ষত্বরূপ ধর্মবিশিষ্টও বটে। এবং ক্ষিতি প্রভৃতি যে সকর্তৃক নহে তাহাও কোন বলবান্ প্রমাণের সাহায্যে জানা হয় নাই। সুতরাং এই হেতুটির অবাধিতত্ব-রূপ ধর্মও রহিয়াছে। অতএব, এই হেতুটি একটি সদ্ধেতু, এবং এই অনুমানটি একটি সদ্ধেতুক, বা উত্তম অনুমান। ক্ষিতি প্রভৃতি কোনও কর্তা জন্য। এখন, যেমন ঘটের কর্তা কুম্ভকারের ঐ কার্যের উপাদান কারণ কপালের প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকে, এবং ঘট

কার্যত্বহেতুক ঈশ্বরানুমান।

উৎপাদন করিবার ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি থাকে, ঠিক তেমনই প্রত্যেক কার্যেরই যিনি কর্তা হন, তাঁহার ঐ কার্যের উপাদান কারণের প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকে, এবং কার্য উৎপাদন করিবার ইচ্ছা (চিকীর্ষা) ও প্রবৃত্তি (যত্ন) থাকে। এবং তোমার আমার মত অল্পজ্ঞ জীবের, ক্ষিতি অঙ্কুর প্রভৃতি যে যে উপাদানে গঠিত সেই সেই উপাদানের কোনও প্রত্যক্ষ জ্ঞান নাই। উপরন্তু, আমরা ক্ষিতি প্রভৃতি কার্য উৎপন্ন করিতে ইচ্ছা এবং যত্ন করিলেও উৎপন্ন করিতে পারি না। আরও দেখ, আমাদের ইচ্ছা এবং যত্ন ভিন্নও ক্ষিতি প্রভৃতি পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং আমাদের মত অল্পজ্ঞ জীব এই মহাকার্যের কর্তা হইতে পারে না। অতএব, সর্বজ্ঞ ঈশ্বরই যে এই কর্তা, তাহা বলিতে হয়। বা, জগৎ নামক মহাকার্যের যিনি কর্তা, তিনি সর্বজ্ঞ ঈশ্বরই, ইহা বলিতে হয়। ইহাই ন্যায় দর্শনে ঈশ্বরসাধক প্রথম অনুমান।

(খ) আমাদের চেষ্টা নামক শরীর ক্রিয়া যেমন চেতন প্রযত্নপূর্বক, সৃষ্টির সর্বপ্রথম দ্ব্যণুকের আরম্ভক সংযোগের অনুকূল ক্রিয়াও, ঠিক তেমনই ক্রিয়া বলিয়া চেতন-প্রযত্নপূর্বক, এবং অল্পজ্ঞ জীব এই প্রযত্নের আশ্রয় হইতে পারে না বলিয়া ঈশ্বরই ইহার আশ্রয়।

ক্রিয়াত্ব হেতুক অনুমান।

অর্থাৎ, অসর্বগত দ্রব্যেরই ক্রিয়া হইতে পারে, এবং অচেতন বলিয়া কোনও চেতনের প্রযত্ন ভিন্ন অসর্বগত দ্রব্যগুলির কোনও ক্রিয়া হইতে পারে না। সুতরাং যেখানেই ক্রিয়াত্ব আছে, সেইখানেই চেতন-প্রযত্ন-পূর্বকত্ব আছে। ক্রিয়াত্ব দ্ব্যণুকের আরম্ভক সংযোগের অনুকূল ক্রিয়াতে আছে। অতএব চেতন-প্রযত্ন-পূর্বকত্বও তাহাতে আছে। কোনও চেতন প্রযত্নবান্ই ঐ ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিয়াছেন। এখন, তোমার আমার মত অল্পজ্ঞ জীব যে ইহা করে নাই, তাহা বলিবার প্রয়োজন হয় না। সুতরাং এই প্রযত্নের আশ্রয়স্বরূপ ঈশ্বর আছেন। ইহাই ন্যায়দর্শনে দ্বিতীয় ঈশ্বরানুমান। এবং ইহাও একটি সদ্ধেতুক অনুমান। কারণ, ইহার হেতুর, ক্রিয়াত্বের, পক্ষে অর্থাৎ সৃষ্টির সর্বপ্রথম দ্ব্যণুকের আরম্ভক সংযোগের অনুকূল ক্রিয়াতে, বিদ্যমানতা আছে। এইরূপ, সপক্ষে, যেমন চেষ্টারূপ শরীর ক্রিয়াতে ইহার সত্তা আছে। পুনরায়, আকাশের পরিমাণরূপ নিত্যগুণে, চেতন-প্রযত্নপূর্বকত্ব নাই, সুতরাং হেতুর বিপক্ষে সত্তাও নাই। এইরূপ, এই হেতু অসৎপ্রতিপক্ষিতও বটে। কারণ, ইহার তুল্যবল বিরোধী অন্যকোন হেতুর জ্ঞান পক্ষে হয় না। এবং এই হেতুটি অবাধিতও বটে, কারণ পক্ষে সাধ্যাভাব কোন বলবান্ প্রমাণের দ্বারা নির্ণীত হয় নাই।

(গ) যেমন উড্ডীয়মান বিহঙ্গম-ধৃত কাষ্ঠখণ্ডটি গুরুভার হইলেও প্রযত্নবান্ বিহঙ্গম কর্তৃক ধৃত হয় বলিয়া পড়িয়া যায় না, ঠিক তেমনই ব্রহ্মাণ্ড সকল গুরুভার

হইলেও নিজ নিজ স্থানে আবর্তিত হইতে থাকে বলিয়া বা পড়িয়া যায় না বলিয়া নিশ্চয়ই কোন প্রযত্নবানে আশ্রিত ; এবং অল্পজ্ঞ জীব এইরূপ প্রযত্নবান্ হইতে পারে না। অতএব যিনি এই প্রযত্নের আশ্রয় তিনিই ঈশ্বর। এই অনুমানটিও একটি সদ্ধেতুক অনুমান। ইহার পক্ষ ব্রহ্মাণ্ড সকল, এবং হেতু পতনাভাব বা ধৃতি। এই হেতুর পক্ষে সত্তা আছে, কারণ ব্রহ্মাণ্ড সকল নিজ নিজ স্থানে আবর্তিত হয়। এইরূপ, সপক্ষে অর্থাৎ প্রযত্নবানে আশ্রিত বিহঙ্গম ধৃত কাষ্ঠখণ্ডেও, ইহার বৃত্তি আছে। বিপক্ষে, অর্থাৎ পতনশীল কোনও লোষ্ট্রখণ্ডে, ইহার সত্তা নাই। পুনরায়, ব্রহ্মাণ্ড সকলে এমন কোন হেতুর জ্ঞান হয় না যাহা তথায় সাধ্যাভাব সাধন করিতে পারে। এবং পক্ষে সাধ্যাভাবের নিশ্চয়ও আমাদের হয় না। সংক্ষেপে, গুরুভার দ্রব্য যদি কোনও প্রযত্নবান্ কর্তৃক ধৃত না হয়, তাহা হইলে পড়িয়া যায়। ব্রহ্মাণ্ড সকল যে গুরুভার তাহাতে সন্দেহ নাই ; এবং ইহারা যে পড়িয়া না গিয়া নিজ নিজ স্থানে আবর্তিত হইতে থাকে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। সুতরাং নিশ্চয়ই ইহারা কোনও প্রযত্নবানে আশ্রিত হয়। কিন্তু অল্পজ্ঞ জীব এইরূপ প্রযত্নবান্ হইতে পারে না। অতএব, যিনি এই প্রযত্নের আশ্রয়, তিনিই ঈশ্বর। ইহাই ন্যায়দর্শনে ঈশ্বর সাধক তৃতীয় অনুমান।

ধৃতি হেতুক অনুমান।

(ঘ) ঘট কথাটি শুনিতে বা দেখিতে ঘট পদার্থের মত নহে, অথচ, ঘট পদার্থটিকে বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু কি করিয়া বুঝায় ? ধূম বহ্নিকে বুঝাইয়া থাকে। কারণ, ধূমের সহিত বহ্নির স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে। কিন্তু শব্দ ঘট বা কোনও শব্দের সহিতই অর্থ ঘট, বা কোনও শব্দিত পদার্থেরই স্বাভাবিক সম্বন্ধ নাই। তাহা হইলে কোনও শব্দ কি করিয়া শব্দিত অর্থকে বুঝায় ? ঘট শব্দটি শুনিলে আমরা কি করিয়া ঘট পদার্থটিকে বুঝি ? না, ঐ শব্দটিকে ঐ অর্থ বুঝাইতে ব্যবহার করা হয় বলিয়া। কিন্তু ঐ অর্থ বুঝাইতেই যে ব্যবহার করা হয়, তাহা আমরা কি করিয়া বুঝি ? না, আমরা সমাজে বাস করি, এবং সমাজবৃদ্ধগণ আমাদের ইহা বুঝাইয়া দেন। যেমন, আমাকে কেহ ঘট দেখাইয়া বলিল যে, ইহাকে ঘট বলে ; আমি ঘট পদটি কোন পদার্থকে বুঝায় তাহা বুঝিলাম। কিন্তু আমাকে যাঁহারা পদ ব্যবহার শিখাইলেন, তাঁহাদের কে শিখাইল ? বা প্রলয়ের পর যখন সৃষ্টি হয়, তখন কে পদব্যবহার শিখায় ? অবশ্যই যিনি শিখান তিনিই ঈশ্বর। অতএব, আমরা ঈশ্বর সাধক আর একটি অনুমান পাইলাম। যেমন আধুনিক লিপি ব্যবহার স্বতন্ত্র পুরুষের অধীন, ঠিক তেমনই ঘটাদি শব্দের প্রাথমিক ব্যবহার, ব্যবহার বলিয়া, স্বতন্ত্র পুরুষের অধীন। এই পুরুষ অল্পজ্ঞ জীব হইতে পারে না। সুতরাং যিনি সর্বপ্রথমে কোন্ পদ কোন পদার্থকে সঙ্কেতিত

ব্যবহারত্ব হেতুক অনুমান।

করে, ইহা অনুগ্রহ করিয়া বুঝাইয়াছেন তিনি ঈশ্বরই। ইহাই ন্যায়দর্শনে চতুর্থ ঈশ্বরানুমান, এবং সদ্ধেতুক।

(ঙ) আমি যখন রজতে রজত প্রত্যক্ষ করি, তখন আমার রজত জ্ঞানটি প্রমা বা যথার্থ হয়। কিন্তু আমি যখন অ-রজতে, অর্থাৎ শুক্তিতে রজত প্রত্যক্ষ করি, তখন আমার রজত জ্ঞানটি অ-প্রমা বা অ-যথার্থ হয়। এখন, আমরা যদি এই দুইটি জ্ঞানকে লইয়া সামান্য আলোচনা করি, তাহা হইলেই প্রমা জ্ঞান হইতে অ-প্রমা জ্ঞানের যে পার্থক্য কোথায় তাহা বুঝিতে পারি। দুইটি জ্ঞানেই রজতত্ব বিশেষণ বা প্রকাররূপে ভাসমান; দুইটি জ্ঞানই রজতত্ব প্রকারক। কিন্তু প্রথম স্থলে যাহা প্রকৃতই তৎ. অর্থাৎ রজতত্ব, বিশিষ্ট তাহাতেই, রজতেই, রজত জ্ঞান হইয়াছে। এবং দ্বিতীয় স্থলে যাহা অ-তদ্‌বতি, অর্থাৎ অ-রজতত্ব বিশিষ্ট, তাহাতেই, অ-রজতেই, রজত জ্ঞান হইয়াছে। তাহা হইলে প্রথম জ্ঞানটিকে প্রমা বলার অর্থ হইল এই যে, এই জ্ঞানটি তদ্‌বতি তৎপ্রকারক; এবং দ্বিতীয় জ্ঞানটিকে অ-প্রমা বলার অর্থ হইল এই যে, এই জ্ঞানটি অ-তদ্‌বতি তৎপ্রকারক। এখন, কোনও জ্ঞান যে তদ্‌বতি তৎপ্রকারক হয়, তাহা কি জ্ঞান বলিয়াই হয়? অর্থাৎ যে কারণ জন্য কোনও জ্ঞান উৎপন্ন হয়, ঠিক সেই কারণ জন্যই কি কোনও জ্ঞান প্রমা হইয়া থাকে? ন্যায়াচার্যগণের মতে এই প্রশ্নের উত্তর 'না'। তাঁহারা বলেন যে, জ্ঞানের কারণের অতিরিক্ত কারণের জন্যই কোনও জ্ঞান প্রমা হইয়া থাকে। যেমন, প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে কোনও অর্থের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইলেই প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইয়া থাকে; কিন্তু জ্ঞানটি প্রমা হয় তখনই, যখন জ্ঞানের বিশেষণাংশে যাহা ভাসমান হয়, সেই বিশেষণ বিশিষ্ট বিশেষ্যের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হয়। রজতত্ব বিশিষ্ট ইদং-এর সহিত যখন সন্নিকর্ষ হয়, তখনই ইহা রজত, এই জ্ঞানটি প্রমা হয়। ইন্দ্রিয়ের সহিত অর্থের সন্নিকর্ষ প্রত্যক্ষের কারণ, এবং বিশেষণ বিশিষ্ট বিশেষ্যের সন্নিকর্ষাত্মক গুণ, তাহার প্রমা হওয়ার কারণ। সংক্ষেপে ন্যায়মতে কোনও জ্ঞান তাহার কারণ গুণের জন্যই প্রমা হয়। এখন, কোনও বাক্য শ্রবণ করিয়া যখন কাহারও কোন জ্ঞান হয়, সেই শাব্দ, জ্ঞানের স্থলে, কিরূপ গুণ, ঐ জ্ঞানটির প্রমা হওয়ার কারণ হইতে পারে? মনে করা যাউক যে, কেহ আমায় বলিল যে, টিয়াপাখী লঙ্কা খায়। তাহার এই কথাটি শ্রবণের ফলে আমার একটি জ্ঞান হইল। কিন্তু আমার এই জ্ঞানটি প্রমা হইল কি? বা কি করিয়া প্রমা হইতে পারে? অবশ্যই যদি যিনি আমার নিকট এই জ্ঞানের জনকরূপে বাক্যটিকে উচ্চারণ করিয়াছেন, তিনি যদি ঐ বাক্যের অর্থটিকে অর্থাৎ টিয়াপাখী, লঙ্কা খাওয়া প্রভৃতিকে যথার্থরূপে বুঝিয়া এবং মোহ, প্রলোভন প্রভৃতির বশবর্তী

প্রমাত্ব হেতুক অনুমান।

না হইয়া বাক্যটির সুবক্তা হইয়া থাকেন, তাহা হইলেই আমার জ্ঞানটি প্রমা হইতে পারে। অতএব, ইহা বলা যায় যে, শাব্দ বোধ স্থলে বক্তার বাক্যার্থ বিষয়ক যথার্থ জ্ঞান পূর্বকত্বই গুণ। এখন, বেদবাক্য জন্য জ্ঞান প্রমা। সুতরাং যিনি বেদের বক্তা, তাঁহার যে অবশ্যই বেদার্থ বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান আছে, তাহা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত বেদরাশি যথার্থরূপে বুঝিয়া তাহার বক্তা হইবার সাধ্য কোন জীবের নাই। অতএব, ঈশ্বরকেই বেদবক্তা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, বলিতে হয় যে, যিনি বেদবক্তা তিনিই ঈশ্বর। তাহা হইলে আমরা ঈশ্বর সাধক আর একটি অনুমান পাইলাম। প্রত্যক্ষ প্রমাজ্ঞান যেমন কারণগুণ জন্য, ঠিক সেইরূপ বেদবাক্য জন্য প্রমাজ্ঞান প্রমা বলিয়া কারণগুণ জন্য, বেদবক্তার বেদার্থ বিষয়ক যথার্থ জ্ঞান জন্য, এবং জীবের পক্ষে এইরূপ জ্ঞানের অধিকারী হওয়া সম্ভব নহে বলিয়া, যিনি বেদবক্তা তিনিই ঈশ্বর। এই অনুমানটিও একটি সদ্ধেতুক অনুমান। ইহার হেতুরও পক্ষে সত্তা প্রভৃতি ধর্ম আছে।

(চ) ন্যায়াচার্যগণ সম্মত ঈশ্বর সাধক পাঁচটি অনুমান আমরা দেখিলাম। এখন আমরা ষষ্ঠ অনুমানটিকে দেখিবার চেষ্টা করিতে পারি। এই অনুমানটি নিম্নরূপ:

বেদত্বহেতুক অনুমান।

আয়ুর্বেদ নামক বেদটি যেমন পৌরুষেয় ঋগ্‌বেদাদি বেদও সেইরূপ বেদ বলিয়া পৌরুষেয়, কিন্তু এই বেদ-বক্তা পুরুষ অল্পজ্ঞ জীব হইতে পারে না; অতএব যিনি বেদবক্তা, তিনিই ঈশ্বর। এই অনুমানটিও একটি সদ্ধেতুক অনুমান। ইহার হেতু বেদত্ব, এবং পক্ষ ঋগ্‌বেদাদি। সুতরাং হেতুর পক্ষে সত্তা আছে। আয়ুর্বেদও বেদ, সুতরাং হেতুর সপক্ষে সত্তা আছে। বিপক্ষে সত্তা প্রভৃতিও ইহার আছে। অতএব, বেদের যে একজন বক্তা আছে তাহা স্থির। কিন্তু এই বক্তা কোন অল্পজ্ঞ জীব হইতে পারে না। অতএব, ঈশ্বরের সিদ্ধি হয়।

(ছ) যেমন, মহাভারতের বাক্যগুলি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কর্তৃক উচ্চারিত বা পৌরুষের, ঠিক তেমনই বেদ বা বেদবাক্যগুলিও বাক্য বলিয়া পৌরুষেয়, কিন্তু

বাক্যত্বহেতুক।

এই পুরুষ অল্পজ্ঞ জীব হইতে পারে না; অতএব বেদ-বক্তারূপে ঈশ্বরের সিদ্ধি হয়। ইহাই ন্যায় দর্শনে ঈশ্বর সাধক সপ্তম অনুমান, এবং সদ্ধেতুক অনুমান।

(জ) সৃষ্টির প্রথম দ্ব্যণুকের বা দুইটি পরমাণুর সংযোগে উৎপন্ন অবয়বীর অবশ্যই পরিমাণ আছে, কিন্তু এই পরিমাণের কারণ বলিয়া কাহাকে বুঝিব? প্রথমে মনে হইতে পারে যে, পরমাণুর পরিমাণই এই পরিমাণের কারণ। কিন্তু একটু বিচার করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, দ্ব্যণুকের পরিমাণের জনক পরমাণুর

পরিমাণ হইতে পারে না। কারণ, পরমাণুর পরিমাণের কোনও কারণতা নাই। অনিত্য দ্রব্যের পরিমাণ অনিত্য হয় বলিয়া এবং নিত্য দ্রব্যের পরিমাণ নিত্য হয় বলিয়া পরমাণুর পরিমাণ নিত্য—এবং আমরা কেহ কখনও দেখি নাই যে, নিত্য পরিমাণ কারণ হইয়াছে। যেমন আকাশের পরিমাণ নিত্য, কিন্তু ইহার কোনও কারণতা নাই। তেমনই পরমাণুর পরিমাণ নিত্য বলিয়া ইহাকে কোন কোন কিছুর কারণ, যেমন দ্ব্যণুকের পরিমাণের কারণ বলা যায় না। আরও দেখ, কারণপরিমাণ যেই শব্দের বাচ্য হয়, কার্যপরিমাণও সেই শব্দেরই বাচ্য হইয়া থাকে। যেমন মহৎ শব্দবাচ্য তন্তু-পরিমাণ হইতে যে বস্ত্ররূপ কার্যের পরিমাণ উৎপন্ন হয়, তাহাও মহৎ শব্দবাচ্য। অতএব, পরমাণুর পরিমাণ হইতে যদি দ্ব্যণুকের পরিমাণ উৎপন্ন হইত তাহা হইলে দ্ব্যণুকের পরিমাণকে অনুপরিমাণ না বলিয়া পরমাণু পরিমাণ বলিতে হইত। বস্তুতঃ, আমরা দেখিয়া থাকি যে, পরিমাণ মাত্রই সমজাতীয় উৎকৃষ্ট পরিমাণের জনক হইয়া থাকে। দুইটি মহৎ পরিমাণ কপাল হইতে একটি ঘট নির্মাণ করিলে ঘটটির পরিমাণ কপাল দুইটির পরিমাণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মহৎ বা বড় হয়। এখন, দ্ব্যণুকের পরিমাণের কারণ বলিয়া যদি পরমাণুর পরিমাণকেই স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে অবশ্যই আপত্তি হইবে যে দ্ব্যণুক পরমাণু হইতে সূক্ষ্ম হউক। কিন্তু পরমাণুর পরিমাণ অপেক্ষা সূক্ষ্ম পরিমাণ হইতে পারে না। দ্ব্যণুকের পরিমাণ পরমাণুর পরিমাণ অপেক্ষা স্থূল। অতএব, পরমাণুর পরিমাণকে দ্ব্যণুকের পরিমাণের জনক বলা যায় না। কিন্তু তাহা হইলে দ্ব্যণুকের পরিমাণের কারণ কি? বলিতেছি। দুইটি পরমাণু মিলিত হইয়াই দ্ব্যণুক উৎপন্ন করে এবং পরমাণুর এই দ্বিত্ব সংখ্যাই ইহার কারণ। এখন, একত্ব ভিন্ন সংখ্যামাত্রই অপেক্ষাবুদ্ধি জন্য। অর্থাৎ দ্বিত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া পরার্ধ পর্যন্ত সংখ্যা অপেক্ষাবুদ্ধি জন্য। যখন দুইটি দ্রব্য উপস্থিত থাকে তখন ইহা এক, ইহা এক এইরূপ দুইটি একত্ব বুদ্ধি দুইটি দ্রব্যে হয়। ইহাকেই অপেক্ষাবুদ্ধি বলে। এই অপেক্ষাবুদ্ধি হইতেই দ্বিত্বের উৎপত্তি হয়। অতএব, যে দ্বিত্বসংখ্যা দ্ব্যণুকের পরিমাণের জনক সেই দ্বিত্বসংখ্যা বুদ্ধি জন্য। কিন্তু কাহার বুদ্ধি? অতীন্দ্রিয় পরমাণুতে তোমার আমার মত জীবের অপেক্ষাবুদ্ধি হইতে পারে না। কিন্তু যোগিগণের কি হইতে পারে? পারে, কিন্তু আমরা যে দ্ব্যণুক পরিমাণ লইয়া কথা বলিতেছি, সেই দ্ব্যণুক পরিমাণের জনক যোগিগণের অপেক্ষাবুদ্ধি সাপেক্ষ দ্বিত্বসংখ্যা হইতে পারে না। কারণ, প্রলয়ের পর যখন প্রথম দ্ব্যণুক উৎপন্ন হয়, তখন যোগিগণও থাকেন না। তুমি কি বলিবে যে, যে ব্রহ্মাণ্ডটি সৃষ্ট হইতেছে, সেই ব্রহ্মাণ্ডে কোনও যোগী না থাকিলেও অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ডে থাকে এবং সেই সকল

সংখ্যা বিশেষ বা দ্বিত্বহেতুক অনুমান।

ব্রহ্মাণ্ডবর্তী যোগিগণের অপেক্ষাবুদ্ধিই সৃষ্টির প্রথমোৎপন্ন দ্ব্যণুক পরিমাণের জনক দ্বিত্বসংখ্যার কারণ ? কিন্তু তাহা হইলে, মহাপ্রলয়ে যখন যুগপৎ যাবৎ ব্রহ্মাণ্ড বিনষ্ট হইয়া যায় এবং তাহার পর সৃষ্টি হয়, তখন প্রথমোৎপন্ন দ্ব্যণুক পরিমাণের উৎপত্তির জন্য কাহার অপেক্ষাবুদ্ধিকে স্বীকার করিবে ? তোমাকে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, এই অপেক্ষাবুদ্ধি ঈশ্বরের সৃষ্টির প্রথমোৎপন্ন দ্ব্যণুকের পরিমাণ যে দ্বিত্বসংখ্যা জন্য, সেই দ্বিত্বসংখ্যা ঈশ্বরের অপেক্ষাবুদ্ধি জন্য। অতএব, আমরা আর একটি ঈশ্বর সাধক অনুমান পাইলাম। ঘট এবং পটের দ্বিত্বসংখ্যা যেমন অপেক্ষাবুদ্ধি জন্য, সৃষ্টির প্রথমোৎপন্ন দ্ব্যণুক পরিমাণের জনক যে পরমাণুগত দ্বিত্বসংখ্যা, তাহাও দ্বিত্বসংখ্যা বলিয়া ঠিক তেমনই অপেক্ষাবুদ্ধি জন্য ; এবং এই অপেক্ষাবুদ্ধি একমাত্র ঈশ্বরেরই হইতে পারে বলিয়া ঈশ্বর যে সিদ্ধ তাহাই বলিতে হয়।

ন্যায়দর্শনে সাধারণতঃ যে আটটি ঈশ্বরানুমানের উপন্যাস করা হয়, সেই আটটি অনুমান আমরা দেখিলাম। এখন ন্যায়াচার্যগণ এই অনুমানগুলিকে সদ্ধেতুক বলিয়া মনে করিলেও পূর্বপক্ষী আচার্যগণ তাহা করেন না। তাই এই প্রসঙ্গে পূর্বপক্ষী আচার্যগণ কি বলেন এবং তাহার উত্তরে ন্যায়াচার্যগণই না কি বলিয়া থাকেন, তাহা দেখা যাউক।

পূর্বপক্ষীর কথা।

পূর্বপক্ষী আচার্যগণের মতে প্রথম অর্থাৎ কার্যত্বহেতুক অনুমানটির হেতু বাধ, সৎপ্রতিপক্ষ, সাধ্যাপ্রসিদ্ধি, বিশেষ বিরোধ এবং ব্যভিচার এই পাঁচটি দোষে দুষ্ট এবং সেইজন্যই সাধ্যসাধন করিতে একান্ত অক্ষম। কার্যত্ব হেতুটি বাধ দোষে দুষ্ট। কারণ, বলবান্ প্রমাণের সাহায্যে ক্ষিতি অঙ্কুর প্রভৃতিরূপ পক্ষে, যে সাধ্যাভাব অর্থাৎ সকর্তৃকত্বাভাব আছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। অর্থাৎ পক্ষে সাধ্যাভাব বা সাধ্যাভাববিশিষ্ট পক্ষই বাধ দোষ। ধূমকে হেতু করিয়া যখন হ্রদে বহ্নি সাধন করা হয়, তখন বহ্ন্যভাববিশিষ্ট হ্রদই বাধ। কথাটিকে একটু খুলিয়া বলিবার চেষ্টা করা যাউক। হ্রদে বহ্নি রহিয়াছে, কারণ তথায় ধূম রহিয়াছে, এই অনুমানে হ্রদ পক্ষ, বহ্নি সাধ্য এবং ধূম হেতু। এখন এইরূপ অনুমানের সাহায্যে কেহ যদি আমার নিকট প্রমাণ করিতে চাহে যে, হ্রদে বহ্নি রহিয়াছে, তাহা হইলে সে এইরূপেই অগ্রসর হইবে। হ্রদ বহ্নিমান, কারণ তথায় ধূম রহিয়াছে, যেখানেই ধূম থাকে, সেখানেই বহ্নি থাকে, এখানেও তাই, অতএব, হ্রদ বহ্নিমান। এখন আমি জানি যে, হ্রদে জলই থাকে এবং যেখানে জল থাকে সেখানে বহ্নি থাকে না। অতএব, যেই আমার নিকট কেহ বলিবে যে হ্রদ বহ্নিমান অমনি আমার হ্রদে বহ্ন্য-ভাব নিশ্চয় আছে বলিয়া আমি আর তাহাকে কিছু বলিতে দিব না এবং কোনও

কার্যত্বহেতুটি বাধ দোষ দুষ্ট।

অনুমিতি হইবে না। কিন্তু হ্রদে বহ্নি নাই, বা হ্রদ বহ্নিমান নহে এই যথার্থ জ্ঞান যদি আমার না থাকিত, তাহা হইলে আমি তাহাকে কথা বলিতে দিতাম, এবং আমার ভ্রান্ত অনুমিতি হইয়া যাইতে পারিত। সুতরাং হ্রদ বহ্নিমান্ নহে এই যথার্থ জ্ঞান হ্রদ বহ্নিমান্ এই ভ্রান্ত অনুমিতির প্রতিবন্ধক এবং এই প্রতিবন্ধকের অভাব ইহার একটি কারণ। পুনরায় ঘট জ্ঞানের বিষয় যেমন ঘট, পট জ্ঞানের বিষয় যেমন পট, এই যথার্থ জ্ঞানের বিষয়ও তেমনই বহ্ন্যভাববিশিষ্ট হ্রদ। এখন ভ্রান্ত অনুমিতির প্রতিবন্ধকরূপ যথার্থ জ্ঞানের বিষয়কেই হেত্বাভাস বলে বলিয়া বহ্ন্যভাববিশিষ্ট হ্রদই হেত্বাভাস। এই হেত্বাভাসটিকে বাধ বলে; এবং ইহা প্রথমেই অনুমিতিকে বাধা দেয়। যাহাই হউক, বহ্ন্যভাববিশিষ্ট হ্রদ বা সাধ্যাভাববিশিষ্ট পক্ষকেই বাধ বলে। এবং পূর্বপক্ষী আচার্যগণের মতে প্রথম ঈশ্বরাণুমানের কার্যত্ব হেতুটি এই দোষে দুষ্ট। কারণ, এই স্থলে, সাধ্য সকর্তৃকত্ব এবং পক্ষ ক্ষিতি প্রভৃতি। অতএব সকর্তৃকত্বাভাব বিশিষ্ট ক্ষিতি প্রভৃতিই বাধ। বলবান্ প্রমাণের সাহায্যে বুঝা যায় ক্ষিতি প্রভৃতিতে সকর্তৃকত্বের অভাব রহিয়াছে। কিন্তু এই বলবান্ প্রমাণ কি? বলিতেছি। তন্তুবায়, কুম্ভকার প্রভৃতি যত কর্তা আমরা দেখিয়াছি, তাহারা সকলেই শরীরী। কোনও অশরীরী কর্তা আমরা কেহই দেখি নাই। ভূত, প্রেত প্রভৃতি যে সকল তথাকথিত অশরীরীকে কর্তা বলা হয়, তাহারা কেহই প্রকৃতপক্ষে অশরীরী নহে। তাহাদের আমাদের মত পার্থিব শরীর না থাকিলেও সূক্ষ্ম বায়বীয় শরীর অবশ্যই আছে। অতএব আমরা বলিতে পারি যে, কর্তা মাত্রই শরীরী। সুতরাং আরও বলিতে পারা যায় যে, যেখানেই কর্তৃত্ব থাকে, সেইখানেই শরীরও থাকে। কর্তৃত্বের অধিকরণে শরীরের অভাব থাকে না। এখন ধূমের অধিকরণে বহ্নির অভাব থাকে না বলিয়াই ধূমকে বহ্নির ব্যাপ্য এবং বহ্নিকে ধূমের ব্যাপক বলা হয়। অতএব, আমরা কর্তৃত্বকে শরীরের ব্যাপ্য এবং শরীরকে কর্তৃত্বের ব্যাপক বলিতে পারি। এখন, কোথাও যদি ব্যাপকের অভাব নিশ্চয় হয়, তাহা হইলে তথায় ব্যাপ্যেরও অভাব নিশ্চয় হইবে। যেমন, কোনও স্থানে যদি বহ্নির অভাব নিশ্চয় হয়, তাহা হইলে সেই স্থানে ধূমের অভাব নিশ্চয়ও হইবে। এইরূপ কোথাও যদি শরীরের অভাব নিশ্চয় হয়, তাহা হইলে তথায় কর্তৃত্বের অভাব নিশ্চয়ও হইবে। ন্যায়াচার্যগণ বলিয়া থাকেন যে, ঈশ্বরের শরীর নাই। অতএব, আমরা বলিতে পারি যে, তাঁহার কর্তৃত্বও নাই। এখন অল্পজ্ঞ বলিয়া ক্ষিতি অঙ্কুর প্রভৃতির কর্তা জীব হইতে পারে না। এইরূপ শরীর না থাকায় ঈশ্বর কোনও কার্যেরই কর্তা হইতে পারে না। অতএব, ক্ষিতি অঙ্কুর প্রভৃতি যে অকর্তৃক বা সকর্তৃকত্বাভাব বিশিষ্ট তাহাই বলিতে হয়। সংক্ষেপে কার্যত্ব হেতুক অনুমানটির হেতু বাধ দোষ দুষ্ট, কারণ ক্ষিতি অঙ্কুর প্রভৃতি

যে সকর্তৃকত্বাভাব বিশিষ্ট তাহা বলবান্ প্রমাণের সাহায্যে বুঝিতে পারা যায়।

কার্যত্ব হেতুটি সৎপ্রতিপক্ষ দোষ দুষ্টও বটে, কারণ, ক্ষিতি প্রভৃতি পক্ষে শরীরাজন্যত্বরূপ তুল্য বল বিরোধী হেতুর জ্ঞান আমাদের হয়। অর্থাৎ কোনও পক্ষে যখন কোনও হেতুর সাহায্যে কোনও সাধ্য সাধন করিতে যাইতেছি, তখন সাধ্যাভাব সাধন করিতে সমর্থ এমন কোনও সমান বলশালী হেত্বন্তরের জ্ঞান যদি ঐ পক্ষেই হয়, তাহা হইলে হেতু দুইটি পরস্পর পরস্পরের প্রতিবন্ধক হইয়া যায় এবং কোনও অনুমিতি হয় না। যেমন ধূমকে হেতু করিয়া পর্বতে যখন বহ্নিসাধন করিতে যাইতেছি তখন বহ্নির অভাবসাধন করিতে পারে এমন কোনও হেতুর, যেমন পাষাণময়ত্বের, জ্ঞান যদি ঐ পর্বতেই হয়, তাহা হইলে উভয় হেতুই উভয়ের প্রতিপক্ষ হইয়া যায় এবং কোনও অনুমিতি হইতে পারে না। সংক্ষেপে সাধ্যাভাবের ব্যাপ্যবান্ বা সাধ্যাভাব সাধন করিতে পারে এইরূপ হেতুমান পক্ষকেই সৎপ্রতিপক্ষ দোষ বলে; এবং কথিত ঈশ্বরানুমানের হেতুটি যে এই দোষ দুষ্ট তাহা একটু বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। কারণ, শরীর না থাকিলে কর্তা হওয়া যায় না। কর্তা যে কার্যের কারণ, তাহার শরীরও সেই কার্যের কারণ। কুম্ভকার যেমন ঘটের কারণ কুম্ভকারের দেহও তেমনই ঘটের কারণ। অতএব, যে কার্য কর্তা-জন্য, সেই কার্য শরীর-জন্যও বটে। কর্তা-জন্যত্বের আশ্রয়ে শরীর-জন্যত্বের অভাব থাকিতে পারে না। সুতরাং শরীর-জন্যত্বকে কর্তা-জন্যত্বের ব্যাপক বলিতে পারা যায়। এখন, ব্যাপকের অভাব নিশ্চয় হইলে ব্যাপ্যের অভাব নিশ্চয়ও হয়। অতএব শরীরাজন্যত্বের জ্ঞান হইলে কর্তা-জন্যত্বাভাবের জ্ঞানও হয়। ক্ষিতি প্রভৃতি পক্ষে আমাদের শরীরাজন্যত্বের জ্ঞান হইয়া থাকে। সুতরাং কার্যত্ব হেতুর সাহায্যে আমরা ক্ষিতি প্রভৃতিতে যে সাধ্য সাধন করিতে চলিয়াছি সেই ক্ষিতি প্রভৃতিতেই শরীরা-জন্যত্বের জ্ঞান, সকর্তৃকত্বাভাবের সাধক হেতুর জ্ঞান আমাদের হয়। অতএব, ক্ষিতি প্রভৃতি সাধ্যাভাবের ব্যাপ্যবান্ বিশিষ্ট। ইহাই সৎপ্রতিপক্ষ। সংক্ষেপে আলোচ্য অনুমানের পক্ষে যেমন সকর্তৃকত্বের সাধক হেতুর জ্ঞান হয় ঠিক তেমনই ঐ পক্ষে সকর্তৃকত্বাভাবের সাধক শরীরাজন্যত্ব রূপ হেতুর জ্ঞানও হয়। সাধ্যা-ভাবের ব্যাপ্যবান্ পক্ষকেই সৎপ্রতিপক্ষ বলে। অতএব কার্যত্ব হেতুটি সৎপ্রতিপক্ষ দোষ দুষ্ট।

ইহা সৎপ্রতিপক্ষ দোষ দুষ্টও বটে।

কার্যত্ব হেতুটি যে বাধ এবং সৎপ্রতিপক্ষ দোষ দুষ্ট তাহা আমরা দেখিলাম। এখন দেখা যাউক যে, হেতুটি সাধ্যাপ্রসিদ্ধি দোষেও দুষ্ট। যাহা সিদ্ধ হওয়ার

যোগ্য তাহাকেই সাধ্য বলা হয়। যেমন, ধূমকে হেতু করিয়া যখন পর্বতে বহ্নি সাধন করিবার চেষ্টা করা হয়, তখন পর্বত প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়া সাধ্য নহে। প্রকৃত সাধ্য হইল বহ্নি-বিশিষ্ট-পর্বত বা পর্বত-বিশিষ্ট-বহ্নি এবং ইহারা সিদ্ধ না হইলেও সিদ্ধ হওয়ার যোগ্য। কিন্তু কার্যত্ব হেতুক অনুমানটির সাধ্য কি? অবশ্যই সকর্তৃকত্ব-বিশিষ্ট-ক্ষিত্যঙ্কুর অথবা ক্ষিত্যঙ্কুর-বিশিষ্ট সকর্তৃকত্ব। কিন্তু ইহারা কি সিদ্ধ হওয়ার যোগ্য? অবশ্যই নহে। কারণ শরীরী বলিয়া জীব ঘট, পট প্রভৃতি কার্যের কর্তা হইতে পারে বটে, কিন্তু অল্পজ্ঞ বলিয়া ক্ষিত্যঙ্কুর প্রভৃতি কার্যের কর্তা হইতে পারে না। অতএব, জীব-কর্তৃকত্ব-বিশিষ্ট-ক্ষিত্যঙ্কুর বা ক্ষিত্যঙ্কুর-বিশিষ্ট-জীব-কর্তৃকত্ব অলীক। পুনরায় শরীরী না হওয়ার জন্য ঈশ্বর কর্তাই হইতে পারেন না। অতএব, ঈশ্বর-কর্তৃকত্ব-বিশিষ্ট-ক্ষিত্যঙ্কুরও হইতে পারে না। সুতরাং কর্তৃকত্ব-বিশিষ্ট-ক্ষিত্যঙ্কুর হইতেই পারে না। আলোচ্য অনুমানের সাধ্য অলীক, একান্ত অপ্রসিদ্ধ, সিদ্ধ হওয়ার অত্যন্ত অযোগ্য। ইহার হেতু সাধ্যাপ্রসিদ্ধি দোষ দুষ্ট।

সাধ্যাপ্রসিদ্ধি দোষ।

কার্যত্ব হেতুটি বিশেষ বিরোধ নামক দোষ দুষ্টও বটে। কারণ ঈশ্বরকে যখন কর্তা বলা হয়, তখন কর্তৃত্ব শরীরীরই থাকে বলিয়া ঈশ্বর যে শরীরী এইরূপ বোধ আমাদের হইয়া যায়; আবার ক্ষিতি, অঙ্কুর প্রভৃতি যাহাদের ঈশ্বরজন্য বলা হইতেছে, তাহারা যে শরীরী জন্য নহে, ইহা আমরা সকলেই দেখিতে পাই। উপরন্তু ঈশ্বর যে অশরীরী এইরূপ বোধও আমাদের আছে। অতএব, আমাদের একই সময়ে ঈশ্বর যে শরীরী এবং অশরীরী এইরূপ বুদ্ধি হইতে থাকে। ঈশ্বরে শরীরত্ব ও অশরীরীত্ব এই দুইটি বিরুদ্ধ ধর্মের জ্ঞান হয়। এবং একই বৃক্ষে যেমন কপিসংযোগ এবং তাহার অভাব থাকে, সেইরূপ একই দ্রব্যে শরীরীত্ব ও অশরীরীত্ব যে থাকে তাহা বলিতে পারা যায় না এবং সেইজন্যই কার্যত্বরূপ হেতুটিকে দুষ্ট হেতুই বলিতে হয়।

বিশেষ বিরোধ।

পুনরায় এই হেতুটি ব্যভিচারীও বটে। কারণ সোপাধিক হেতু মাত্রই ব্যভিচারী, এবং এই হেতুটি সোপাধিক। কিন্তু সোপাধিক হেতু কাহাকে বলে? না. উপাধি বিশিষ্ট হেতুকে সোপাধিক হেতু বলে। কিন্তু উপাধি কি? বলিতেছি। যাহা সাধ্যের ব্যাপক এবং হেতুর অব্যাপক তাহাকেই উপাধি বলে। অর্থাৎ যাহা সাধ্য যেখানেই উপস্থিত থাকে, সেইখানেই থাকে বা সাধ্যের আশ্রয়ে যাহার অভাব থাকে না, এবং হেতু যেখানে থাকে সেখানে অনুপস্থিত থাকে, বা হেতুর কোনও কোনও আশ্রয়ে যাহার অভাব বিদ্যমান থাকে, তাহাকেই উপাধি বলে। যেমন ধূমবান্ কারণ বহ্নিমান্, এই

ব্যভিচার দোষ।

অনুমান স্থলে ভিজা কাঠ উপাধি। যেখানেই ধূম উপস্থিত থাকে, সেইখানেই ভিজা কাঠও উপস্থিত থাকে। ধূমের এমন কোনও অধিকরণ নাই, যেখানে ভিজা কাঠও নাই। আবার, হেতু বা বহ্নির অধিকরণ নির্ধূম তপ্ত অয়ঃ-পিণ্ডে ভিজা কাঠ থাকে না। অতএব, এই অনুমানের হেতু সোপাধিক—ভিজা কাঠ তাহার উপাধি। এখন হেতু যদি সোপাধিক হয়, তাহা হইলে ব্যভিচারী হইয়া যায়, বা পক্ষ হেতুমান বলিয়া যে সাধ্যবান্ তাহা বলিতে পারা যায় না। যেমন ধূম সাধক বহ্নি হেতুক অনুমানটির হেতু ব্যভিচারী। কোথাও বহ্নি আছে দেখিয়া আমরা বলিতে পারি না যে তথায় ধূমও আছে। তপ্ত অয়ঃ-পিণ্ডে বহ্নি রহিয়াছে, কিন্তু ধূম নাই। কার্যত্ব হেতুটিরও এই অবস্থা। ইহাও একটি সোপাধিক হেতু; শরীর-জন্যত্বই ইহার উপাধি। সাধ্য সকর্তৃকত্ব ঘট, পট প্রভৃতিতে রহিয়াছে, এবং তথায় শরীর-জন্যত্বও রহিয়াছে। কিন্তু, ক্ষিতি, অঙ্কুর প্রভৃতিতে হেতু কার্যত্ব রহিয়াছে এবং শরীর-জন্যত্ব তথায় নাই। অতএব শরীর জন্যত্ব এই হেতুটির উপাধি, এবং ব্যভিচার দোষ এই হেতুকে দূষিত করিয়াছে।

কার্যত্ব হেতুক অনুমানটি যে সদ্ধেতুক অনুমান নহে তাহা আমরা দেখিলাম। এখন ক্রিয়াত্ব হেতুক অনুমানটির মূল্য কিরূপ তাহা বিচার করিয়া দেখা যাউক।

ক্রিয়াত্ব হেতুর বিরুদ্ধে দোষ উদ্ভাবন।

এই অনুমানটির মূল কথা হইল এই যে, সৃষ্টির প্রথম দ্ব্যণুকের আরম্ভক যে সংযোগ তাহার অনুকূল ক্রিয়া চেতন-প্রযত্নপূর্বক এবং যেহেতু অল্পজ্ঞ জীব ঐ চেতন পদার্থ হইতে পারে না, সেই হেতু সর্বজ্ঞ ঈশ্বরই যে, ঐ প্রযত্নের আশ্রয় তাহা বলিতে হয়। এখন প্রশ্ন এই যে, জীব এই প্রযত্নের আশ্রয় হইতে পারিবে না কেন? ইহা অবশ্য সত্য যে তুমি বা আমি বা কোন জীবই সাক্ষাৎ ভাবে ঐ প্রযত্নের আশ্রয় নহি; কিন্তু সাক্ষাৎ ভাবে না হইলেও পরম্পরায় হইব না কেন? জীবগণের অদৃষ্ট যে সৃষ্টির কারণ তাহা কেহই অন্ততঃ ন্যায়াচার্যগণ অস্বীকার করিতে পারেন না। ন্যায়াচার্যগণও বলিয়া থাকেন যে, ঈশ্বর সৃষ্টি-কার্যে জীবের অদৃষ্টের অপেক্ষা করেন। অতএব জীবের অদৃষ্ট যে সৃষ্টির কারণ তাহা বলিতে হয়। এখন প্রশ্ন এই যে, প্রথম দ্ব্যণুকের আরম্ভক সংযোগানুকূল ক্রিয়া যে জীবের অদৃষ্ট বলে হয় না, তাহা কেন বলা হইবে? জীবাশ্রিত প্রযত্নই যে অদৃষ্টকে দ্বার করিয়া ঐ ক্রিয়া উৎপন্ন করে না, তাহা বলিব কেন? বস্তুতঃ এইরূপে ঐ ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, ইহা বলিলে লঘু কল্পনার আশ্রয় লওয়া হয়। কারণ ঈশ্বরবাদগণও জীব এবং তাহার অদৃষ্টকে স্বীকার করিতে বাধ্য। অতএব, জীব অতিরিক্ত ঈশ্বর আশ্রিত প্রযত্নপূর্বক যে ঐ ক্রিয়া হইয়া থাকে ইহা বলা অনুচিত। সুতরাং ক্রিয়াত্ব হেতুক অনুমানটি ঈশ্বর প্রমাণ করিতে পারে

না। বস্তুতঃ পরমাণুর ক্রিয়া যে পরমাণুর যত্নজন্য, তাহাও বলা যাইতে পারে, এবং সেই জন্য ঈশ্বর মানিবার কোনও সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। প্রকৃত কথা এই যে, ক্রিয়া মাত্রই যে চেতনপ্রযত্ন-পূর্বক এই কথার কোন প্রমাণ নাই। চেতন-প্রযত্ন বিনাও যে ক্রিয়া হয় তাহা আমরা দেখিয়া থাকি। অয়স্কান্ত মণির অভিমুখে লৌহচূর্ণ ধাবিত হয়, বৎসের বিবৃদ্ধির জন্য অচেতন দুগ্ধ ক্ষরিত হয়। অতএব, ক্রিয়াত্ব হেতুটিকে চেতন-প্রযত্ন-পূর্বকত্ব রূপ সাধ্যের ব্যাপ্য বলা যায় না, এবং ইহাকে হেতু করিয়া যে অনুমানটি করা হয় তাহাও তাহার সাধ্য সিদ্ধ করিতে পারে না।

এইরূপ পতনাভাব বা ধৃতি হেতুক অনুমানটিও তাহার সাধ্যসিদ্ধ করিতে পারে পারে না। কারণ যাহাই পতনাভাব বিশিষ্ট তাহাই যে কোনও প্রযত্নবান্ কর্তৃক ধৃত এইরূপ নিয়ম বানাইবার যুক্তি কি? ইহা অবশ্য সত্য যে, উড্ডীয়মান বিহঙ্গম ধৃত কাষ্ঠখণ্ডটি বিহঙ্গম কর্তৃক ধৃত হয় বলিয়াই পতিত হয় না। কিন্তু সেইজন্য যে যাহাই পতিত হয় না, তাহাই কোন না কোন প্রযত্ন বিশিষ্ট কর্তৃক ধৃত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। কারণ এমনও হইতে পারে যে, গুরুভার হওয়া সত্ত্বেও যে ব্রহ্মাণ্ড সকল পতিত না হইয়া নিজ নিজ স্থানে আবর্তিত হইতে থাকে তাহার একমাত্র হেতু হইল এই যে, ইহাই তাহাদের স্বভাব। অতএব, পতনাভাবকে হেতু করিয়া এবং গুরুভার ব্রহ্মাণ্ড সকলকে পক্ষ করিয়া যে ধারকরূপ ঈশ্বরকে সিদ্ধ করিব তাহা হইবে না। পতনাভাব হেতুক অনুমানটিও কোন কাজের নহে।

ধৃতি হেতুটিও সদ্ধেতু নহে।

এইবার ব্যবহারত্ব হেতুক অনুমানটি গ্রহণ করা যাউক। এই অনুমানটি ধরিয়া লয় যে পদের প্রাথমিক ব্যবহার বলিয়া কোনও ব্যবহার আছে। কিন্তু এইরূপ কোনও ব্যবহার সত্যই আছে কি? আমরা কি বলিতে পারি না যে, অনাদি কাল হইতেই অধ্যাপক বা সমাজবৃদ্ধ পরম্পরায় এই ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে? অর্থাৎ অব্যুৎপন্ন আমাদিগকে বৃদ্ধগণ পদ ব্যবহার শিখাইয়া থাকেন, সেই বৃদ্ধগণ যখন অব্যুৎপন্ন ছিলেন, তখন তাঁহাদের পূর্ববর্তী বৃদ্ধগণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন; সেই সকল বৃদ্ধগণ এবং তাহাদের পূর্ববর্তী বৃদ্ধগণও এই ভাবেই ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন, ইত্যাদি। এই পদব্যবহারের কোন আদি নির্ণয় করা যায় না; এবং সেইজন্যই ইহাকে অনাদি বলাই যুক্তিসঙ্গত। অতএব, প্রাথমিক পদ ব্যবহার বলিয়া কোন পদ ব্যবহার নাই, এবং সেইজন্যই, এক অলীক পদার্থের উপপত্তির জন্য ঈশ্বর কল্পনা করিবার কোন প্রয়োজনও নাই। এখন, হয়ত তুমি বলিবে যে, বৃদ্ধ পরম্পরা অনাদি হইতে পারে

ব্যবহারত্ব হেতুটিও সদ্ধেতুক নহে।

না। কারণ যখন প্রলয় হয়, তখন ব্রহ্মাণ্ডের নাশ হইয়া যায়, এবং তাহার পর যখন সৃষ্টি হয় তখন যে পদ ব্যবহার শিক্ষা করা হয় তাহাই প্রাথমিক পদ ব্যবহার, এবং ইহার শিক্ষক কোনও জীব হইতে পারে না। অতএব জীবের অতিরিক্ত ঈশ্বর স্বীকার করিতেই হয়। তোমার এইরূপ কথার উত্তরে জিজ্ঞাস্য এই যে, সত্যই কি প্রলয় বলিয়া কোন কিছু আছে? প্রলয় বলিয়া যদি কিছু থাকে, তাহা হইলে অবশ্য প্রাথমিক পদ ব্যবহারের উপপত্তির জন্য জীব-অতিরিক্ত ঈশ্বর স্বীকার করিলেও করা যাইতে পারে, কিন্তু বিচার করিলে বুঝিতে পারা যায় যে প্রলয় বলিয়া কিছুই নাই, এবং সেইজন্য পদ ব্যবহারকে হেতু করিয়া ঈশ্বর সাধন করা যায় না। কিন্তু প্রলয় অসিদ্ধ কেন? বলিতেছি। যেমন বর্তমান অহোরাত্র অব্যবহিত অহোরাত্রপূর্বক সেইরূপ সকল অহোরাত্রই অহোরাত্র বলিয়া অহোরাত্রপূর্বক—এই অনুমানের সাহায্যে প্রলয় যে অসিদ্ধ তাহা প্রমাণ করা যায়। অর্থাৎ বর্তমান দিবারাত্রির অব্যবহিত পূর্বে দিবারাত্রি রহিয়াছে। সুতরাং ইহা বলা যায় যে, সকল দিবারাত্রিরই অব্যবহিত পূর্বে দিবারাত্রি আছে বা দিবারাত্রি প্রবাহের কোনও আদি এবং বিচ্ছেদ নাই। দিবারাত্রি প্রবাহের যদি কোন আদি থাকিত, তাহা হইলে বলা চলিত যে সর্বপ্রথম দিবারাত্রির অব্যবহিত পূর্বে দিবাও ছিল না, রাত্রিও ছিল না, প্রলয় ছিল। এইরূপ দিবারাত্রি প্রবাহের মধ্যেও যদি কোন বিচ্ছেদ থাকিত তাহা হইলেও বলা চলিত যে বিচ্ছেদ কালটিই প্রলয় কাল। কিন্তু দিবারাত্রির প্রবাহ অনাদি ও বিচ্ছেদ বিহীন; এবং এইজন্যই অন্তহীনও বটে। অতএব প্রলয় বলিয়া কিছুই থাকিতে পারে না। আরও দেখ কর্ম মাত্রই ফল প্রসবকারী। নিষ্ফল কর্ম বলিয়া কোনও কর্ম থাকিতে পারে না। কিন্তু কর্ম করিলেই তৎক্ষণাৎ যে তাহার ফল পাওয়া যায় তাহা নহে। কর্ম করিলে কর্মকর্তার যে ধর্মাধর্ম রূপ অদৃষ্ট জন্মায় তাহার দ্বারাই ফল লাভ হইয়া থাকে। এই অদৃষ্টের কিন্তু বিপাক বিষম। বিভিন্নকালীন ভোগের জনক হওয়া, প্রতিক্ষণেই ফল উৎপাদন করাই ইহার স্বভাব। এমন কোনও ক্ষণ থাকিতে পারে না যে সময় অদৃষ্টের বৃত্তি রোধ হয়, ফল জন্মাইবার সামর্থ্যের অভাব ঘটে। এখন, অনাদি কাল ধরিয়া অসংখ্য জীব অসংখ্য কর্ম করিয়া আসিতেছে; সুতরাং প্রতিক্ষণেই কোন না কোন জীব কোন না কোন কার্য করিতেছে এবং কর্মফল ভোগ করিতেছে। এমন কোন ক্ষণ নাই যে ক্ষণে জীব কোনও কার্য করে না এবং ফলভোগ করে না। কিন্তু প্রলয় স্বীকার করিলে এইরূপ কাল যে রহিয়াছে তাহা স্বীকার করিতে হয়। প্রলয়ে সকল ভাব কার্যেরই অভাব ঘটে, কোনও জীবই কোনও কর্ম করে না এবং কোন ফলভোগও করে না। অতএব প্রলয়

প্রলয় অসিদ্ধ।

স্বীকার করিলে অসংখ্য জীবের অসংখ্য বৃত্তি যে একই সময়ে রুদ্ধ হইয়া যায়, তাহা বলিতে হয়। কিন্তু এইরূপ কথা আমরা বলিতে পারি না। সুতরাং প্রলয় অসিদ্ধ।

অষ্টম অনুমানটিও অসদ্ধেতুক।

পুনরায় ব্রাহ্মণের ঔরসেই ব্রাহ্মণ জন্মায়, ক্ষত্রিয়ের ঔরসেই ক্ষত্রিয় জন্মায়, বৈশ্যের ঔরসেই বৈশ্য জন্মায় এবং এইরূপেই বিভিন্ন বর্ণের উৎপত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু প্রলয় স্বীকার করিলে সৃষ্টির প্রথমেই কোন ব্রাহ্মণাদি থাকিতে পারে না বলিয়া ব্রাহ্মণাদি বর্ণের কোন উৎপত্তিই হইতে পারে না। অতএব প্রলয় অসিদ্ধ এবং ন্যায়াচার্যগণের আলোচ্য অনুমানটি এবং অষ্টম অনুমানটিও অসদ্ধেতুক।

ন্যায়াচার্যগণের পঞ্চম অনুমানটিও সদ্ধেতুক নহে। কারণ কোনও জ্ঞানের প্রামাণ্য স্বতঃই, পরতঃ নহে। ন্যায়াচার্যগণ মনে করেন যে, যে কারণের বলে জ্ঞান

পঞ্চম অনুমানটিও সদ্ধেতুক নহে।

উৎপন্ন হয় সেই কারণের অতিরিক্ত কারণের জন্য জ্ঞানটি প্রমা হয়। কিন্তু এইরূপ কথা বলিবার কোন উপযুক্ত হেতু নাই। সুতরাং শাব্দ জ্ঞান যে শব্দের বক্তার আপ্ত হওয়ার উপর নির্ভর করে, তাহা বলিবার কোনও প্রয়োজন নাই। এইজন্যই বেদবাক্য জন্য জ্ঞান যে বেদবাক্যগুলি ঈশ্বর রচিত বলিয়াই প্রমাণ তাহাও বলিবার কোন প্রয়োজন নাই। সংক্ষেপে জ্ঞানের প্রামাণ্য স্বতঃ বলিয়া বেদবাক্য জন্য জ্ঞানের প্রামাণ্যকে হেতু করিয়া ঈশ্বর সাধন করা যায় না। ন্যায়াচার্যগণের পঞ্চম অনুমানটিও সদ্ধেতুক নহে।

এইরূপ ষষ্ঠ অনুমানটিও নহে। কারণ, বেদ পৌরুষেয় নহে। বেদ যদি কোন পুরুষ রচিত হইত তাহা হইলে লোকে সেই পুরুষের নাম মনে রাখিত। মহাভারত

ষষ্ঠ অনুমানটিও সদ্ধেতুক নহে।

রচয়িতার নাম আমরা মনে করিয়াছি। পাণিনিকেও আমরা ভুলি নাই। কিন্তু বেদকর্তার নাম আমাদের কাহারও মনে নাই কেন? তিনি কি মনে করিয়া রাখিবার মত ব্যক্তি ছিলেন না? অবশ্যই নহে। যে গ্রন্থের উপর কোটি কোটি নরনারীর ঐহিক এবং পারত্রিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করিতেছে, তাহার কোন কর্তা যদি থাকিত তাহা হইলে অবশ্যই তাহাকে মনে করিয়া রাখিতাম। যে কবি শত শত বর্ষ পূর্বের নব বসন্তের প্রভাতের অভিবাদন আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন, শংকরচরিত গানে ভুবন ভরিয়াছেন, মন্দাক্রান্তার স্তবকে স্তবকে মেঘমন্দ্র রাগিণীতে বিশ্বের সকল বিরহীর শোককে ধ্বনিত করিয়াছেন, তাঁহাকে আমরা কেহই ভুলি নাই, আজও হিয়ার মাঝে তিনি কথা বলিয়া উঠেন, এ যুগের তরুণী আজও দিনান্ত যখন দিগন্তের ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়ে তখন বেশবাশ না করিয়াই, কেশ রচনা না করিয়াই, আবশ্যক সকল কর্ম

ত্যাগ করিয়াও তাঁহার রচনা পাঠ করেন, হৃদয় স্পন্দনে ভ্রমর গুঞ্জনে তাঁহার নাম ধ্বনিত হইতে থাকে। তাই, যিনি কেবল গান জোগাইয়াছিলেন, তাঁহাকে মনে রাখিয়াছি, আর বেদকর্তাকে মনে রাখিলাম না? দেশোৎসাদন, কুলোৎসাদন প্রভৃতি ঘটিবার ফলে যে তাঁহাকে ভুলিয়া গিয়াছি, তাহাও বলিতে পারি না। কারণ এইরূপ কিছু ঘটে নাই। বেদালোচনা অবিচ্ছিন্ন ভাবে গুরুশিষ্য, অধ্যাপক-অধ্যেতা সম্প্রদায় ক্রমে অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। অতএব, স্মরণ কর্তার অভাবে বা অযোগ্যতায়, বা অকৃতজ্ঞতায়, যে বেদকর্তার নাম বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। যাহাই হউক বেদ নিত্য, অ-পৌরুষেয়।

সপ্তম অনুমানটিও দুষ্ট।

ন্যায়াচার্যগণের ষষ্ঠ অনুমানটিও মূল্যহীন। এবং এই জন্যই তাঁহাদের সপ্তম অনুমানটিও মূল্যহীন। বেদ বাক্য পৌরুষের নহে। তাহাকে পক্ষ করিয়া, এবং বাক্যত্বকে হেতু করিয়া অলৌকিক পুরুষ বা ঈশ্বর সাধন করা যায় না।

পূর্বপক্ষী আচার্যগণের কথা আমরা শুনিলাম। এখন আমরা ন্যায়াচার্যগণের কথা শুনিতে পারি। ন্যায়াচার্যগণের মতে যে সকল দোষপঙ্কে ঈশ্বর সাধক হেতুগুলিকে পূর্বপক্ষী আচার্যগণ নিমজ্জিত করেন, সেই সকল দোষপঙ্ক হইতে তাহাদের সহজেই উদ্ধার করা যায়। এই হেতুগুলি প্রকৃতই সদ্ধেতু। পূর্বপক্ষীগণ ইহাদের বিরুদ্ধে অনেক দোষ উদ্ভাবন করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু ইহারা দোষমুক্ত। প্রকৃতপক্ষে পূর্বপক্ষীগণের কথাই দোষযুক্ত। তাঁহারা যে দোষ উদ্ভাবন করেন, তাহাই দুষ্ট। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁহারা ন্যায় দর্শনের অনুমানগুলির প্রকৃত রহস্য ধরিতে পারেন না বলিয়া মনে করেন যে ইহারা সদ্ধেতুক নহে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁহাদের বিচার ঠিক পথে চলে না বলিয়া তাঁহারা এইরূপ কথা বলেন। যাহাই হউক ন্যায়াচার্যগণের মতে তাঁহাদের অনুমানগুলি সদ্ধেতুক। যে সকল দোষে দুষ্ট বলিয়া তাহাদের মনে করা হয়, সেই সকল দোষ হইতে তাহাদের সহজেই উদ্ধার করা যায়।

ন্যায়াচার্যগণের উত্তর।

যেমন কার্যত্ব হেতুটিকে পূর্বপক্ষী আচার্যগণ বাধ প্রভৃতি পাঁচটি দোষে দুষ্ট বলিয়া থাকেন। কিন্তু একটু বিচার করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, এই হেতুটি নির্দোষ। এই হেতুটি বাধ দোষে দুষ্ট নহে। কারণ, সাধ্যাভাববিশিষ্ট পক্ষই বাধ, এবং ক্ষিতি অঙ্কুর প্রভৃতি সকর্তৃকত্বাভাব বিশিষ্ট নহে। পূর্বপক্ষীগণ ক্ষিতি অঙ্কুর প্রভৃতি যে সকর্তৃকত্বাভাব বিশিষ্ট তাহা দেখাইবার জন্য ঈশ্বর যে কর্তা হইতে পারেন না তাহাই দেখাইতে বিশেষ যত্ন করেন। তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে জীবকর্তৃকতা-

কার্যত্ব হেতুটির বাধ দোষের উদ্ধার।

ভাব বিশিষ্ট ক্ষিত্যঙ্কুর সকলেরই স্বীকৃত। কেহই বলেন না যে, জীব ক্ষিতি অঙ্কুর প্রভৃতির কর্তা। অতএব ঈশ্বর ইহাদের কর্তা নহেন ইহা যদি দেখান যায়, তাহা হইলে ক্ষিত্যঙ্কুর যে ঈশ্বর কর্তৃকত্বাভাব বিশিষ্ট তাহাও দেখান হয়। এবং জীব-কর্তৃকত্ব ও ঈশ্বর-কর্তৃকত্ব ভিন্ন কোনও কর্তৃকত্ব নাই বলিয়া, ঈশ্বর যে ক্ষিত্যঙ্কুরের কর্তা নহে ইহা দেখানর অর্থই হইল ক্ষিত্যঙ্কুর সকর্তৃকত্বাভাব বিশিষ্ট। এখন তাঁহারা ঈশ্বর যে ক্ষিত্যঙ্কুরের কর্তা নহেন তাহা কেমন করিয়া দেখাইয়া থাকেন? অবশ্যই ঈশ্বর কোনও কিছুরই কর্তা হইতে পারেন না, ঈশ্বরে কর্তৃত্বের ঐকান্তিক অভাব রহিয়াছে, ইহা দেখাইয়া। অর্থাৎ জীব যে ক্ষিত্যঙ্কুরের কর্তা নহে, ইহা আমরা একভাবে দেখাই; এবং ঈশ্বর যে ইহাদের কর্তা নহেন, তাহা অন্যভাবে দেখান হয়। জীবের ক্ষেত্রে আমরা বলি না যে জীবের আদপেই কোন কর্তৃত্ব নাই, বা জীব কোন কার্যেরই কর্তা নহে। কারণ, জীব যে ঘটাদি কার্যের কর্তা হইয়া থাকে, ইহা দেখিতেই পাওয়া যায়। তাই, আমরা বলি যে জীব বহু কার্যের কর্তা হইলেও, ক্ষিতি অঙ্কুর প্রভৃতি কার্যের কর্তা হইতে পারে না। কারণ, ঐরূপ কার্যের কর্তা যদি কেহ থাকে তাহা হইলে তাহা হইতে হইলে যেরূপ হওয়া প্রয়োজন জীব সেরূপ নহে। কিন্তু ঈশ্বর যে ক্ষিত্যঙ্কুর প্রভৃতির কর্তা নহেন, তাহা দেখাইবার জন্য বলা হয় যে ঈশ্বর অশরীরী বলিয়া কোনও কার্যেরই কর্তা হইতে পারেন না, সুতরাং ক্ষিতি, অঙ্কুর প্রভৃতিরও কর্তা হইতে পারেন না। এখন, প্রশ্ন এই যে ঈশ্বর যে কর্তা নহেন, তাহা কেমন করিয়া দেখান যায়। ঈশ্বর কর্তা নহেন, ইহার অর্থ হইল ঈশ্বরে কর্তৃত্বাভাব রহিয়াছে। কর্তৃত্বাভাব নামক অভাবের অধিকরণ হইলেন ঈশ্বর। এখন, অভাবের জ্ঞান অধিকরণ জ্ঞান সাপেক্ষ। ভূতলে ঘট নাই ইহা বলিতে হইলে ভূতলকে জানিতে হয়। আমি ভূতলে ঘটাভাবের জ্ঞান করিব, অথচ ভুতলের জ্ঞান রাখিব না, তাহা হইতে পারে না। অতএব, ঈশ্বরে কর্তৃত্বাভাবের জ্ঞান করিতে হইলে ঈশ্বরের জ্ঞান রাখিতে হয়। তাই পূর্বপক্ষী আচার্যগণের নিকট প্রশ্ন এই যে, এই জ্ঞান, অর্থাৎ ঈশ্বরের জ্ঞান, তাঁহারা করিবেন কেমন করিয়া? অবশ্যই কার্যত্ব হেতুর সাহায্যে। অর্থাৎ, ক্ষিত্যঙ্কুর কার্য বলিয়া সকর্তৃক, ঈশ্বর কর্তৃক, এইরূপ অনুমানের সাহায্যেই তাঁহাদের ঈশ্বরের জ্ঞান করিতে হইবে। অতএব, কার্যত্ব হেতুটি পূর্বপক্ষীগণেরও উপজীব্য। বাধ দোষ উদ্ভাবন করিবার সময় তাঁহাদেরও ইহাকে অবলম্বন করিতে হয়। এখন, যাহার সাহায্যে নিজের প্রতিষ্ঠা হয়, যাহা নিজের উপজীব্য বা অবলম্বন, তাহার বাধক হওয়া যায় না। সুতরাং কার্যত্ব হেতুটি যে বাধ দোষ দুষ্ট তাহা বলা যায় না। সংক্ষেপে, শরীরাভাবত্বকে হেতু করিয়া পূর্বপক্ষীগণ ঈশ্বরে কর্তৃত্বাভাব সিদ্ধ করিতে চাহেন। তাঁহারা বলিতে

চাহেন যে ঈশ্বরের যে হেতু শরীর নাই, সেই হেতু ঈশ্বরের কর্তৃত্বও নাই। কিন্তু এই-রূপ কথা বলিবার সময় কার্যত্ব হেতুকে স্বীকার করিয়া লইতে হয়। এই হেতুটির সাহায্যে সাধ্য সকর্তৃকত্বাভাবের অধিকরণ ঈশ্বরকে জানিতে হয়। কিন্তু কার্যত্বকে হেতু করিয়া ঈশ্বরে পৌঁছানও যাহা, আর ঈশ্বর যে কর্তা তাহা বুঝাও তাহা। এবং ইহার পর আর শরীরাভাবত্বকে হেতু করিয়া ঈশ্বরে যে কর্তৃত্বাভাব রহিয়াছে তাহা দেখান যায় না। ঈশ্বরে কর্তৃত্বাভাব নিশ্চয় হইলেই ক্ষিত্যঙ্কুর যে অকর্তৃক তাহা বলা যায়, এবং কার্যত্ব হেতুটি যে বাধ দোষে দুষ্ট তাহা দেখান যায়। কিন্তু এই নিশ্চয় করিতে হইলে জ্ঞানে ভাসমান অভাবের আধার স্বরূপ ঈশ্বরের জ্ঞান কার্যত্ব হেতুর সাহায্যেই করিতে হয় বলিয়া কার্যত্ব হেতুটি পূর্বপক্ষীরও উপজীব্য বা অব-লম্বন। এখন, যাহার সাহায্যে নিজের প্রতিষ্ঠা তাহার বাধক হওয়া যায় না। অতএব, শরীরাভাবত্বকে হেতু করিয়া ঈশ্বরের কর্তৃত্বাভাব যে রহিয়াছে তাহা বলা যায় না। সুতরাং আরও বলা যায় না যে ক্ষিত্যঙ্কুর কর্তৃত্বাভাব বিশিষ্ট। বস্তুতঃ এইরূপ ক্ষিত্যঙ্কুর অলীক। অতএব, কার্যত্ব হেতুটি বাধ দোষে দুষ্ট নহে।

কার্যত্ব হেতুটি যে বাধ দোষে দুষ্ট নহে, তাহা আমরা দেখিলাম। এইবার দেখা যাউক যে ইহা সৎপ্রতিপক্ষ নামক দোষের দ্বারাও দুষ্ট নহে। সাধ্যাভাবের সাধক তুল্যবল হেত্বন্তর-বিশিষ্ট পক্ষকেই সৎপ্রতিপক্ষ বলে। যে হেতুটির সাহায্যে আমি কোনও পক্ষে কোনও সাধ্য সাধন করিতে চাহিতেছি, সেই পক্ষই যদি সাধ্যের অভাব সাধন করিতে সমর্থ কোনও সদ্ধেতুর আশ্রয় হয়, তাহা হইলে আমার হেতুটি সৎপ্রতিপক্ষিত হইয়া যায়। কিন্তু সেই হেতুটি যদি একটি অসদ্ধেতু হয়, তাহার অপ্রামাণ্য যদি অগৃহীত না থাকে তাহা হইলে আমার হেতুটিকে আর সৎপ্রতিপক্ষ দোষ দুষ্ট বলা চলিবে না। আমি যখন ধূমকে হেতু করিয়া পর্বতে বহ্নি সাধন করিতে চলিয়াছি, তখন বহ্নির অভাব সাধন করিতে অক্ষম পাষাণময়ত্ব হেতুর জ্ঞান যদি তথায় হয়, এবং ভ্রম বশতঃ আমার অনুমিতি না জন্মে, তাহা হইলে তুমি আমার ধূম হেতুকে সৎপ্রতিপক্ষ দোষাক্রান্ত বলিতে পারিবে না। সাধ্যাভাবের সাধক যে কোন হেতু বিশিষ্ট পক্ষকেই সৎপ্রতিপক্ষ বলা যাইতে পারে না। তাহা হইলে কোন অনুমানই হইতে পারিবে না এবং অনুমিতির উচ্ছেদ হইয়া যাইবে। অতএব আমাদের বলিতে হয় সাধ্যাভাবের সাধক উত্তম হেতু বিশিষ্ট পক্ষই সৎ-প্রতিপক্ষ। সুতরাং কার্যত্ব হেতুটিকে যদি সৎপ্রতিপক্ষিত হেতু বলিতে হয়, তাহা হইলে দেখাইতে হইবে যে ক্ষিত্যঙ্কুর কর্তৃকত্বাভাবের সাধক কোনও উত্তম হেতু বিশিষ্ট। কিন্তু প্রশ্ন এই যে পূর্বপক্ষীগণ তাহা দেখাইতে পারেন কি? তাঁহারা বলেন

সৎপ্রতিপক্ষ দোষ হইতে উদ্ধার।

যে যেহেতু ক্ষিতি প্রভৃতি সকর্তৃকত্বাভাবের সাধক শরীরজন্যত্বাভাব নামক হেতুযুক্ত সেই হেতু কার্যত্ব নামক হেতুটি সৎপ্রতিপক্ষ দোষাক্রান্ত। কিন্তু শরীজন্যত্বাভাব নামক হেতুটি কি সদ্ধেতু ? ইহা কি কার্যত্ব হেতুর তুল্যবল ? অবশ্যই নহে। কারণ এই হেতুটি ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি নামক দোষ দুষ্ট। কোনও সাধ্যকে সাধন করিবার জন্য কেহ যখন এমন কোনও হেতু ব্যবহার করেন যাহা ব্যর্থবিশেষণাক্রান্ত তখন তাঁহাকে অধিক বলার জন্য নিগৃহীত হইতে হয় এবং তাঁহার হেতুর ব্যাপত্বাসিদ্ধি দোষে দুষ্ট হইয়া যায়। যেমন পর্বতে বহ্নি সাধন করিবার জন্য কেহ যদি নীল ধূমকে হেতু করেন, তাহা হইলে তাঁহার হেতুটি ব্যর্থ বিশেষণ যুক্ত হইবে, তিনি নিগৃহীত হইবেন এবং তাঁহার হেতুটি ব্যাপত্বাসিদ্ধি দোষে দুষ্ট হইবে। কারণ, পর্বতে বহ্নি সাধন করিতে ধূমরূপ হেতুই যথেষ্ট। সকল ধূমেই বহ্নির ব্যাপ্তি রহিয়াছে। এমন কোনও ধূম যদি থাকিত, যাহা বহ্নিশূন্য দেশেও থাকে বা যাহার অধিকরণে বহ্নি থাকে না তাহা হইলে সেই অদ্ভুত ধূম হইতে পৃথক করিবার জন্য নীল ধূম বা কোনও বিশেষণ বিশিষ্ট ধূমকে হেতু করিতে হইত। কিন্তু এইরূপ কোনও ধূম নাই। সেইজন্যই নীলধূম নামক হেতুর বিশেষণটি ব্যর্থ, এবং হেতুটি দুষ্ট। এইরূপ, শরীর-জন্যাত্বাভাবকে হেতু করিয়া যখন সকর্তৃকত্বাভাবকে সাধন করিতে যাওয়া হয়, তখন লঘু হেতুর সাহায্যে যে কার্য করা যায় তাহাই করিবার জন্য একটি অতিগুরু হেতুর ব্যবহার করা হয়। কারণ, সকর্তৃকত্বাভাব সাধন করিতে জন্যত্বাভাব হেতুই যথেষ্ট। সুতরাং শরীররূপ বিশেষণ যোগ করিয়া একটি অতিগুরু হেতু প্রয়োগ করিবার কোনও প্রয়োজনই নাই। অতএব, শরীরজন্যত্বাভাবরূপ হেতুটি কার্যত্ব হেতুর তুল্যবল নহে। ইহা একটি অসদ্ধেতু এবং ক্ষিত্যঙ্কুর ইহার আশ্রয় হওয়াতে কিছুই আসিয়া যায় না। কার্যত্ব হেতুটিকে আমরা সৎপ্রতিপক্ষ দোষ দুষ্ট বলিয়া মনে করিতে পারি না। এখন যাদ পূর্বপক্ষীগণ শরীরজন্যত্বাভাব নামক গুরু হেতু ত্যাগ করিয়া জন্যত্বাভাবরূপ লঘু হেতুর সাহায্যে কার্যত্ব হেতুটিকে সৎপ্রতিপক্ষিত করিতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহাদের বিপদ বাড়িয়াই যাইবে। কারণ, জন্যত্বাভাব নামক হেতুটি স্বরূপাসিদ্ধি নামক দোষে দুষ্ট ; এবং স্বরূপাসিদ্ধি নামক দোষ ব্যর্থ বিশেষণ ঘটিত ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি নামক দোষ হইতে গুরুতর। অর্থাৎ ব্যর্থ বিশেষণ ঘটিত ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি দোষ ঠিক অনুমিতির প্রতিবন্ধক নহে। তথাপি ইহাকে দোষ বলা হয়, কারণ যিনি এইরূপ হেতু প্রয়োগ করেন, তাঁহাকে অধিক বলিবার জন্য নিগৃহীত হইতে হয়। কিন্তু স্বরূপাসিদ্ধি দোষ অনুমিতির প্রতিবন্ধক। পক্ষে অভিমত হেতুর অভাবই স্বরূপাসিদ্ধি দোষ। যখন ধূমকে হেতু করিয়া হ্রদে দ্রব্যত্ব সাধন করিতে যাই, তখন ধূম হেতুটি স্বরূপাসিদ্ধি দোষ দুষ্ট হইয়া যায়। কারণ, হ্রদে

আমার অভিমত হেতু ধূম নাই। এই স্বরূপাসিদ্ধি দোষটি একটি পুরাদস্তুর হেত্বাভাসত্ব কারণ কোনও অনুমিতির অব্যবহিত পূর্বক্ষণে যে সাধ্যব্যাপ্যহেতু-বিশিষ্ট-পক্ষের পরামর্শ নামক জ্ঞান হইয়া থাকে, এবং যে জ্ঞান অনুমিতির সাক্ষাৎ জনক বা কারণ, স্বরূপাসিদ্ধি তাহারই প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। আমি যখন পর্বতে ধূম দর্শনের পর পর্বত বহ্নিমান এইরূপ অনুমিতি লাভ করি, তখন অনুমিতি নামক জ্ঞানটির জন্ম-গ্রহণের অব্যবহিত পূর্বক্ষণে পর্বত যে বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান্ এই জ্ঞান আমার হয়। এই জ্ঞানকে পরামর্শ বলে। এই পরামর্শই অনুমিতির সাক্ষাৎ জনক। এখন কোনও হেতু যদি স্বরূপাসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে এই পরামর্শ আর হইতে পারে না, এবং সেইজন্য অনুমিতিও আর হয় না। স্বরূপাসিদ্ধি পরামর্শকে, অনুমিতির জনককে বাধা দেয়, জন্মাইতে দেয় না। মনে করা যাউক যে ধূমকে হেতু করিয়া আমি হ্রদ দ্রব্য এই অনুমিতি করিতে চলিয়াছি। এই অনুমিতি হইতে হইলে একটি পরামর্শ থাকা চাই। হ্রদ যে দ্রব্যত্বের ব্যাপ্তি বিশিষ্ট ধূমের আশ্রয়—এই আকারের একটি জ্ঞান আমার হওয়া চাই। এই জ্ঞান যদি না হয়, তাহা হইলে হ্রদ দ্রব্য এই অনু-মিতিও আমার এই স্থলে হইবে না। এখন, হ্রদে বাস্তবিকই ধূম, দ্রব্যত্বের ব্যাপ্তি বিশিষ্ট ধূম নাই। অতএব, আমার পরামর্শ হইবে না। ধূম হেতুটি স্বরূপাসিদ্ধ বলিয়াই পরামর্শ হইল না। তাই দেখা গেল যে স্বরূপাসিদ্ধি পরামর্শের প্রতিবন্ধক। সুতরাং স্বরূপাসিদ্ধি একটি পুরাদস্তুর হেত্বাভাস। এবং জন্যত্বাভাবরূপ হেতুটি এই দোষে দুষ্ট। কারণ, ক্ষিতি, অঙ্কুর প্রভৃতি উৎপাদনশীল পদার্থ অজন্য বা জন্যত্বা-ভাবের আশ্রয় হইতে পারে না। অতএব, জন্যত্বাভাবরূপ হেতুটিও কার্যত্ব হেতুর তুল্যবল নহে। আমরা কার্যত্ব হেতুটিকে সৎ-প্রতিপক্ষ দোষে দুষ্ট বলিতে পারি না।

কার্যত্ব হেতুটি যে বাধ এবং সৎপ্রতিপক্ষ দোষ দুষ্ট নহে তাহা আমরা দেখিলাম। এখন আমরা দেখিতে পারি যে ইহা সাধ্যাপ্রসিদ্ধি দোষ দুষ্টও নহে। পূর্বপক্ষীগণের মতে কার্যত্ব হেতুক অনুমানটির সাধ্য হইল সকর্তৃকত্ববিশিষ্ট ক্ষিত্যঙ্কুর। কিন্তু জীব অল্পজ্ঞ বলিয়া জীব-কর্তৃকত্ব বিশিষ্ট ক্ষিত্যঙ্কুর অলীক, এবং ঈশ্বর শরীরহীন বলিয়া কর্তা হইতে পারেন না,

সাধ্যাপ্রসিদ্ধির উদ্ধার।

সুতরাং ঈশ্বর কর্তৃকত্ব-বিশিষ্ট ক্ষিত্যঙ্কুরও অলীক। অতএব, কর্তৃকত্ব-বিশিষ্ট-ক্ষিত্যঙ্কুর একান্ত অপ্রসিদ্ধ, সিদ্ধ হওয়ার অত্যন্ত অযোগ্য, এবং কার্যত্ব হেতুটি সাধ্যা-প্রসিদ্ধ দোষে দুষ্ট। এখন, পূর্বপক্ষীগণের নিকট প্রশ্ন এই যে কর্তা হইলেই শরীরী হইবে এমন কোন নিয়ম আছে কি? কুম্ভকার কর্তা এবং তাহার শরীর আছে, তন্তুবায় কর্তা এবং তাহার শরীর আছে, তুমি কর্তা এবং তোমার শরীর আছে, আমি কর্তা, আমার শরীর আছে, ইত্যাদি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া কর্তা মাত্রই

শরীরী কিনা, এই সংশয়ের নিরাশ করা যায় না। এই সংশয়ের নিরাশ করিতে হইলে অনুকূল তর্ক উপস্থিত করিতে হয়। কেহ যদি সংশয় করেন হে ধূম মাত্রই বহ্নির ব্যাপ্য কিনা তাহা হইলে বহু ধূমযুক্ত স্থানে যে বহ্নিও রহিয়াছে, তাহা দেখাইয়াই আমি তাঁহার সংশয়ের নিরাশ করিতে পারি না। তাঁহার এই সংশয়ের নিরাস করিতে হইলে আমায় দেখাইতে হয় যে ধূম এবং বহ্নির মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ রহিয়াছে, সুতরাং ধূম বহ্নির ব্যভিচারী হইতে পারে না। অন্যরূপে প্রকাশ করিয়া বলা যায় যে ধূম বহ্নির ব্যাভিচারী কিনা এইরূপ কোনও সংশয়ের উদয় হইলে, ধূম যদি বহ্নির ব্যভিচারী হইত তাহা হইলে বহ্নিজন্য হইত না বা বহ্নিজন্য না হউক এইরূপ আপত্তি হইত—এই অনুকূল তর্কের দ্বারাই ঐ সংশয়ের নিরাশ করিতে হয়। সেইরূপ, কর্তা মাত্রই শরীরী কিনা, বা কর্তৃত্ব শরীরের ব্যাপ্য না ব্যভিচারী এইরূপ সন্দেহ উঠিলে কর্তৃত্ব ও শরীরের মধ্যে যে কার্যকারণ ভাব সম্বন্ধ আছে, তাহা দেখাইয়া, অর্থাৎ, কর্তৃত্ব যদি শরীরের ব্যভিচারী হইত, তাহা হইলে শরীরজন্য হইত না, এইরূপ অনুকূল তর্ক উত্থাপন করিয়া, সেই সংশয়ের নিরাস করিতে হইবে। এখন, কর্তৃত্ব ও শরীরের মধ্যে কোন কার্যকারণভাব সম্বন্ধ নাই। কর্তা মাত্রই শরীরী এই কথাটির অনুকূলে কোন তর্ক নাই। অতএব, ঈশ্বর কর্তা নহেন, ঈশ্বর কর্তৃকত্ব বিশিষ্ট ক্ষিত্যঙ্কুর অলীক, ইত্যাদি কথার কোনও মূল্য নাই। উপরন্তু ক্ষিত্যঙ্কুর সকর্তৃকত্ব-বিশিষ্ট, ইহাদের কর্তা আছে, এই কথা মূল্যহীন নহে। ইহার অনুকূলে তর্ক রহিয়াছে। কেহ যদি ক্ষিত্যঙ্কুর কর্তা-জন্য কিনা, সকর্তৃকত্ব বিশিষ্ট কিনা, এইরূপ সংশয় করেন, তাহা হইলে ক্ষিত্যঙ্কুর যদি সকর্তৃকত্ব-বিশিষ্ট না হয়, তাহা হইলে কার্য না হউক, এইরূপ আপত্তির সাহায্যে তাঁহার সন্দেহের নিরাস করা যায়। অতএব, কার্যত্ব হেতুটির সাধ্য অপ্রসিদ্ধ নহে। সকর্তৃকত্ব-বিশিষ্ট ক্ষিত্যঙ্কুর অলীক নহে। কার্যত্ব হেতুটিকে সাধ্যাপ্রতিদ্ধি নামক দোষে দুষ্ট বলা যায় না।

উপরের আলোচনা হইতে আরও বুঝিতে পারা যায় যে বিশেষ বিরোধ নামক দোষও, এই হেতুটির নাই। কারণ, কর্তা হইতে হইলেই যদি শরীরী হইতে হইত, তাহা হইলে ঈশ্বরকে ক্ষিত্যঙ্কুরের কর্তা বলিলেই তিনি যে শরীরী এইরূপ বোধ আমাদের হইত। কিন্তু কর্তৃত্বকে যে শরীরের ব্যাপ্য বলা যায় না তাহা আমরা দেখিয়াছি। অতএব আমরা বলিতে পারি যে কার্যত্ব হেতুটি বিশেষ বিরোধ নামক দোষে দুষ্ট নহে।

বিশেষ বিশেষ দোষের উদ্ধার।

এইরূপ এই হেতুটি যে সোপাধিক নহে, তাহাও দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ, শরীরজন্যত্ব যদি সকর্তৃকত্বের ব্যাপক হইত অর্থাৎ যেখানে সকর্তৃকত্ব আছে, সেখানে যদি ইহার অভাব

ব্যাভিচার দোষও নাই।

না থাকিত, তাহা হইলে ইহাকে কার্যত্ব নামক হেতুর উপাধি বলা চলিত। কিন্তু, আমরা এইমাত্র দেখিলাম যে কর্তা হইতে হইলেই যে শরীরী হইতে হইবে এমন কোন নিয়ম নাই ; এবং কার্য হইতে হইলে যে কর্তা-জন্য হইতে হইবে এখন নিয়ম রহিয়াছে। অতএব ক্ষিত্যঙ্কুরকে কার্য বলিয়া সকর্তৃক বলা যায়। এখন, ক্ষিত্যঙ্কুর নামক সকর্তৃকত্বের আশ্রয়ে শরীরজন্যত্বের অভাব রহিয়াছে। অতএব শরীরজন্যত্বকে আমরা সকর্তৃকত্বের ব্যাপক বলিতে পারি না। এবং সেইজন্যই শরীরজন্যত্বকে কার্যত্ব হেতুর উপাধি বলা চলে না। কার্যত্ব হেতুটি সোপাধিক বা ব্যভিচারী হেতু নহে।

কার্যত্ব হেতুটি যে নির্দোষ তাহা আমরা দেখিলাম। এইবার দেখা যাউক যে ক্রিয়াত্ব হেতুটিও নির্দোষ। এই হেতুটির বিরুদ্ধে পূর্বপক্ষীগণের মোট বক্তব্য এই যে, যে ক্রিয়াটিকে ঈশ্বরের প্রযত্ন জন্য বলা হয়, তাহাকে পরমাণুর যত্ন জন্য বা জীবের অদৃষ্ট জন্য বলিলেই বা কি ক্ষতি ; এবং ক্রিয়া মাত্রই যে চেষ্টারূপ শরীর ক্রিয়ার মত প্রযত্ন পূর্বক, তাহাই বা কে বলিল ? পূর্বপক্ষীগণের এই কথার উত্তরে ন্যায়াচাযগণ যাহা বলেন তাহার সারমর্ম এইরূপ : পরমাণুর কোনও প্রযত্ন থাকিতে পারে না। কারণ, পরমাণু অচেতন। চৈতন্য এবং প্রযত্নের সামানাধিকরণ্যই বুদ্ধি সিদ্ধ। আমরা যেখানে প্রযত্ন আছে বলিয়া বুঝিয়াছি, সেখানেই যে চৈতন্য আছে ইহাও বুঝিয়াছি। এইরূপ চৈতন্য যেখানে নাই বুঝিয়াছি, সেখানে প্রযত্নও যে নাই তাহা বুঝিয়াছি। অতএব, অচেতন পদার্থের প্রযত্ন থাকিতে পারে না। পরমাণু যে অচেতন, জড়, ইহা সকলেই স্বীকার করেন ; স্বতরাং পরমাণুর যে প্রযত্ন নাই ইহাও সকলকেই স্বীকার করিতে হয়। অতএব, সৃষ্টির প্রথম দ্ব্যণুকের আরম্ভক সংযোগানুকূল ক্রিয়া যে পরমাণুর প্রযত্ন পূর্বক, তাহা আমরা বলিতে পারি না। এইরূপ ইহা যে অদৃষ্ট জন্য তাহাও বলা যায় না। কারণ অদৃষ্টও চেতন পদার্থ নহে। ইহাও অচেতন। চেতন ঈশ্বর অধিষ্ঠাতা বলিয়াই ইহা ফল প্রসব করিতে পারে। উপরন্তু, ক্রিয়া এবং প্রযত্নের মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ রহিয়াছে। স্বতরাং পরমাণুর ক্রিয়াকে প্রযত্নজন্য না বলিয়া কেবল অদৃষ্টজন্য বলিবার কোনও উপযুক্ত হেতু থাকিতে পারে না। পরমাণুর ক্রিয়াকে যদি অদৃষ্টজন্য বলা হয় তাহা হইলে দণ্ড, চক্র, কুম্ভকার প্রভৃতিকে ঘটের কারণ বলার কোনও অর্থ থাকে কিনা সন্দেহ। কারণ, ঘটের প্রতিও অদৃষ্টের নিমিত্ত কারণতা রহিয়াছে। বস্তুতঃ অদৃষ্ট কি কখনও দৃষ্টঘাতক হইতে পারে ? না, একটি কারণের দ্বারা অন্য কারণের কারণত্ব ভঙ্গ হইতে পারে ? অতএব সৃষ্টির প্রথম দ্ব্যণুকের আরম্ভক সংযোগানুকূল ক্রিয়া যে কেবল অদৃষ্টের দ্বারাই সাধিত হয়, এই-রূপ কথা বলা উচিত হইতে পারে না। পুনরায়, সকল ক্রিয়াই চেষ্টা নামক শরীর-

ক্রিয়াত্ব হেতুটিও নির্দোষ।

ক্রিয়ার মত প্রযত্নপূর্বক নহে, বা প্রযত্ন না থাকিলেও ক্রিয়া হইতে পারে, এইরূপ কথাও বলা চলে না। কারণ, চেষ্টা নামক ক্রিয়া ক্রিয়ারূপেই প্রযত্নের কার্য। দণ্ড যেমন দণ্ডরূপে, দণ্ডত্বাবচ্ছিন্নরূপেই ঘটের, ঘটত্বাবচ্ছিন্নের কারণ, প্রযত্নও তেমনই প্রযত্নরূপে, প্রযত্নত্বাবচ্ছিন্নরূপে, চেষ্টা নামক শরীরক্রিয়ার, ক্রিয়াত্বাবচ্ছিন্নের কারণ। এখন তুমি যে বলিবে যে চেষ্টা নামক ক্রিয়া হইতে অপর ক্রিয়ার বৈজাত্য বা অত্যন্ত বৈসাদৃশ্য আছে, তাহা হইবে না। কারণ অন্যান্য ক্রিয়া হইতে চেষ্টার এমন কোনও বৈসাদৃশ্য নাই যাহার জন্য বলা যাইতে পারে যে চেষ্টা প্রযত্নপূর্বক হইলেও, সকল ক্রিয়াই প্রযত্নপূর্বক নহে। বস্তুতঃ আমরা এমন কোনও ক্রিয়াই দেখি না যাহা প্রযত্নপূর্বক নহে। সকল ক্রিয়াকেই প্রযত্নপূর্বক বলিতে হয়। সুতরাং ক্রিয়ার হেতুটি নির্দোষ।

এইরূপ পতনাভাব বা ধৃতিরূপ হেতুটিও নির্দোষ। কারণ, যেমন চেষ্টা নামক শরীর ক্রিয়াটি ক্রিয়ারূপেই প্রযত্নের কার্য, ঠিক তেমনই উড্ডীয়মান বিহঙ্গমধৃত কাষ্ঠ-খণ্ডের ধৃতিও ধৃতিরূপেই প্রযত্নের কার্য। ধৃতি-সামান্য প্রযত্ন-সামান্য জন্য। সুতরাং ধৃতি প্রযত্নের ব্যাপ্তি বিশিষ্ট কি না, এই সংশয়ের নিবর্তক অনুকূল তর্ক সুলভ। এইরূপ সংশয় উঠিলে ধৃতি যদি প্রযত্নের ব্যাপ্তি বিশিষ্ট না নয়, তাহা হইলে প্রযত্নজন্য না হউক, এইরূপ আপত্তি তুলিয়া তাহার নিরাস করিতে পারা যাইবে। সুতরাং ধৃতি নামক হেতুটিকেও নির্দোষ বলিতে হয়।

ধৃতি হেতুক অনুমানটিও সদ্ধেতুক।

ব্যবহারত্ব হেতুটিরও নির্দোষ। কারণ, বিচ্ছেদ বা প্রলয় সিদ্ধ। পূর্বপক্ষীগণ প্রলয় অসিদ্ধ করিবার জন্য যাহা বলিয়াথাকেন তাহাই অসিদ্ধ। যেমন যে অনুমান-টির সাহায্যে তাঁহারা প্রলয় নাই ইহা প্রমাণ করিতে চাহেন, তাঁহার হেতুটি সোপাধিক। এই অনুমানটি ঠিক নিম্নোক্ত অনুমানটির তুল্য : বর্তমান বর্ষাদিন যেমন অব্যবহিত বর্ষাদিন পূর্বক, সকল বর্ষাদিনই সেইরূপ বর্ষাদিন বলিয়া অব্যবহিত বর্ষাদিন পূর্বক। উল্লিখিত অনুমানের হেতু বর্ষাদিনত্ব এবং সাধ্য অব্যবহিত বর্ষা-দিন পূর্বকত্ব। সকল বর্ষাদিনই হেতুর আশ্রয়, এবং দ্বিতীয় বর্ষাদিন হইতে শেষ বর্ষাদিন পর্যন্ত সকল বর্ষাদিনই সাধ্যের আশ্রয়। এখন, বৎসরের সকল দিনই বর্ষাদিন নহে। রবি তখন রাশি বিশেষে গমন করেন তখনই বর্ষাকাল আরম্ভ হয়। অতএব প্রথম বর্ষাদিনটি রাশিবিশেষগত রবিকাল পূর্বক নহে। ইহাতে রাশিবিশেষগত রবিকালপূর্বকত্ব ধর্মটি আশ্রিত নহে। কিন্তু দ্বিতীয় বর্ষাদিন হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ বর্ষাদিন পর্যন্ত সকল বর্ষাদিনকেই এই ধর্মটি আশ্রয়

ব্যবহারত্ব হেতুটিও নির্দোষ।

প্রলয় সিদ্ধ।

করিয়া থাকে। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে এই ধর্মটি যেখানেই সাধ্য রহিয়াছে, সেইখানেই রহিয়াছে। সাধ্যের অধিকরণে তাহার অভাব নাই। অতএব ইহা সাধ্যের ব্যাপক। কিন্তু হেতু বর্ষাদিনত্ব প্রথম বর্ষাদিনে বিদ্যমান, অথচ তথায় এই ধর্মটি বিদ্যমান নহে। সুতরাং ইহা হেতুর অব্যাপক। অতএব রাশিবিশেষগত রবিকালপূর্বকত্ব এই অনুমান স্থলে উপাধি, এই অনুমানের হেতু সোপাধিক বলিয়া ব্যভিচারী এবং পূর্বপক্ষীগণ প্রলয় অসিদ্ধ করিবার জন্য যে অনুমান প্রমাণ উপস্থিত করেন তাহার হেতুও এইরূপ সোপাধিক, ব্যভিচারী। পূর্বপক্ষীগণের অনুমানের হেতু অহোরাত্রত্ব, এবং সাধ্য অব্যবহিত অহোরাত্রপূর্বকত্ব। সকল অহোরাত্রই হেতুর আশ্রয়, এবং সৃষ্টির দ্বিতীয় অহোরাত্র হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ অহোরাত্র পর্যন্ত সকল অহোরাত্রই সাধ্যের আশ্রয়। এখন অব্যবহিত সংসারপূর্বকত্ব ধর্মটি সৃষ্টির দ্বিতীয় অহোরাত্র হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ অহোরাত্র পর্যন্ত সকল অহোরাত্রই বিদ্যমান। অতএব ইহা সাধ্যের ব্যাপক। কিন্তু প্রথম অহোরাত্রে, আরম্ভক্ষণে, ইহা বিদ্যমান নহে। অতএব ইহা হেতুর অব্যাপক। সংক্ষেপে, প্রলয়কে প্রসিদ্ধ করিবার জন্য পূর্বপক্ষীগণ যে অনুমান প্রয়োগ করেন তাহার হেতু সোপাধিক। অব্যবহিত সংসার পূর্বকত্বই এই উপাধি। ইহা প্রলয়াভাব সাধন করিতে পারে না। এইরূপ যুগপৎ সকল জীবের সকল অদৃষ্টের নিরোধ সম্ভব নহে বলিয়া যে প্রলয় সম্ভব নহে বলিব তাহা হইবে না। কারণ অদৃষ্টের সকল বৃত্তির নিরোধ অপ্রসিদ্ধ নহে। সুষুপ্তিকালে সুষুপ্ত ব্যক্তিগণের অদৃষ্টবৃত্তির সম্পূর্ণ রোধ হইয়া থাকে। সুতরাং কালবিশেষে সকল জীবেরই যে সকল অদৃষ্টের নিরোধ হইতে পারে তাহা বলিতে পারা যায়। পুনরায় বৃশ্চিকের ঔরস হইতে যেমন বৃশ্চিকের উৎপত্তি হয়, গোময় হইতেও সেইরূপ বৃশ্চিকের উৎপত্তি হয়। শাক বিশেষের বীজ হইতে যেমন এক-প্রকার শাক জন্মে, তণ্ডুল কণা হইতেও ঠিক সেই প্রকারের শাক জন্মাইয়া থাকে। অতএব বলা যায় যে ব্রাহ্মণের ঔরসে যেমন ব্রাহ্মণ জন্মে, ব্রাহ্মণের ঔরস ব্যতি-রেকেও অদৃষ্ট বিশেষের বশেও ঠিক তেমনই ব্রাহ্মণ জন্মিতে পারে। সুতরাং প্রলয় স্বীকার করিলে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণের যে কোনও উপপত্তি হয় না এই কথা অশ্রদ্ধেয়। বস্তুতঃ অদৃষ্ট উৎকটও হইতে পারে, আবার অনুৎকটও হইতে পারে। উৎকট অদৃষ্ট অচিরকাল মধ্যেই ফল জন্মাইয়া থাকে, কিন্তু অনুৎকট অদৃষ্ট সু-চিরকাল পরে ফল জন্মায়। সুতরাং জীবের ক্ষয়াবশিষ্ট অনুৎকট অদৃষ্ট রাশি প্রলয়কালেও থাকিয়া যায় এবং ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণাদি বর্ণে জন্মাইবার অনুকূল অদৃষ্টও থাকে বলিয়া, ঈশ্বর বর্ণানুকূল অদৃষ্টের সাহায্যে ব্রাহ্মণাদির ঔরস ব্যতিরেকেও ব্রাহ্মণাদি সৃজন করিতে পারেন। অতএব প্রলয় অসিদ্ধ এই কথার কোনও মূল্য নাই। প্রলয়ের কোন বাধক

প্রমাণ নাই। শুধু তাহাই নহে। প্রলয়ের সাধক প্রমাণও রহিয়াছে। দীপশিখা ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাইতে পাইতে একেবারে লুপ্ত হইয়া যায়; সেইরূপ জন্ম, সংস্কার, বিদ্যা প্রভৃতির ক্রমিক হ্রাস হইতেছে দেখিয়া বলা যায় যে ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় ভাবকার্যেরই কোনও কালে একান্ত উচ্ছেদ অবশ্যই হইবে, প্রলয় ঘটিবে। অর্থাৎ যত দিন যাইতেছে জন্ম তত হ্রাস পাইতেছে। জন্ম পূর্বে যেরূপ ছিল এখন সেরূপ নাই। প্রথমে ব্রহ্মা মনে মনে চিন্তা করিয়াই প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহার পর পুরুষগণ সন্তান কামনা করিয়া স্ত্রীতে উপগত হইলেই সন্তান জন্মিত, কিন্তু বর্তমানে কামী-জনের প্রবৃত্তির অবর্জনীয় ফলস্বরূপ সন্তান জন্মিয়া থাকে। অতএব দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে সন্তানের জন্ম আর ইচ্ছাধীন নাই। জন্ম হ্রাস পাইতেছে। এইরূপ, সংস্কারও হ্রাস পাইতেছে। পূর্বে চরু প্রভৃতির সংস্কার করা হইত, তাহার পর গর্ভ সংস্কার করা হইত, তাহার পর জন্মান্তর সংস্কার করা হইত; কিন্তু বর্তমানে লৌকিক ব্যবহারকে আশ্রয় করিয়া কৎঞ্চিৎ সংস্কার মাত্র করা হইয়া থাকে। অতএব, সংস্কারও হ্রাস পাইয়াছে। বিদ্যারও হ্রাস হইয়াছে। পূর্বে সহস্রশাখ চতুর্বেদ শুনিয়াই লোকে অভ্যাস করিতে পারিত, পরে একবেদ এবং তাহারও পরে এক-শাখা শুনিয়া অভ্যাস করিত; কিন্তু বর্তমানে কয়েকটি মাত্র মন্ত্রও ভাল করিয়া অভ্যাস করিয়া থাকে এমন ব্যক্তি বিরল। তাহার পর বৃত্তি ধর্মাদিও হ্রাস পাইয়াছে। পূর্বে উঞ্ছবৃত্তিই ব্রাহ্মণের সর্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি ছিল, পরে অযাচিত বৃত্তি এবং তাহার পরে কৃষিবৃত্তি প্রভৃতি উত্তমবৃত্তির মধ্যে গণ্য হইয়াছিল। কিন্তু বর্তমানে অর্থগ্রহণ পূর্বক পরসেবা বৃত্তিই ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। ধর্মের ক্ষেত্রেও সেইরূপ। পূর্বে তপ,জ্ঞান, যজ্ঞ এবং দান এই চারিপাদে ধর্ম পূর্ণরূপে অনুষ্ঠিত হইত। তাহার পর এক পদ এক পদ করিয়া হ্রাস পাইতে পাইতে সার্বজনীন পূজার লারেলাপ্পায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্বে লোকে যজ্ঞশেষভুজ ছিল, তাহার পর অতিথিশেষভুজ হইল, তাহার পর স্বার্থসাধিতভুজ হইল, এবং বর্তমানে ভৃত্যাদি সহভুজ হইয়াছে। এইরূপ প্রত্যেক বিষয়েরই ক্রমিক হ্রাস দেখা যাইতেছে। অতএব অনুমান করা যাইতে পারে যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সকল ভাব কার্যেরই কোন এক সময়ে একান্ত নাশ হইবে। প্রলয় অনুমানসিদ্ধ। আগমও ইহা সমর্থন করে। সুতরাং পদব্যবহারত্ব নামক হেতুটি সদ্ধেতু এবং অষ্টম অনুমানটিও সদ্ধেতুক।

অষ্টম অনুমানটিও সদ্ধেতুক।

বেদত্ব হেতুটিও একটি সদ্ধেতু। কারণ, বেদ নিত্য নহে। আয়ুর্বেদ যেমন পৌরুষেয়, ঋগ্‌বেদাদিও সেইরূপ পৌরুষেয়। ইহাদের নিত্য বলা যাইতে পারে না। প্রলয় যদি অসিদ্ধ হইত, তাহা হইলে হয়ত ইহাদের নিত্য কথা বলা চলিত।

কিন্তু প্রলয় যখন সিদ্ধ পদার্থ, এবং প্রলয়কালে যখন কোন ভাবকার্যই বিদ্যমান থাকে না, বিনাশ পায়, তখন বেদগুলিও যে বিনষ্ট হয় তাহা বলিতে হয়। সুতরাং বেদবক্তা বলিয়া ঈশ্বরকে স্বীকারও করিতে হয়। পূর্বপক্ষীগণ বলিয়া থাকেন যে বেদ যদি পৌরুষেয় হইত, তাহা হইলে অবশ্যই লোকে বেদকর্তার নাম মনে রাখিত। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান যে লৌকিক স্মরণীয় পুরুষের নামই লোকে মনে রাখে। কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের নাম আমরা মনে করিয়া রাখিয়াছি, বাল্মীকির নামও আমরা ভুলি নাই। কারণ তাঁহারা মনে রাখিবার মত কার্য করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা লৌকিক পুরুষ। বেদ নামক কার্যটি যদিও একটি মনে রাখিবার মত কার্য, তথাপি ইহার কর্তা ঈশ্বর বলিয়া আমরা ঠিক যে ভাবে বেদব্যাস প্রভৃতিকে মনে করিয়া রাখিয়াছি সেইভাবে বেদকর্তাকে মনে করিয়া রাখি নাই। কিন্তু সেইজন্য বেদকে অপৌরুষেয় বলিয়া মনে করার কোনও অর্থ হয় না। বস্তুতঃ বেদ বাক্যরাশি এবং বাক্য কখনও অপৌরুষেয় হইতে পারে না। সুতরাং বেদের কোনও কর্তা নাই, এইরূপ উক্তির অর্থ এই দাঁড়ায় যে ইহার কোন উত্তম কর্তা নাই, স্মরণের অযোগ্য কোনও নরাধম ইহার কর্তা। কিন্তু তাহা কি আমরা কেহ বলিতে পারি? চার্বাকগণের কথা ছাড়িয়া দিলাম, নাস্তিক বৌদ্ধ এবং জৈন আচার্যগণের কথাও আমরা ছাড়িয়া দিতেছি—পূর্বপক্ষী মীমাংসাচার্যগণ কি তাহা বলিতে পারেন? অবশ্যই পারেন না। সুতরাং বেদের যে কর্তা আছে ইহা মানিতেই হয়, এবং ইহার মর্যাদা অনুযায়ী ইহার কর্তা অনুমান করিতে হইলে আমাদের অবশ্যই বলিতে হয় যে ঈশ্বরই ইহার কর্তা। ঈশ্বরই বেদবক্তা বলিয়া বেদ বাক্য জন্য জ্ঞান প্রমা হইয়া থাকে। সুতরাং পঞ্চম অনুমানের হেতুটিও সদ্ধেতু।

বেদত্ব হেতুটিও সদ্ধেতুক।

পূর্বপক্ষীগণ জ্ঞানের প্রামাণ্যকে স্বতঃ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু জ্ঞানের প্রামাণ্য স্বতঃ হইতে পারে না। জ্ঞানের প্রামাণ্য যদি স্বতঃ হয় তাহা হইলে তাহার অপ্রামাণ্যও স্বতঃ হইবে না কেন? জ্ঞানের প্রামাণ্যের উৎপত্তির জন্য জ্ঞানের কারণের অতিরিক্ত প্রয়োজন যদি না থাকে, তাহা হইলে তাহার অপ্রামাণ্যের উৎপত্তির জন্যও অতিরিক্ত কারণের প্রয়োজন থাকিতে পারে না। একই কারণ হইতে বিরুদ্ধ কার্য উৎপন্ন হইতে পারে না বলিয়া জ্ঞানের কারণ তাহার প্রামাণ্য এবং অপ্রামাণ্য—ইহাদের উভয়েরই কারণ হইতে পারে না, ইহা যদি স্বীকারও করি, তাহা হইলেও জিজ্ঞাসা করিতে হয় যে জ্ঞানের কারণ অপ্রামাণ্যের কারণ না হইয়া, প্রামাণ্যের কারণ হইবে কেন? উপরন্তু অপ্রামাণ্যের কারণ যদি জ্ঞানের কারণের অতিরিক্ত কিছু, যেমন কোনও দোষ হয়, তাহা হইলে দোষাভাব এবং জ্ঞানের কারণ, ইহারা উভয়ে যে জ্ঞানের

পঞ্চম অনুমানটিও সদ্ধেতুক।

প্রামাণ্যের কারণ হয় তাহা বলিতে হয়। অতএব প্রামাণ্যের উৎপত্তি যে স্বতঃ তাহা বলা যায় না। সুতরাং বেদবাক্য জন্য জ্ঞান যে বেদবাক্যগুলি ঈশ্বর কথিত বলিয়াই প্রমা হয়, তাহা বলিতে হয়। অতএব প্রমাত্ব হেতুক অনুমানটিও একটি সদ্ধেতুক অনুমান। এবং বেদ পৌরুষেয় বলিয়া বাক্যত্ব হেতুক অনুমানটিও একটি সদ্ধেতুক অনুমান। সংক্ষেপে পূর্বপক্ষী আচার্যগণ ঈশ্বরানুমানগুলির হেতুতে যে সকল দোষ উদ্ভাবন করিয়া থাকেন, তাহারা সেই সকল দোষে দুষ্ট নহে। আলোচ্য অনুমানগুলি সদ্ধেতুক। ইহাই পূর্বপক্ষীগণের কথার উত্তরে ন্যায়াচার্যগণের কথার সংক্ষিপ্ত সার।

বাক্যত্ব হেতুক অনুমানটিও সদ্ধেতুক।

ন্যায়াচার্যগণের মতে ঈশ্বরানুমানগুলি যে সদ্ধেতুক তাহা আমরা দেখিলাম। এখন ন্যায়াচার্যগণ কেবল এই কথাই বলেন না যে এই অনুমানগুলি সদ্ধেতুক। তাঁহারা আরও বলেন যে ঈশ্বর নাই ইত্যাদি কথা বলা যায় না। তাঁহাদের এই কথার তাৎপর্য কি তাহা এইবার দেখিবার চেষ্টা করা যাউক। ন্যায়াচার্যগণ বলেন যে তুমি ঈশ্বর নাই, এইরূপ কথা বলিতে পার না। কারণ এইরূপ কথার সপক্ষে কোন প্রমাণ দেওয়া যায় না। তুমি যে বলিবে যে আমি ঈশ্বরের অভাব প্রত্যক্ষ করি, বা ঈশ্বর যে নাই তাহা দেখিতে পাই, তাহা হইবে না। কারণ, তুমি ঈশ্বরের অভাব প্রত্যক্ষ করিতে পার না। তুমি ঘটের অভাব প্রত্যক্ষ করিতে পার। কারণ এই অভাবের প্রতিযোগী ঘটকেও তুমি প্রত্যক্ষ করিতে পার। কিন্তু ঈশ্বরের অভাব প্রত্যক্ষ করিতে পার না। কারণ ঈশ্বর তোমার লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। ভাবিয়া দেখ, তুমি এখন এই গৃহে কোন ভূত নাই তাহা বলিতে পার কি? অবশ্যই পার না। কারণ তুমি ভূত দেখিতে পাইতেছ না, আমিও পাইতেছি না। কিন্তু তাহার অর্থ এই নহে যে এখানে কোন ভূত নাই। এমনও ত' হইতে পারে যে ভূত রহিয়াছে, কিন্তু আমাদের দৃষ্টিশক্তি এমনই যে ভূত আমরা দেখিতে পাই না বলিয়া ভূতকে দেখিতে পাইতেছি না। এইরূপ খালি চোখে জলের মধ্যে কোন বীজাণু দেখিতে পাইলাম না বলিয়া জলে যে কোন বীজাণু নাই তাহা বলিতে পারি না। অতএব অভাবের প্রতিযোগী যদি প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, তাহা হইলে অভাব প্রত্যক্ষ করা যায়। কিন্তু অভাবীয় প্রতিযোগী যদি প্রত্যক্ষগম্য পদার্থ না হয়, তাহা হইলে, অভাব প্রত্যক্ষ করা যায় না। অভাবীয় প্রতিযোগীরূপ অধিকরণে যদি প্রত্যক্ষ যোগ্যতা এবং অদর্শন উভয়ই মিলিত হয়, তাহা হইলেই অভাবের প্রত্যক্ষ হইতে

ঈশ্বর নাই — এই কথার কোনও অর্থ নাই।

প্রত্যক্ষ এই কথার প্রমাণ হইতে পারে না।

পারে। যে বস্তু প্রত্যক্ষের উপযুক্ত নহে, তাহার অভাবের কখনও প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। ঈশ্বর আমাদের লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয়ই নহেন। অতএব, তথাকথিত অভাবের প্রতিযোগী ঈশ্বরের প্রতিযোগিতা প্রত্যক্ষ যোগ্যতা বিশিষ্ট নহে। সুতরাং এই অভাবের প্রত্যক্ষও হইতে পারে না। ঈশ্বরাভাব আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। ঈশ্বর নাই, এই কথাটির প্রমাণ প্রত্যক্ষ হইতে পারে না।

এখন তুমি যে বলিবে যে শশকবিষাণাভাবের প্রতিযোগী প্রত্যক্ষের বিষয় না হইলেও, যেমন তাহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে ঠিক তেমনই ঈশ্বর নাই, এই অভাবের প্রতিযোগী প্রত্যক্ষযোগ্য না হইলেও তাহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে, তাহা হইবে না। কারণ, শশকবিষাণ নাই বলিতে তুমি কি বুঝিতেছ? তুমি কি শশকের বিষাণের অভাব বুঝিতেছ, অথবা শশকে বিষাণের অভাব বুঝিতেছ? প্রথমটি তুমি বুঝিতে পার না। কারণ, শশকের বিষাণ অলীক পদার্থ। তাহার বিধিমুখে কখনও জ্ঞান হয় না। 'হাঁ' বলিয়া আমরা কখনও তাহার নির্দেশ করিতে পারি না। সুতরাং নিষেধ মুখে 'না', বলিয়াও আমরা কখনও তাহার নির্দেশ করিতে পারি না। আমি যখন ভূতলে ঘটের অভাব প্রত্যক্ষ করি তখন আমার প্রত্যক্ষটি একটি তর্কিত প্রত্যক্ষ হয়। আমি যেন মনে মনে বলি যে ভূতলে যদি ঘট থাকিত তাহা হইলে আমার চক্ষু যখন সুস্থ আছে আলোকও যখন অনুকূল আছে, মনও যখন দিয়াছি, তখন আমি ঠিকই দেখিতে পাইতাম। কিন্তু দেখিতে যখন পাইতেছি না, তখন ভূতলে ঘট নাই। অর্থাৎ, অভাব প্রত্যক্ষকালে, আমি যাহার অভাব প্রত্যক্ষ করিতেছি তাহার, অভাবীয় প্রতিযোগীর, সত্তা প্রথমে আরোপ করি, তাহা যে রহিয়াছে এইরূপ আশা করি, এবং তাহার পর অভাব প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। সুতরাং যাহার কোনও সত্তা নাই, যাহা রহিয়াছে বলিয়া কোনও আশাই করা যায় না, সেই অলীকের অভাবও প্রত্যক্ষ করা যায় না। কোনও স্থলে আমরা যদি শশক বিষাণ রহিয়াছে এইরূপ আশা করিতে পারিতাম, শশকবিষাণের সত্তা যদি আমরা তথায় আরোপ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমাদের পক্ষে শশকের বিষাণের অভাব প্রত্যক্ষ করার কথা উঠিতে পারিত। কিন্তু তাহা যখন আমরা পারি না, তখন শশকের বিষাণের অভাব যে আমরা প্রত্যক্ষ করি, তাহাও বলিতে পারি না। এইরূপ শশকবিষাণাভাব প্রত্যক্ষ করি, বলিতে শশকে বিষাণের অভাব প্রত্যক্ষ করি, ইহাও তুমি বলিতে পার না। কারণ, তুমি বলিতে চাহিতেছ যে প্রতিযোগী প্রত্যক্ষ যোগ্য না হইলেও তাহার অভাব প্রত্যক্ষ করা যায়, এবং শশকে বিষাণের অভাব প্রত্যক্ষে প্রতিযোগী প্রত্যক্ষের অযোগ্য নহে। এই স্থলে অভাবের প্রতিযোগী বিষাণ এবং শশক বা তাহার মস্তক ইহার অধিকরণ। বিষাণ প্রত্যক্ষের অযোগ্য

পদার্থ নহে। গো, মহিষ প্রভৃতি প্রাণীর ক্ষেত্রে আমরা ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। অতএব শশকে তাহার অভাবও প্রত্যক্ষ করিতে পারি। সুতরাং প্রতিযোগী যদি প্রত্যক্ষের যোগ্য না হয়, তাহা হইলে তাহার অভাবের কোন প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। তথাকথিত ঈশ্বর নাই নামক অভাবের প্রতিযোগী ঈশ্বর লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয় নহেন; সুতরাং তুমি বা আমি তাঁহাকে দেখিতে পাই না বলিয়া কিছুই আসিয়া যায় না। লৌকিক প্রত্যক্ষ ঈশ্বর নাই এই কথার প্রমাণ হইতে পারে না।

কিন্তু অনুমান কি হইতে পারে? বিচার করিয়া দেখা যাউক। তুমি যখন অনুমানের সাহায্যে ঈশ্বর নাই প্রমাণ করিতে যাইবে, তখন তোমার অনুমানের সাধ্য হইবে অস্তিত্বাভাব এবং পক্ষ হইবেন ঈশ্বর। এখন ঈশ্বর যদি অস্তিত্বাভাববান্ হন তাহা হইলে তাঁহাকে গগন কমলের মতই অলীক বলিতে হয়। কিন্তু কোনও অনুমানের পক্ষ কি কোনও অলীক পদার্থ হইতে পারে? গগন কমলকে পক্ষ করিয়া আমরা কি কোনও অনুমান করিতে পারি? আমরা কি বলিতে পারি যে গগন কমল কমল বলিয়া প্রসিদ্ধ কমলের মত সুরভি? অবশ্যই পারি না। কারণ, তাহা হইলে আমাদের অনুমানটি পক্ষাসিদ্ধি নামক দোষে দুষ্ট হইবে। সেইরূপ অস্তিত্ব-বিহীন ঈশ্বরকে পক্ষ করিয়া অনুমান করিতে চাহিলেও অনুমানটি পক্ষাসিদ্ধি নামক দোষদুষ্ট হইবে। এখন এই পক্ষাসিদ্ধি দোষ পরিহার করিবার জন্য যদি ঈশ্বরকে অলীক না বলা হয়, তাহা হইলে ঈশ্বর অস্তিত্বসম্পন্নই হইবেন, এবং অনুমানটি বাধ দোষদুষ্ট হইবে। কারণ, সাধ্যাভাববিশিষ্ট পক্ষই বাধ। ঈশ্বর নাই, এই অনুমিতির সাধ্য অস্তিত্বাভাববিশিষ্ট ঈশ্বর, বা ঈশ্বরবিশিষ্ট অস্তিত্বাভাব। কিন্তু যখনই আমি পক্ষাসিদ্ধি দোষ পরিহার করিবার জন্য ঈশ্বর অলীক নহেন বলিতেছি, তখনই ঈশ্বর যে অস্তিত্বসম্পন্ন, বা অস্তিত্বাভাবের অভাব বিশিষ্ট, এই জ্ঞান করিয়া ফেলিতেছি। পক্ষ যে সাধ্যাভাববিশিষ্ট এই জ্ঞান আমার হইতেছে। অতএব ঈশ্বর অলীক হইলে ঈশ্বরে অস্তিত্বাভাব সাধক অনুমানের হেতুটি পক্ষাসিদ্ধি দোষাক্রান্ত হয়; এবং অলীক না হইলে, হেতুটি বাধ দোষে দুষ্ট হয়। অনুমানের সাহায্যে ঈশ্বর নাই, ইহা প্রমাণ করা যায় না।

অনুমানের সাহায্যেও ইহা প্রমাণ করা যায় না।

এখন হয়ত তুমি বলিতে পার যে ঈশ্বর যদিও প্রকৃতপক্ষে অলীক, তথাপি তিনি আমাদের জ্ঞানের বিষয় হইতে পারেন বলিয়া তাঁহাকে পক্ষ করিয়া অনুমান করা যায়, এবং পক্ষাসিদ্ধি দোষের উদ্ভব হয় না, এবং বস্তুগতিতে ঈশ্বর নাই বলিয়া বাধ দোষও হয় না। কিন্তু তোমাকে এইরূপ কথা বলিতে দেওয়া হইবে না। কারণ, আশ্রয় বা অধিকরণের আশ্রয়তা বা অধিকরণতা তাহার বিশেষ্যতা বা বিশেষণস্বরূপই

হইয়া থাকে ; এবং অলীকের বিশেষ্যতা থাকিতে পারে না বা অলীক বিশেষ্যতা হইতে পারে না ; সুতরাং ঈশ্বর যদি প্রকৃতই অলীক হন, তাহা হইলে অস্তিত্বাভাবের আশ্রয়রূপে পরিচিত হইবার যোগ্যতাও তাঁহার থাকে না। কথাটিকে একটু ভাঙিয়া বলিতে হয়। আশ্রয়তা বা অধিকরণতারূপ বিশেষণের দ্বারা কোনও বস্তুর যথার্থ পরিচয় হইতে পারে। যেমন পর্বত বহ্নিমান্ বলিলে বহ্নির আশ্রয়রূপে, বহ্নির আশ্রয়তার দ্বারা যে সকল পর্বত যথার্থই বহ্নিমান্ তাহাদের যথার্থ পরিচয়ই হয়। অতএব, বহ্নির আশ্রয়তা বিশেষ্যীভূত পর্বতগুলির যথার্থ ধর্ম। ইহার দ্বারা তাহাদের বিশেষভাবে যথার্থ পরিচয় হইয়া থাকে। সুতরাং ইহাকে তাহাদের বিশেষ্যতা বা বিশেষণ বলা যায়। এইরূপ হ্রদ বহ্ন্যভাববান্ বলিলে বহ্ন্যভাবের আশ্রয়তার দ্বারা হ্রদের বিশেষরূপে যথার্থ পরিচয় হয় ; এবং সেইজন্য এই আশ্রয়তাও যে হ্রদের বিশেষ্যতা বা বিশেষণস্বরূপ, তাহা বলা যায়। তৃণহীন প্রান্তর, নদীহীন দেশ, কেশহীন মস্তক, ইত্যাদি বলিলেও তৃণাভাবের, নদ্যভাবের বা কেশাভাবের আশ্রয়তার সাহায্যে প্রান্তর বা দেশ বা মস্তকের বিশেষরূপে যথার্থ পরিচয় হইয়া থাকে। অতএব, আমরা অভাবের আশ্রয়তাকে বিশেষ্যতা বা বিশেষণস্বরূপ বলিতে পারি, এবং ইহার দ্বারা যে তাহার আশ্রয়ের বিশেষরূপে যথার্থ পরিচয় হয় তাহাও আমরা বলিতে পারি। এখন, এই বিশেষ্যতা অলীকের থাকিতে পারে না। ইহা অলীকস্বরূপ হইতে পারে না। ইহা অলীকের থাকিতে পারে না—কারণ অলীক স্বরূপ রহিত, নিরূপাখ্য। কোনও বিশেষণের দ্বারাই তাহাকে পরিচিত করা যায় না। গগন কমলকে শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত প্রভৃতি কোন বিশেষণের দ্বারাই আমরা পরিচিত করিতে পারি না। উহা বিশেষণের সাহায্যে পরিচিত হইবার একান্ত অযোগ্য। এইরূপ বিশেষ্যতা অলীক স্বরূপও হইতে পারে না। কারণ, নিঃস্বরূপ অলীকের দ্বারাও কোন বস্তু যথার্থরূপে পরিচিত হইতে পারে না। তুমি তোমার প্রিয়াকে, যে মোহিনীটি লীলাভরে হস্তে গগন কমল ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, সে মোহিনীটি বলিয়া পরিচিত করিতে পার কি ? অতএব, অভাবের আশ্রয়তারূপ যে বিশেষ্যতা তাহা না পারে অলীকের থাকিতে, না পারে অলীক স্বরূপ হইতে। এখন ঈশ্বর যদি প্রকৃতই অলীক হন তাহা হইলে নাই, এই অভাবের আশ্রয়তা নামক বিশেষ্যতা তাঁহার থাকিবে না। তিনি এইরূপ বিশেষ্যতার দ্বারা উল্লিখিত হইবার একান্ত অনুপযুক্ত হইবেন। সংক্ষেপে, অভাবের আশ্রয়তা বিশেষ্যতা বা বিশেষণ স্বরূপ। ইহা কোনও অলীকের ধর্ম হইতে পারে না। ঈশ্বর যদি অলীক হন, তাহা হইলে তাঁহাতে কোন অভাবেরই আশ্রয়তা থাকিতে পারে না। অতএব, অলীক ঈশ্বর নাই, বা অস্তিত্বাভাবরূপ অভাবের আশ্রয়, ইত্যাদি কথা অর্থহীন।

ইহা শুনিয়া তুমি হয়ত ভাবিবে, যে অনেক কথাই বলা হইতেছে বটে, কিন্তু মনে তেমন লাগিতেছে না। যাহা বলা হইয়াছে, তাহা যদি ঠিক বুঝিয়া থাকি, তাহা হইলে কোন কিছুকেই অস্তিত্বাভাব বিশিষ্ট বলা যাইবে না, একান্ত অসৎ বলিয়া কোন কিছুই থাকিবে না, অসতের কোন খ্যাতি হইবে না. কোন দিনই ইহা কোন জ্ঞানে ভাসিবে না। কিন্তু ইহা কি হইতে পারে? তোমার এই প্রশ্নের উত্তরে ন্যায়াচার্যগণ বলিবেন, যে হইতে পারে কেন, ইহাই ত' হইতেছে? যাহা একান্ত অসৎ তাহার কোন খ্যাতি হয় না, তাহা কোন দিনই জ্ঞানে ভাসমান হয় না। একান্ত অসতের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। ইহা কোনও প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না। কারণ, প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে বিষয় এবং তাহার সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ কারণ হইয়া থাকে—কিন্তু অসতের কোনও কারণতা নাই, ইহা কোন কিছুরই কারণ হইতে পারে না, এবং ইহার সহিত কোনও ইন্দ্রিয়ের কোনও সন্নিকর্ষও হইতে পারে না। অনুমিতিতে অসৎ ভাসমান হইতে পারে না। কারণ, অনুমিতি হইতে হইলে ব্যাপ্তিজ্ঞান থাকা আবশ্যক। পর্বত বহ্নিমান্, এই অনুমিতি আমার হইতে পারে কারণ যে ধূমবান্ সেই বহ্নিমান, এই জ্ঞান, ধূম ও বহ্নির মধ্যে যে ব্যাপ্তিনামক সম্বন্ধ রহিয়াছে এই জ্ঞান, আমার আছে। কিন্তু অসতের ক্ষেত্রে এই জ্ঞান থাকিতে পারে না। কারণ, সম্বন্ধ সত্তা সম্বন্ধী সত্তার অধীন। সম্বন্ধী না থাকিলে সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। সুতরাং অসতের সহিত কাহারও কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। অসদ্বিষয়ক কোন ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে পারে না। অসৎ অনুমিতিতেও ভাসিতে পারে না। সংসর্গ মর্যাদায় যে ইহা জ্ঞানে ভাসমান হয়, অসৎ যে শাব্দজ্ঞানের বিষয় হয়, তাহাও বলিতে পারা যায় না।[১] বস্তুতঃ জ্ঞান বিষয়ত্ব অস্তিত্বের ব্যাপ্য। জ্ঞান বিষয়ত্বের অধিকরণে অস্তিত্বের অভাব থাকে না, যাহা একান্ত অসৎ তাহা জ্ঞানের বিষয় হয় না। সেইজন্য ঈশ্বরকে পক্ষ করিয়া, অস্তিত্বাভাবকে সাধ্য করিয়া কোনও অনুমান করিতে চাহিলে হয় পক্ষাসিদ্ধি নয় বাধদোষ ঘটিবেই। ঈশ্বরকে পক্ষ করিয়া কোন অনুমানের সাহায্যে ঈশ্বর নাই, ইহা প্রমাণ করা যায় না।

অসত্যের কোন খ্যাতি নাই।

এইরূপ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বা কোন কিছুকে পক্ষ করিয়া, এবং ঈশ্বরাভাবকে সাধ্য করিয়া যে কোনও অনুমান করিব, তাহাও হইবে না। ইহা অবশ্য সত্য যে এইরূপ অনুমানস্থলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সিদ্ধ পদার্থ বলিয়া হেতুটি পক্ষাসিদ্ধি দোষ দুষ্ট হইবে না। এবং ঈশ্বর যদি অলীক হন, তাহা হইলে সাধ্যাভাব (ঈশ্বর) বিশিষ্ট বিশ্বব্রহ্মাণ্ড

১। এই প্রসঙ্গে অনতিবিস্তারে আলোচনা দ্বিতীয় খণ্ডে করা হইবে; পাশ্চাত্য দর্শনে মাইনং রাসেল প্রভৃতি কি বলেন তাহাও দেখিবার চেষ্টা করা হইবে।

অলীক বলিয়া বাধ দোষও হইবে না। কিন্তু তাহা হইলেও অনুমানটি সদ্ধেতুক হইবে না। কারণ, ইহার অনুমাপক হেতু সাধ্যাপ্রসিদ্ধি দোষ দুষ্ট হইবে। অর্থাৎ ঈশ্বর যদি প্রকৃতই অলীক হন, তাহা হইলে ঈশ্বর নাই বলিয়া কোন অভাব হইতে পারিবে না। কারণ, আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে যাহা অলীক তাহা বিশেষণের কার্য করিতে পারে না। প্রত্যেক অভাবের ক্ষেত্রেই তাহার প্রতিযোগী বিশেষণের কার্য করিয়া থাকে। আমরা ঘটাভাবের প্রতিযোগী ঘটের সাহায্যেই অন্য কোনও অভাব হইতে তাহাকে পৃথক করিয়া থাকি। বস্তুতঃ প্রতিযোগীকে বিশেষণরূপে বিষয় করিয়াই আমাদের অভাবের জ্ঞান হইয়া থাকে। প্রতিযোগীর দ্বারা বিশেষিত হইয়া জ্ঞানের বিষয় হওয়াই অভাবের স্বভাব। সুতরাং অলীক প্রতিযোগিক অভাব হইতে পারে না। পুনরায়, কোনও অভাবের প্রতিযোগীকে এক অর্থে ঐ অভাবের আশ্রয় বলা যায়। ঘটাভাব যেমন ভূতলে থাকে, ঠিক সেইরূপ ঘট নামক প্রতি-যোগীগত প্রতিযোগিতা তাহারই নিরূপিত এবং নিরূপক বলিয়া, ঘটেও থাকে। এখন, আমরা একটু আগেই দেখিয়াছি যে কোনও অভাবের আশ্রয়তারূপ বিশেষ্যতা অলীকের থাকিতে পারে না। সুতরাং অলীক-প্রতিযোগিক-অভাব যে হইতে পারে তাহাও আমরা বলিতে পারি না। আরও দেখ, ঘট ঘটাভাবের প্রতি-যোগী, এইরূপ কথা যখন আমরা বলি, তখন ঘটাভাবের অভাব স্বরূপেই ঘটের জ্ঞান আমাদের হইয়া থাকে। ঘট জানিলে যেমন ঘটাভাব জানা যায় না, ঘটাভাব জানিলেও তেমনই ঘট জানা যায় না। ঘটের ব্যবহার হইলে ঘটাভাবের ব্যবহার হয় না, এবং ঘটাভাবের ব্যবহার হইলে ঘটেরও ব্যবহার হয় না। অতএব ঘট নাই বলিলে যেমন ঘটাভাব বুঝা হয়, ঠিক তেমনই ঘটাভাব নাই বলিলে ঘট বুঝা হয়। ঘটনিষ্ঠ ঘটাভাবের প্রতিযোগিতা ঘটাভাবের অভাব স্বরূপত্বই। অতএব, ঈশ্বর নাই, বলিয়া যদি কোন অভাব হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরনিষ্ঠ এই অভাবের প্রতিযোগিতা ঈশ্বরাভাবের অভাব স্বরূপত্বই হইবে ; এবং আমরা কোথায় আসিয়া উপস্থিত হইব ? ঈশ্বর অলীক, অতএব স্বরূপরহিত, অতএব বিশেষণ হইবার একান্ত অযোগ্য, অতএব তাহার অভাব তাহাও অলীক, এবং তাহার অভাবস্বরূপত্ব তাহাও অলীক। অতএব, অলীকে অলীকে ধূল পরিমাণ, পূর্বপক্ষীর কথা নিষ্প্রমাণ। সংক্ষেপে, যে অনুমানের কথা আমরা ভাবিতেছি, তাহার অনুমাপক হেতুটি সাধ্যাপ্রসিদ্ধি দোষে দুষ্ট। ঈশ্বর নাই, এই কথাটির অনুমাপক কোন হেতু নাই।

এখন হয়ত তুমি বলিবে যে আমার মতে ঈশ্বর সত্যই অলীক ; সুতরাং ঈশ্বরকে পক্ষ করিয়া কোনও অনুমান করিতে চাহিলে পক্ষাসিদ্ধি দোষ হয় ; এবং ঈশ্বরা-ভাবকে সাধ্য করিয়া কোন অনুমান করিতে চাহিলে সাধ্যাপ্রসিদ্ধি দোষ ঘটে।

কিন্তু প্রকৃত কথা হইতেছে এই যে আমার অভিমত ঈশ্বর বা তাঁহার অভাব, আমার অনুমানের পক্ষ বা সাধ্য নহে। তোমাদের আগমে বা দর্শনে ঈশ্বর কথাটি ব্যবহার করা হয়। অতএব তোমাদের নিকট ঈশ্বর প্রসিদ্ধ এবং তাহাই আমার অনুমানের পক্ষ, তাঁহার অভাবই আমার সাধ্য। সুতরাং আমার অনুমান অসদ্ধেতুক হইতে পারে না। এইরূপ কথা যে তোমরা বলিবে তাহা হইবে না। কারণ আগমে প্রসিদ্ধ ঈশ্বরকে তুমি পক্ষ করিতে পার যদি আগমকে তুমি প্রমাণ বলিয়া স্বীকার কর। এবং আগমকে যদি প্রমাণ বল, তাহা হইলে আর ঈশ্বর নাই বলিতে পার না। আগম প্রমাণ হইলে তোমার অনুমান বাধিত এবং প্রমাণ না হইলে পক্ষাসিদ্ধি দোষে দুষ্ট। এইরূপ আমাদের দর্শনের ঈশ্বরকেও তুমি অনুমানের পক্ষ করিতে পার না। কারণ, তাঁহাকে পক্ষ করিতে হইলে প্রথমে তাঁহাকে বুঝিতে হইবে, এবং তাঁহাকে বুঝিতে হইলে যে যে হেতুর সাহায্যে আমরা তাঁহাকে সাধন করিয়া থাকি, সেই হেতুগুলিকে বুঝিতে হইবে। এখন, এই হেতুগুলিতে যদি তুমি কোন দোষ দেখাইতে না পার, তাহা হইলে ঈশ্বর নাই, এই কথা তুমি আর বলিতে পারিবে না। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে আমাদের অনুমানের হেতুগুলি নির্দোষ। পূর্বপক্ষীগণ তাহাদের বিরুদ্ধে যে সকল দোষ উদ্ভাবন করিয়া থাকেন, বিনা আয়াসেই সেই দোষগুলি হইতে তাহাদের উদ্ধার করা যায়। অতএব আমাদের দর্শনে প্রসিদ্ধ ঈশ্বরকে পক্ষ করিয়াও তুমি কোন অনুমানের সাহাযো দেখাইতে পার না যে ঈশ্বর নাই। তুমি হয়ত জিজ্ঞাসা করিবে যে শূন্য, প্রকৃতি, মায়া প্রভৃতি যে নাই, তাহা আমরা কি করিয়া প্রমাণ করি। তোমার এই প্রশ্নের উত্তর অতি সহজ। শূন্য প্রভৃতি তত্ত্বের সপক্ষে যে সকল অনুমান প্রয়োগ করা হয়, তাহারা যে সদ্ধেতুক অনুমান নহে, তাহা দেখাইয়া। অতএব, আমাদের পন্থা গ্রহণ করিতে চাহিলে তোমাকেও আমাদের হেতুর দোষ দেখাইতে হইবে। কিন্তু তাহা তুমি পার না। সুতরাং অনুমানের সাহায্যে ঈশ্বর নাই, ইহা তুমি বলিতে পার না।

এখন তুমি যে বলিবে যে সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের সদৃশ কোন কিছুই নাই বলিয়া উপমান প্রমাণ ঈশ্বরের বাধক, তাহা হইবে না। কারণ, উপমান প্রমাণের সাহায্যে কেবল পদের বাচ্যতার বা কোন পদ কোন পদে শক্ত, তাহারই জ্ঞান হইয়া থাকে। সেইজন্য ইহা কখনও ঈশ্বরের বাধক হইতে পারে না। শ্রুতিও ঈশ্বরের বাধক হইতে পারে না। ইহা অবশ্য সত্য যে পূর্বপক্ষীগণ শ্রুতিকে শূন্য বা মায়া বা প্রকৃতি প্রভৃতির সাধক প্রমাণরূপে ব্যবহার করেন। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে শ্রুতির রহস্য মনন না করিলে অনুধাবন করা যায় না। ঈশ্বর জগতের কর্তা, ইহা

উপমান ঈশ্বরের বাধক প্রমাণ হইতে পারে না।

যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া যুক্তি পরিশুদ্ধ ঐ অর্থের অনুকূলেই শ্রুতির তাৎপর্য নির্ণয় করিতে হয়। বস্তুতঃ ঈশ্বর যে জগতের কর্তা এইরূপ উক্তি শ্রুতিতে ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। এইজন্য শ্রুতিকে ঈশ্বরের বাধক প্রমাণ বলা যায় না। ইহা প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বরকে জগতের কর্তারূপেই সাধন করিয়া থাকে।

শ্রুতিও ঈশ্বরের বাধক নহে।

ঈশ্বরানুমানগুলি সদ্বেতুক। ঈশ্বরের কোন বাধক প্রমাণ নাই। ঈশ্বর যে জগতের নিমিত্ত কারণ, এই কথাই গ্রাহ্য।

আকর গ্রন্থ পঞ্জী।

(১) ন্যায় কুসুমাঞ্জলি—দ্বিতীয় স্তবক, তৃতীয় স্তবক এবং পঞ্চম স্তবক—প্রকাশ, সৌরভ এবং তর্কবাগীশ বিবৃতি সহ।

(২) ভাষা পরিচ্ছেদ—প্রথম কারিকা, মুক্তাবলী, দিনকরী, রামরুদ্রী এবং মুক্তাবলী-সংগ্রহ সহ।

(৩) গাদাধরী সামান্য নিরুক্তির ন্যায়াচার্য পণ্ডিত শ্রীশিবদত্তমিশ্রের গঙ্গা-ব্যাখ্যার ভূমিকা।

(৪) ন্যায়বার্তিক, টীকাসহ ২য় খণ্ড ১৪৫—৬ (কলিকাতা সংস্কৃত সিরিজ সংস্করণ)

প্রথম খণ্ড। সপ্তম অধ্যায়।

উপসংহার

ন্যায়দর্শনে আলোচিত কয়েকটি ঈশ্বরানুমান আমরা দেখিলাম। এখন আমরা পাশ্চাত্ত্য দর্শনে বিশেষ প্রচলিত কয়েকটি ঈশ্বরানুমানের কথা আলোচনা করিতে পারি। পাশ্চাত্ত্যদর্শনে যে নিরীশ্বরবাদ নাই তাহা নহে; তবে অধিকাংশ পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকই ঈশ্বর বিশ্বাসী। ইহার ঐতিহাসিক কারণ অবশ্যই আছে। কিন্তু তাহা লইয়া এখানে কোন কথা বলার প্রয়োজন নাই। এখানে কেবল এইটুকু বলিলেই চলে যে অধিকাংশ পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকই ঈশ্বরে বিশ্বাসী; মননের সাহায্যে তাঁহারা অনেকেই বিশুদ্ধ ঈশ্বর রস আস্বাদন করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহাদের এই মননের কোনও পরিচয় এখানে দেওয়া সম্ভব হইবে না। কারণ, পাশ্চাত্ত্যে সম্প্রদায়কে অবলম্বন করিয়া দর্শন পুষ্ট হয় নাই। ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়াই বিকাশ লাভ করিয়াছে। সেইজন্য পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ঈশ্বর মননের কোনও পরিচয় দিতে হইলে অনেক দার্শনিক যে অনেক কথা বলিয়াছেন, তাহাই বলিতে হয়। উপরন্তু কোনও দার্শনিকের দর্শনেই ঈশ্বর তত্ত্বটি সেই দর্শনে স্বীকৃত অন্যান্য তত্ত্ব নিরপেক্ষ নহে। বস্তুতঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঈশ্বর তত্ত্বটি অন্যান্য তত্ত্বের সহিত এমন নিবিড় ভাবে জড়াইয়া আছে, যে অন্যান্য তত্ত্বের উল্লেখ না করিয়া ঈশ্বর তত্ত্বের উল্লেখ করাই যায় না। অতএব, পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ঈশ্বর মননের পরিচয় দিতে চাহিলে প্রায় সমগ্র পাশ্চাত্ত্য দর্শনেরই পরিচয় দিতে হয়। কিন্তু তাহা বর্তমানে করা যাইতে পারে না। সেইজন্য আমরা পাশ্চাত্ত্য দর্শনে প্রচলিত কয়েকটি ঈশ্বরানুমান, যাহাদের আলোচনা পরীক্ষার্থীদের জন্য লিখিত সাধারণ গ্রন্থেও দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের লইয়া কিছু আলোচনা করিব। এই আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্য হইল এই যে ইহার সাহায্যে ন্যায়মত বুঝিতে কিছুটা সুবিধা হইতে পারে। পাশ্চাত্ত্য দর্শনে সাধারণতঃ চারিটি ঈশ্বরানুমান দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের আমরা কার্যত্ব হেতুক, বিন্যাস হেতুক, প্রত্যয় হেতুক, এবং প্রবৃত্তি হেতুক অনুমান বলিতে পারি।

ভূমিকা

কার্যত্ব হেতুক অনুমানটির মূল কথা হইল এই যে জগৎ একটি কার্য। কার্য বলিতে এখানে উৎপাদ বিনাশশীল পদার্থই বুঝা হয়। যে জগতের আমরা অধিবাসী, তাহা যে উৎপাদ বিনাশশীল পদার্থে পরিপূর্ণ তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এই জগতে এই আছে এই নাই; উৎপন্ন হইল এবং নষ্ট হইয়া গেল, এইরূপ

পদার্থ সর্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। শুধু তাহাই নহে। পরিবর্তিত হইতেছে না, ক্ষয় পাইতেছে না, অম্লান অক্ষয় হইয়া থাকিতেছে এইরূপ কোন কিছু আমাদের লৌকিক জগতে দেখিতে পাওয়া যায় না। দীপশিখাই কেবল অন্ধকার অভিমুখে পূর্ণ গতিতে ধাবমান নহে, নৃত্যশীলা তটিনীই যে কেবল বিরাম বিহীন গতিতে ঊর্মিমুখর অশান্ত সমুদ্রের পথে ছুটিয়া চলিয়াছে তাহা নহে, অচল গিরিরাজও অনিত্য। তাহারও ক্ষয় আছে, ব্যয় আছে, বিনাশের মুখে সেও চলিয়াছে। আমাদের এই দৃশ্যমান লৌকিক জগতে সব কিছুই অস্থির, চঞ্চল, বিনাশী, পরিবর্তনশীল। কাল তাহাদের সকলকেই সর্বদাই কলন করিতেছে। জগৎ অনিত্য। এই বোধ হইতেই ঈশ্বর চেতনার জন্ম। জগতের অনিত্যতা চঞ্চলতা আমাদিগকে অস্থির করে, আমাদের শ্বাসরোধ করিয়া দেয়, আমরা নিত্য ধনের সন্ধানে বাহির হই। আমরা বুঝিতে পারি লৌকিক পদার্থগুলি অপূর্ণ বলিয়াই অনিত্য, সসীম বলিয়াই অস্থির, সাপেক্ষ বলিয়াই কাদাচিৎক। তাই আমরা পূর্ণকে, অসীমকে, অসঙ্গকে খুঁজি। নিত্য পরিবর্তনশীল জগৎ আমাদের অসহায় করিয়া তুলে, আমরা নিত্যকে অপরিবর্তনীয়কে ধ্রুবকে সহায় রূপে খুঁজি। অস্থির জগৎ আমাদের অশান্ত করে, আমরা স্থির সত্যে শান্তি পাইতে চাহি। জগতের চাঞ্চল্য আমাদের বিকল করে, আমরা অব্যয়কে আশ্রয় করিয়া আমাদের সুপ্ত আত্ম শক্তিকে জাগ্রত করিতে চাহি। যাহাই হউক, লৌকিক জগতের অনিত্যতা বোধ হইতেই ঈশ্বর চেতনার উদ্ভব। লৌকিক জগৎকে যখন আমরা অনিত্য বলিয়া বুঝি, তখনই বুঝি যে ইহা স্বয়ং-সম্পূর্ণ নহে, অনন্যসিদ্ধ নহে, অন্য নিরপেক্ষ নহে। এবং ইহার সহিত আরও বুঝি যে স্বয়ং-সম্পূর্ণ, অনন্যসিদ্ধ, অন্যনিরপেক্ষ কিছু না থাকিলে চলে না। স্বয়ং-সম্পূর্ণ কিছু আছে বলিয়াই অ স্বয়ং-সম্পূর্ণও আছে, অনন্যসিদ্ধ কিছু আছে বলিয়াই, অন্যসিদ্ধও আছে, অন্য নিরপেক্ষ কিছু আছে বলিয়াই অনন্য নিরপেক্ষও আছে। সেই কিছুটিরই নাম ঈশ্বর। স্থির ঈশ্বর আছেন বলিয়াই অস্থির জগৎ রহিয়াছে, নিত্য ঈশ্বর আছেন বলিয়াই অনিত্য জগৎ সম্ভব হইয়াছে। তটিনীর উচ্ছল প্রবাহ যেমন তাহার আশ্রয় বা খাতেই প্রবাহিত হয়, বৃক্ষ উন্মূলিত হয় না বলিয়াই যেমন তাহার শাখা আন্দোলিত হইতে পারে, পদতল হইতে ধরণী অপসারিত হয় না বলিয়াই যেমন আমরা যাওয়া আসা করিতে পারি, ঠিক তেমনই নিত্য অচঞ্চল ঈশ্বর রহিয়াছেন বলিয়াই অস্থির জগৎ থাকিতে পারিয়াছে। অতএব জগতের অনিত্যতা বা কার্যত্বকে হেতু করিয়া ঈশ্বর সাধন করা যায়।

এই কার্যত্ব হেতুক অনুমানের দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধ হয় বটে, কিন্তু এই ঈশ্বরে আমাদের মন ভরে না। যে ঈশ্বর ক্ষুধা আমাদের রহিয়াছে, ঈশ্বর প্রেমিকগণ যে

ঈশ্বর প্রেমে বিভোর হইয়া রহিয়াছেন, এই অনুমানের সাধ্যের ঘটকরূপ ঈশ্বর ঠিক সেই ঈশ্বর নহেন। ইনি জগতের কারণমাত্র। ইনি নিত্য, অসীম, অচঞ্চল, স্বয়ং-সম্পূর্ণ, অনন্যসিদ্ধ ও অন্যনিরপেক্ষ। কিন্তু ইনি যে আত্মার আত্মীয়. চেতন কোনও পদার্থ, তাহা বুঝা যায় না। ইনি যে ঘট পটের মত অচেতন নহেন, ঈশানের পুঞ্জ মেঘের মতন নিষ্ঠুর নহেন, গিরিরাজের মত মানুষের সুখ দুঃখের প্রতি উদাসীন নহেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। এইখানেই পাশ্চাত্ত্য দর্শনের কার্যত্ব হেতুক অনুমান হইতে ন্যায় দর্শনের কার্যত্ব হেতুক অনুমানটির একটি মৌলিক পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। ন্যায় দর্শনে কার্যত্ব হেতুক অনুমানের সাধ্য, জ্ঞান, ইচ্ছা ও যত্ন-বিশিষ্ট কর্তা। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য দর্শনের কার্যত্ব হেতুক অনুমানের সাধ্য অনন্যসিদ্ধ, স্বয়ংসম্পূর্ণ, সর্বোৎকৃষ্ট শক্তিশালী কারণ। এই জন্যই ন্যায়দর্শনে কার্যত্ব হেতুক অনু-মানের দ্বারাই ঈশ্বর যে আত্মান্তর, তিনি যে আত্মা জাতীয়, ইহাও সিদ্ধ হয়। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য দর্শনে কার্যত্ব হেতুক অনুমানটির দ্বারা এইরূপ কোনও পদার্থ সিদ্ধ হয় না। অবশ্য কোন কোন পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক বলিয়াছেন যে জড়ের কোন কারণতা নাই। সকল কারণতাই শেষ পর্যন্ত চেতন প্রযত্নাশ্রয়েরই কারণতা। সুতরাং কার্যত্ব হেতুক অনুমানটি কেবল অনিত্য জগতের যে নিত্য কারণ আছে তাহাই প্রমাণ করে না, এই নিত্য কারণ যে আত্মা, সচেতন, তাহাও প্রমাণ করে। ইহাদের কথার সহিত ন্যায়াচার্যগণের কথার অনেক মিল আছে। কিন্তু তাহা হইলেও ইহারা কারণ বলিতে শক্তিমানকেই বুঝেন বলিয়া ন্যায়মত হইতে এই মতেরও যে অনেক পার্থক্য রহিয়াছে, তাহা বলিতে হয়। অর্থাৎ এই সকল পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকদের মতে কারণ বলিতে শক্তিপ্রয়োগকারী উৎপাদককেই বুঝিতে হইবে। যাহা উৎপাদক নহে, শক্তিপ্রয়োগ করে না, কেবল কার্যটি ঘটিবার পূর্বে উপস্থিত থাকে, তাহাকে কারণ বলা যায় না। অতএব, কারণ মানেই শক্তিমান্। কিন্তু এই শক্তি কিরূপ পদার্থ? অচেতন জড়ের কি কোন শক্তি থাকিতে পারে? অবশ্যই পারে না। শক্তি যদি কোন জড় পদার্থ হইত, অচেতন জড়ের যদি কোন শক্তি থাকিত, তাহা হইলে বহিরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে তাহার প্রত্যক্ষ হইত। কিন্তু শক্তির এইরূপ কোন প্রত্যক্ষ হয় কি? আমরা অনেকেই ভাবিয়া থাকি যে শক্তি আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু আসলে আমরা শক্তির কাজ দেখিতে পাই, শক্তি দেখিতে পাই না। একটি মসৃণ বিলিয়ার্ড টেবিলের উপর একটি গতিশীল বল যখন একটি স্থির বলকে স্পর্শ করে, তখন সেই স্থির বলটি যে গতিশীল হয় তাহাই আমরা দেখি। কিন্তু কোন শক্তি আমরা দেখি কি? একটি বল হইতে শক্তি বলিয়া কোন কিছু স্থানান্তরিত হইল, অন্য বলটিকে আশ্রয় করিল. এইরূপ কোন প্রত্যক্ষ আমাদের কাহারও হয় কি?

অবশ্যই হয় না। আমরা কেবল ইহাই দেখিয়া থাকি যে প্রথম বলটি দ্বিতীয় বলটিকে স্পর্শ করিল এবং তাহার পর দ্বিতীয় বলটি গতিশীল হইল। সংক্ষেপে শক্তি বাহ্য প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। কিন্তু সেইজন্য যে ইহা কোন প্রত্যক্ষেরই বিষয় নহে, তাহা বলা যায় না। মানস প্রত্যক্ষের বিষয় শক্তি হইয়া থাকে। আমরা যখন ইচ্ছা-পূর্বক কোনও কার্য করি তখন শক্তির অনুভব আমাদের হয়। শক্তি মানস প্রত্যক্ষের বিষয়। ইহাও একটি চেতন পদার্থ বা চেতনে আশ্রিত পদার্থ। চেতনেরই শক্তি থাকিতে পারে। অচেতনের কোনও শক্তি নাই। সেইজন্য সকল কারণতাই শেষ পর্যন্ত চেতনেরই কারণতা, অচেতনের কোন মুখ্য কারণতা নাই। অতএব, এই সকল পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকগণের মতে ঈশ্বরকে যখন জগতের কারণ বলিয়া প্রমাণিত হয়, তখন ঈশ্বর যে চেতন তাহাও প্রমাণিত করা হয়। ঈশ্বর চেতন বলিয়া জগতের কারণ, বা জগতের একজন চেতন কারণ প্রয়োজন, এবং যিনি সেই কারণ, তিনিই ঈশ্বর। এই সকল দার্শনিকগণের কথার সহিত ন্যায়াচার্যগণের কথার যে অনেক মিল আছে তাহা সত্য। কার্যত্ব হেতুর সাধ্য যে সকর্তৃকত্ব, চেষ্টা নামক শরীর ক্রিয়ার মত সকল ক্রিয়াই যে চেতন-প্রযত্ন-পূর্বক, ইত্যাদি কথা ন্যায়াচার্যগণও বলিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের মতে কারণ মানে শক্তিমান নহে। যাহার ক্রিয়া নাই, তাহাও কারণ হইতে পারে। আকাশ তাহার অবস্থিতির দ্বারা শব্দের সমবায়ী কারণ, অভাব পদার্থও অবস্থিতির দ্বারা কারণ হইয়া থাকে। শুধু তাহাই নহে, ন্যায়াচার্যগণ কারণের কারণতা অতিরিক্ত কোন শক্তি মানেন না। অতএব, এই সকল পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক যেরূপে কার্যত্ব হেতুক অনুমানের সাহায্যে জগতের চেতন কারণরূপ ঈশ্বর সাধন করিয়া থাকেন, ন্যায়াচার্যগণ সেইরূপে আত্মান্তররূপ ঈশ্বর অনুমান করেন না। তাঁহারা কেবল এই কথাই বলেন যে অট্টালিকা প্রভৃতি কার্য দ্রব্য যেমন উপাদান অভিজ্ঞ চিকীর্ষা ও যত্নবান কর্তা-জন্য সেইরূপ সকল কার্যই ক্ষিত্যাদিও, এইরূপ কর্তা-জন্য। অতএব, পাশ্চাত্ত্য দর্শনে প্রচলিত কার্যত্ব হেতুক অনুমানটি হইতে ন্যায় দর্শনের তুল্য অনুমানটির বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে আরও অনেক কথা বলিবার রহিয়াছে। কিন্তু সব বলিয়া উঠা যাইবে না। আমরা কেবল আর একটি কথা বলিয়া বিন্যাস হেতুক অনুমানে উপস্থিত হইব। ন্যায়মতে ঈশ্বর জগতের উপাদান কারণ নহেন, অচেতন ক্ষিতি প্রভৃতি পরমাণু হইতে তিনি জগৎ নির্মাণ করিয়া থাকেন। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য দর্শনে ঈশ্বরকে সাধারণতঃ উপাদান কারণ বলিয়াও কল্পনা করা হয়। অন্ততঃ তিনি যে উপাদান কারণ নহেন, এমন কথা স্পষ্ট করিয়া বলা হয় না। বস্তুতঃ পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকগণের রচনা পাঠ করিতে করিতে এই কথাই মনে হয় যে তাহারা যেন

সাংখ্যের অচেতন প্রকৃতির স্থলে ঈশ্বরকে বসাইয়া দিয়াছেন, এবং পুরুষ প্রসঙ্গে কোনও কথা বলিতে অনিচ্ছুক। কথাটিকে একটু খুলিয়া বলিতে হয়। সাংখ্যমতে জগতের উপাদান কারণ প্রকৃতি অচেতন; কারণ ঘট পটাদির ব্যক্ত জগৎ অচেতন। ন্যায়মতেও জগতের উপাদান কারণ ক্ষিতি প্রভৃতি চতুর্বিধ অচেতন পরমাণু। কারণ ক্ষিত্যঙ্কুর অচেতন। অদ্বৈতমতেও দৃশ্যজগৎ দৃশ্য বলিয়া. তাহাতে বুদ্ধি কুণ্ঠিত হয় বলিয়া ব্রহ্মের পরিণাম হইতে পারে না। এমন কি রামানুজাচার্য, যিনি ব্রহ্মকে জগতের উপাদান কারণ বলিয়া মনে করেন, তিনিও ব্রহ্ম যে চিন্মাত্র নহেন, তাহা বলিয়া থাকেন। অতএব, ভারতীয় আচার্যগণের মতে চেতন হইতে অচেতনের উদ্ভব হয় না। কারণ দ্রব্যের বিশেষ গুণপূর্বকই কার্য দ্রব্যের বিশেষ গুণ উৎপন্ন হয়। এইজন্য কেহই চেতন বা চিন্মাত্র পদার্থকে অচেতন জগতের উপাদান কারণ বলেন না। কিন্তু এই বিষয়ে পাশ্চাত্ত্য মত কি? যাঁহারা দ্বৈতবাদী তাঁহারা অবশ্য জগতের উপাদান কারণরূপে অচেতন জড়কে স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু সকল পাশ্চাত্য দার্শনিকই দ্বৈতবাদী নহেন। এবং কার্যত্ব হেতুক অনুমানটি কেবল দ্বৈতবাদী দর্শনেই ব্যবহৃত হয় না। তাই এই প্রসঙ্গে পাশ্চাত্ত্য দর্শনে একটি অতি জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হইতে দেখা যায়। অধিকাংশ ঈশ্বর বিশ্বাসী পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকই অদ্বৈতবাদী, monist. তাঁহাদের মধ্যে অনেকে সজাতীয় ভেদে বিশ্বাস করিলেও, বিজাতীয় ভেদে তাঁহারা কেহই বিশ্বাস করেন না। তাই অনেকে ঈশ্বর এবং অসংখ্য জীবাত্মা পারমার্থিক সৎ ইহা বলিলেও ঈশ্বর যে অচেতন জড় পদার্থ হইতে এই জগৎ তৈয়ারী করিয়াছেন, তাহা বলেন না। যাহাই হউক পাশ্চাত্ত্য দর্শনে অদ্বৈতবাদেরই বিশেষ প্রচলন। সজাতীয় না-অদ্বৈতবাদ স্বীকৃত হইলেও বিজাতীয় না-অদ্বৈতবাদ বিশেষ স্বীকৃতি পায় না। কিন্তু সেইজন্য পাশ্চাত্ত্য আচার্যগণ, ভারতীয় অদ্বৈতাচার্যগণের মত জগৎকে মায়াময় বা ব্রহ্মের বিবর্ত মাত্র বলিতেও ভরসা পান না। তাঁহাদের মতে জগৎ মায়া নহে, মিথ্যা নহে, সত্য। ঈশ্বর এই জগতের মধ্যে দিয়া নিজেকে প্রকাশ করেন। তাই পাশ্চাত্ত্য আচার্যগণ অদ্বৈতাচার্য-গণের মত নিস্তত্ত্বা কার্যমাত্রগম্যা সদসদ্ বিলক্ষণ অজ্ঞান হইতে এই জগৎ যে উদ্ভূত হইয়াছে, বা অজ্ঞানই যে এই জগতের উপাদান কারণ তাহা বলেন না। অবশ্য মাঝে মাঝে তাঁহারা বলিয়া উঠেন যে এই জগৎ মিথ্যা, illusion, ঈশ্বর বা ব্রহ্মের কোন পরিণাম নাই, যাহা সৎ তাহা নিত্য স্থির ইত্যাদি। কিন্তু তথাপি তাঁহাদের প্রাণের কথা এই যে এই জগৎ মিথ্যা নহে। ব্রহ্মে ইহার ত্রৈকালিক অভাব আছে, এইরূপ কথা অসঙ্গত। প্লেটো, স্পিনোজা, হেগেল প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকগণের দর্শনের মূল সুর ইহাই। যাহাই হউক, পাশ্চাত্ত্য দর্শনে জগৎ মিথ্যা, এই কথাটি

অকুণ্ঠ স্বীকৃতি পায় না। কিন্তু সেইজন্য অচিৎ যে ব্রহ্ম শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, এইরূপ রামানুজাচার্য সম্মত কথাও তাঁহারা বলেন না। সুতরাং তাঁহাদের একটি অদ্ভুত অবস্থার সম্মুখীন হইতে হয়। তাঁহাদের হয় বলিতে হয় যে চেতন হইতে অচেতনের আরম্ভ হইতে পারে, অথবা বলিতে হয় যে অচেতন বলিয়া কিছুই নাই। এখন, চেতন হইতে যে অচেতনের আরম্ভ হয়, প্রাগসৎ অচেতন যে চেতন হইতে উদ্ভূত হয়, ইহার দৃষ্টান্ত নাই; সেইজন্য প্রথম পক্ষটি সমর্থন করা যায় না। উপরন্তু পাশ্চাত্ত্য দর্শনাচার্যগণ মনে করেন যে যাহা পরে উৎপন্ন হয় তাহার গুণগত উৎকর্ষ থাকে। সাংখ্যের পরিণামবাদ, এবং পাশ্চাত্যের evolution এর মধ্যে এইস্থলে গুরুতর বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়। সাংখ্যকারগণ মনে করেন যে সূক্ষ্ম হইতে স্থূল হয়। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য আচার্যগণ, ইবলিউশন-বাদীগণ বলেন যে স্থূল হইতে সূক্ষ্ম হইয়া থাকে; আর এই সূক্ষ্মের মধ্যে দার্শনিকগণের বুদ্ধিও আছে বলিয়া, তাঁহারা বলিতে থাকেন যে যাহা পরে আসে তাহাই উৎকৃষ্ট। এইজন্য, তাঁহারা বলিতে পারেন না যে চেতন হইতে অচেতনের আরম্ভ হয়। বস্তুতঃ অচেতনের আরম্ভ হয় বলিলে জড়বাদীগণেরই সুবিধা হয় এবং ঈশ্বরবাদ বিসর্জন দিতে হয়। কারণ, চেতন হইতে অচেতনের আরম্ভ হয় ইহা যদি তুমি স্বীকার কর, তাহা হইলে অচেতন হইতে যে চেতনের আরম্ভ হইতে পারে, তাহাই বা তুমি স্বীকার করিবে না কেন? উপরন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞানে বলিতেছে যে এমন এক সময় ছিল যখন কোন জীব ছিল না। প্রাণের উদ্ভব বেশী দিন হয় নাই। অতএব, বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিশ্বদর্শন রচনা করিতে চাহিলে আমাদের বলিতে হয় যে প্রথমে জল স্থল শূন্যতল বাণীশূন্য প্রাণ-শূন্য ছিল, তখন কেবল অচেতন জড় ও তাহার ক্রিয়া বা অচেতন জড় ক্রিয়াই ছিল। তাহার পর অন্ধ ভূমিগর্ভ হইতে আদি প্রাণের আবির্ভাব হয়, এবং ক্রমে ক্রমে চেতনের উদ্ভব হইয়াছে। অতএব, আরম্ভবাদে বিশ্বাস করিতে চাহিলে উল্টা দিক হইতেই আরম্ভ করিতে হইবে। চেতন হইতে অচেতনের আরম্ভ হইয়াছে ইহা না বলিয়া অচেতন হইতেই যে চেতনের আরম্ভ হইয়াছে, তাহাই বলিতে হইবে। এইরূপ জড়বাদী আরম্ভবাদী দর্শনকে খণ্ডন করিতে হইলে ঈশ্বর বিশ্বাসী দার্শনিক-গণকে বলিতেই হইবে যে অচেতন হইতে চেতনের আরম্ভ হইতে পারে না। কিন্তু তাহা হইলে তাঁহারা ইহাও বলিতে পারিবেন না যে চেতন হইতে অচেতনের আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং তাঁহাদিগকে বলিতে হইবে যে অচেতন বলিয়া প্রকৃতপক্ষে কিছুই নাই। সবই চেতন। ধূলি হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশ্বর পর্যন্ত সব কিছুই চেতন, চিন্ময়। যাহা মৃন্ময়, তাহাও চিন্ময়। তবে চৈতন্যের মাত্রা আছে ইহা স্ফুটও হইতে

পারে, আবার অস্ফুটও হইতে পারে। ইহা অধিক স্ফুটও হইতে পারে আবার অল্প স্ফুটও হইতে পারে। জগতে অচেতন বা চেতন বিজাতীয় কোন পদার্থ নাই। যাহাকে আমরা অচেতন বলি তাহা প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত অস্ফুট চৈতন্য ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। সুতরাং পূর্ণ চৈতন্য ঈশ্বর জগতের উপাদান কারণ হইতে পারেন। যাহাই হউক, অধিকাংশ পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মতে ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ মাত্র নহেন। তিনি উপাদান কারণও বটেন। কিন্তু সেইজন্য অচিৎও যে ঈশ্বর শরীরের অংশ তাহা বলিতে হয় না। অবশ্য কোন কোন পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক খোলাখুলি দ্বৈতবাদী। তাঁহারা স্পষ্টই বলিয়া থাকেন যে ঈশ্বর অচেতন জড় হইতেই জগৎ নির্মাণ করেন। আবার দুই-একজন পাশ্চাত্য দার্শনিক এই প্রসঙ্গে ঢোক গিলিয়া কথা বলেন। তাঁহারা অচেতন বলিতে অত্যন্ত অস্ফুট চেতন বুঝিতে চাহেন না ; কিন্তু সেইজন্য দ্বৈতবাদও গ্রহণ করেন না, বা জগৎ যে মায়াময়, অথবা অচিৎও ঈশ্বর শরীরের অংশ, তাহাও বলেন না। যাহাই হউক ন্যায়দর্শনে ঈশ্বরগত কারণতার যে ভাবে কল্পনা করা হয়, পাশ্চাত্ত্য দর্শনে ঠিক সেইরূপ কোন কল্পনা দেখিতে পাওয়া যায় না। একমাত্র এ্যানাক্সাগোরাসকেই এইরূপ কথা বলিতে দেখা যায়। কিন্তু তিনি অতি প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক। তাঁহার দর্শনের ব্যাপকতা অল্প। গভীরতাও যে তেমন আছে তাহা বলা যায় না। পুনরায়, তাঁহার পরমাণুবাদ ও ঠিক ঠিক ন্যায় দর্শনের পরমাণুবাদের মত নহে। ন্যায়াচার্যগণ চারি প্রকার পরমাণুকে জগতের উপাদান কারণ বলেন ; কিন্তু এ্যানাক্সাগোরাসের মতে ঈশ্বর অসংখ্য প্রকার পরমাণুকে বিন্যস্ত করিয়া জগৎ নির্মাণ করিয়া থাকেন। যাহাই হউক, এ্যানাক্সাগোরাসের কথার সহিত ন্যায়াচার্যগণের কথার কিছু মিল আছে। কিন্তু তথাপি তাঁহার দর্শনের সহিত ন্যায়াচার্যগণের কথার তুলনা করিতে যাওয়া অসুস্থ অবিচারী মনের পরিচয় দেওয়া। কারণ, এরিষ্টটল এ্যানাক্সাগোরাসের বিশেষ প্রশংসা করিলেও, আমরা তাঁহাকে প্রথম শ্রেণীর দার্শনিক বলিয়া মনে করিতে পারি না। তাঁহার দর্শনের ব্যাপকতার অভাব পীড়াদায়ক। তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাকে বিচার মুখে দাঁড় করাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা যে করিয়াছেন, তাহাও বলা যায় না। অগণিত রত্নের আকর বিশাল জলধি সদৃশ ন্যায়দর্শনের সহিত পাশ্চাত্ত্যের ক্ষুদ্র পল্বল সদৃশ এ্যানাক্সাগোরাসের দর্শনের কোন তুলনাই চলিতে পারে না। বাতুল পরীক্ষক নাবালক পরীক্ষার্থীগণকেই এইরূপ তুলনা ঘটিত প্রশ্ন করিতে পারেন। যাহাই হউক, পাশ্চাত্ত্য দর্শনের কার্যত্ব হেতুক অনুমানটি উপাদান অভিজ্ঞ কর্তা সাধ্যক অনুমান নহে ; এবং এইজন্যই ন্যায় দর্শনের কার্যত্ব হেতুক অনুমানটির একান্ত সদৃশ অনুমান নহে।

আর একটি মাত্র কথা বলিয়া বিন্যাস হেতুক অনুমানটির আলোচনা করিব এইরূপ প্রতিজ্ঞা যেন করিয়াছিলাম। কিন্তু এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিতেছি না। আরও একটি কথা বলিয়া বিন্যাস হেতুক অনুমানটির কথা বলিব। ইংরাজীতে Deism বলিয়া একটি কথা আছে। ইহার দ্বারা জগৎ ও ঈশ্বর সম্পর্কিত একটি বিশেষ মতবাদকে বুঝা হইয়া থাকে। এই মতে ঘড়ির নির্মাতার সহিত ঘড়ির যেমন সম্বন্ধ, এই বিশ্বের সহিত ঈশ্বরের সেইরূপ সম্বন্ধ। অর্থাৎ ঘড়ির নির্মাতা, টুকরা টুকরা ঘড়ির অংশগুলিকে একত্রিত করিয়া ঘড়ি নির্মাণ করিয়া থাকেন এবং ঘড়িটি নির্মিত হইয়া গেলে আর তাঁহার সহিত তাঁহার নির্মিত পদার্থের কোনও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে না। তাঁহার যদি খেয়াল যায়, ঘড়িটি যদি ঠিক মত না চলে, তাহা হইলে তিনি মাঝে মাঝে ঘড়িটির সহিত সম্পর্কে আসিতে পারেন। কিন্তু সহজ অবস্থায় তাঁহার সহিত ঘড়িটির কোন সম্বন্ধ থাকে না। ডীজম্ অনুযায়ী ঈশ্বর অণুপরমাণু বা অচেতন জড় পদার্থ, বা কোনও উপাদান কারণ হইতে এই জগৎ নির্মাণ করেন। তাহার পর তাঁহার সহিত আর এই জগতের কোন নিবিড় সম্বন্ধ থাকে না। তিনি মাঝে মাঝে এই জগতের তদারক করিলেও করিতে পারেন—তবে তাহা কোনও নিয়ম অনুযায়ী ঘটে না। ঘড়িটি নির্মাণের পর যেমন নির্মাতা নিরপেক্ষ হইয়া স্বীয় নিয়ম অনুযায়ী চলিয়া থাকে এই জগৎও তেমনই নির্মিত হইবার পর ঈশ্বর নিরপেক্ষ হইয়া গিয়া যে নিয়ম অনুযায়ী চলিবার জন্য ঈশ্বর ইহাকে নির্মাণ করিয়াছেন সেই নিয়ম অনুযায়ী চলিয়া থাকে। ইহাই ডীজ্‌মের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। ন্যায়দর্শনে ঈশ্বরের কারণতা কুম্ভকারের কারণতার সদৃশ বলিয়া বর্ণনা করা হয় বলিয়া অনেকে মনে করেন যে ন্যায়দর্শনে এই মতই সমর্থন করা হয়। কিন্তু এই কথা ঠিক নহে। এই জগতের ধৃতির হেতুও ঈশ্বর। তিনিই এই জগৎ সৃষ্টি করেন, পালন করেন, এবং সংহারও করেন। তাই পাশ্চাত্ত্য দর্শনে transcendent God বলিতে যাহা বুঝা হয়, সেইরূপ ঈশ্বর কোন ভারতীয় দর্শনেই স্বীকৃত হয় না, ন্যায়দর্শনেও হয় না। এইরূপ Pantheismও ন্যায় দর্শনের বা ভারতীয় দর্শনের সিদ্ধান্ত নহে। প্যান্থীজম্ বলিতে যাহা বুঝা হয় তাহা অল্প কথায় প্রকাশ করা যায় না। এইমতে ঈশ্বর নাই বলা হয়, না জগৎ নাই বলা হয়, তাহা নির্ণয় করা এক প্রকার অসম্ভব। স্পিনোজার দর্শন ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁহাকে কেহ বা বলিয়াছেন নিরীশ্বরবাদী কেহ বা বলিয়াছেন যে জগন্মিথ্যাবাদী। তাই এই মতের পরিচয় দেওয়া বিশেষ করিয়া অল্প পরিসরের মধ্যে, সহজ সাধ্য কার্য নহে। যাহা বলিতেছি তাহাতে কিঞ্চিৎ ন্যূনতা থাকিবেই। এই মতে জগৎই ঈশ্বর; এবং ঈশ্বরই জগৎ। ঈশ্বর হইতে যদি জগৎকে বিয়োগ করা যায় তাহা হইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা শূন্য। আবার

জগৎ হইতে যদি ঈশ্বরকে বিয়োগ করা যায় তাহা হইলেও যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা শূন্য। শুধু তাহাই নহে, ঈশ্বরের সহিত যদি আমরা জগৎকে যোগ করি তাহা হইলে যোগফল দুই হয় না, একই থাকে। ঈশ্বরের সহিত জগতের এইরূপ সম্বন্ধের নাম immanence। ন্যায় দর্শনে এইরূপ কথা বলা হয় না। ইহা সহজেই বুঝা যায়। কোনও ভারতীয় দর্শনেই এইরূপ কথা বলা হয় না। এই প্রসঙ্গে ভারতীয় দর্শনের বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীটি পুরুষসূক্তে বলা আছে সভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্। ঈশ্বর সকল কিছুকে ব্যাপিয়া থাকিলেও সকল হইতে দশ অঙ্গুলি অর্থাৎ পরিমাণের অতীত ঊর্ধ্বে অবস্থান করেন। ভারতীয় দর্শনে যে পান্‌থীজিমই নাই তাহা নহে থীজিমও নাই। থীজিম অনুযায়ী ঈশ্বর বাহ্যজগৎকে ব্যাপিয়া থাকিলেও, জীবাত্মাকে ব্যাপিয়া থাকেন না। এবং এইরূপ কোন কথা ভারতীয় দর্শনে পাওয়া যায় না। বহু ঈশ্বরবাদও ভারতীয় দর্শনে নাই। বেদে আমরা যে বহু দেব দেবীর কথা পাই, তাহা বহু ঈশ্বরবাদ নহে। সর্বত্রই একই সৎ পদার্থ যে বহু হইয়াছেন, এইরূপ কথা বলা হইয়া থাকে। যাঁহাকে স্তুতি করা হয় তিনিই যে সকল ইহা বলা হয়; এবং এই কথা পাঁচ আনির জমিদারের নিকট চাটুকারের বাজন্। তব যশো ভাতি দধিবৎ কথার মত নহে। ইহার রহস্য ভিন্ন। বহুমূর্তি রহস্য এই গ্রন্থের আলোচ্য নহে। বস্তুতঃ তাহা সাধন মার্গের পাথকের জন্যই; মনন মাগের পথিকের জন্য নহে। তাই এই আলোচনা হইতে আমরা বিরত থাকিলাম। আমরা কেবল এইটুকু বলিয়াই ক্ষান্ত হইব যে পাশ্চাত্ত্যের বিভিন্ন ইজম্ কোনও ভারতীয় দর্শনের স্কন্ধে চাপাইয়া দেওয়া অধিকাংশ সময়ই নিরাপদ নহে। পাশ্চাত্ত্য লেখকগণ ইহা প্রায়ই ভুলিয়া যান—এবং তাঁহাদের এই দেশীয় চেলাগণ যাঁহারা ভুলিয়াও মাতৃভাষার চর্চা করেন না, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্রে প্রবিষ্ট হইতে চাহেন না, অনুবাদ ও পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের টীকা টিপ্পনীর সাহায্যে অধ্যয়ন করিয়া থাকেন, তাঁহারা আরও সহজে ইহা ভুলিয়া যান। ইহা বিশেষ পরিতাপের বিষয়।

যাহাই হউক, পাশ্চাত্ত্য দর্শনের কার্যত্ব হেতুক অনুমানটি হইতে ন্যায়দর্শনের কার্যত্ব হেতুক অনুমানটির অনেক পার্থক্য আছে। ইহা আমরা দেখিলাম। এখন আমরা বিন্যাস হেতুক অনুমানটির আলোচনা করিতে পারি। এই অনুমানটির মূল বক্তব্য হইল এই যে জগৎ কেবল একটি কার্য নহে ইহা একটি সুবিন্যস্ত কার্য। এই জগতের যে জিনিষটির যেরূপ হওয়া প্রয়োজন সেই জিনিষটি যেন সেইরূপই হইয়াছে। তুমি যে কোন একটি জীবদেহ, তোমার নিজের দেহটি লইয়াই বিচার করিয়া দেখ। অদ্ভুত নহে কি? আহার গ্রহণ না করিলে আমরা কেহই বাঁচিতে পারিব না। আহার গ্রহণ করিতে হইবেই। কিন্তু যে কোন পদার্থ কি আহার রূপে

গ্রহণ করিতে পারি ? অবশ্যই পারি না। মুখরোচক, রুচিকর, তৃপ্তিদায়ক চর্ব, চূষ্য, লেহ্য, পেয় প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া থাকি। এই খাদ্যগুলির আবার পুষ্টিকর হওয়াও চাই। এখন আমরা কেহই পুষ্টিকর ভাবিয়া পথ্যরূপে আহার গ্রহণ করি না, রুচিকর, তৃপ্তিকর বুঝিয়াই করি। কিন্তু রুচিকর খাদ্য যদি পুষ্টিকর না হইত, তাহা হইলে কিরূপ অবস্থা যে হইত, তাহা কল্পনাও করিতে পারা যায় না। এমন একটি জগতের কথা ভাবা যাউক যে জগতে যাহাই রুচিকর তাহাই ক্ষতিকর, এবং যাহাই পুষ্টিকর তাহাই অরুচিকর। এই জগতে যাহা ভাল তাহা ভাল লাগে না, এবং যাহা ভাল লাগে তাহা ভাল নহে। এই জগতে যদি আমরা উপস্থিত হই, তাহা হইলে একদিনও থাকিতে পারিব না। সহজেই বিনষ্ট হইয়া যাইব। পতঙ্গ যেমন অহিতকর কিন্তু মনোরম বহ্নিতে নিজেকে আহুতি দেয়, আমরাও ঠিক সেইরূপ রমণীয় মৃত্যুর ক্রোড়েই নিজেদের সমর্পণ করিব। অতএব, আমরা যে আমাদের দীনহীনা মলিন নয়না ধরণীতে টিকিয়া রহিয়াছি, তাহার একটি প্রধান কারণ হইল এই যে এই জগতে রুচিকর ও পুষ্টিকরের মধ্যে তেমন কোন বিরোধ নাই, অনেক রুচিকর পদার্থই পুষ্টিকর এবং অনেক পুষ্টিকর পদার্থই রুচিকর। কিন্তু এইরূপ হইল কেন ? এমনই হইয়া গিয়াছে, ইহা আমরা বলিতে পারি না। কারণ এমনিই কিছু হয় না। যুগ যুগ ধরিয়া আমরা বাঁচিবার জন্য যে সংগ্রাম করিয়া আসিতেছি তাহারই মধ্য দিয়া আমরা হিতকরকে রুচিকর করিয়া তুলিয়াছি, এইরূপ কথাও যে বলিব, তাহা হইবে না। কারণ, প্রথম হইতেই রুচিকর যদি হিতকর না হইত, তাহা হইলে যুগ যুগ ধরিয়া সংগ্রাম করিবার কোন প্রশ্নই হইত না। অতএব, রুচিকরতার সহিত পুষ্টিকরতার সামানাধিকরণ্য স্বাভাবিক নিয়মের বশে হয় নাই। কিন্তু তাহা হইলে হইল কেমন করিয়া ? অবশ্যই করুণাময় ঈশ্বর যিনি তোমাকে আমাকে এবং জগৎকে নির্মাণ করিয়াছেন, তিনিই এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া। অতএব, এই জগৎ একজন চেতন করুণাময়ের সৃষ্টি ; তাহা যদি না হইত, তাহা হইলে এইরূপ বিন্যস্ত, সজ্জিত হইত না।

ইহাই বিন্যাস হেতুক ঈশ্বরানুমানটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকগণ বলিয়া থাকেন যে কার্যত্ব হেতুক অনুমানটির ন্যূনতাই এই অনুমানটি উপন্যাসের কারণ। কার্যত্ব হেতুক অনুমানটি জগৎ যে অসীম ঈশ্বরের কার্য তাহা প্রমাণ করে বটে, কিন্তু তিনি যে চেতন, তিনি যে করুণাময় তাহা প্রমাণ করে না। প্রকৃত কথা এই যে ঈশ্বর চেতনার প্রথম পর্বে ঈশ্বর যে অসীম শক্তিশালী, তিনি যে জগতের কারণ এইরূপ বোধই হইয়া থাকে। তাহার পর তিনি যে চেতন পরমাত্মা, করুণাময়, জীবের কল্যাণের জন্যই তিনি যে এই জগৎ নির্মাণ করিয়াছেন এইরূপ বোধ

হয়। অতএব, ঈশ্বর চেতনার প্রথম পর্বে কার্যত্বহেতুক অনুমানটির ব্যবহার করা হয়। ঐ অনুমানটি সদ্যোজাত ঈশ্বর চেতনার বাণীরূপ। কিন্তু দ্বিতীয় পর্বে বিন্যাস হেতুক অনুমানটিই প্রদর্শন করা হয়। ইহা কিঞ্চিৎ উন্নত ঈশ্বর চেতনার বাণীরূপ। অন্যরূপে প্রকাশ করিয়া বলা যায় যে, কার্যত্ব হেতুক অনুমানটি অনিত্য জগৎ যে নিত্য কারণ জন্য ইহাই প্রমাণ করে। কিন্তু এই কারণ যে চেতন করুণাময় ঈশ্বর তাহা প্রমাণ করে না। তাই দ্বিতীয় অনুমানটির, বিন্যাস হেতুক অনুমানটির, প্রয়োজন হয়। জগৎকে যখন একটি কার্যরূপেই বুঝা হয় না, বিন্যস্ত, সজ্জিত কার্যরূপে বুঝা হয় তখন তাহার কারণ যে জ্ঞানবান্ অভিপ্রায়ী, উদ্দেশ্য সম্পন্ন, তাহাও বুঝা হয়; এবং যখন আরও বুঝা হয় যে বিন্যাস জীবের কল্যাণের জন্যই, তখন ইহাও বুঝা হয় যে ঈশ্বর করুণাময়।

ন্যায়দর্শনে বিন্যাস হেতুক কোন অনুমান নাই, এবং থাকিবার প্রয়োজনও নাই। কারণ, ন্যায়দর্শনে কার্যত্ব হেতুক অনুমানের সাধ্যই উপাদান অভিজ্ঞ চেতন কর্তা। অবশ্য করুণাময়ত্ব এই হেতুর দ্বারা সাধিত হয় না। কিন্তু বিন্যাস হেতুক অনুমানের দ্বারাই হয় কি? বস্তুতঃ জগতে যে দুঃখ, দৈন্য, জরা, মরণ, অকল্যাণ, অমঙ্গল ইত্যাদি ভূরি ভূরি রহিয়াছে তাহা আর বলিয়া দিতে হয় না। সেইজন্য বিন্যাসকে হেতু করিয়া যখন কিছু সাধন করিতে যাই, তখন অনুমানটি সৎপ্রতিপক্ষ দোষে দুষ্ট হইয়া যায়। ইহা অবশ্য সত্য যে ঈশ্বরকে করুণাময় বলিতে হয়। আমাদের ঈশ্বর চেতনা এইরূপ কথা বলিতে আমাদের বাধ্য করে। কিন্তু ইহা বলিবার জন্য কোনও পৃথক অনুমানের অবতারণা করিবার কোনও প্রয়োজন আছে কি? ঈশ্বর কেন সৃষ্টি করিলেন ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিলেই আমরা ইহা বুঝিতে পারি। তিনি যে ভোগের জন্য এই জগৎ নির্মাণ করিয়াছেন, ইহা বলা যায় না। কারণ তিনি আপ্তকাম। তাঁহার কোন দুঃখ বা ভোগ বাসনা নাই। এইরূপ তিনি যে রতির জন্য ইহা করিয়াছেন, তাহাও বলা যায় না। কারণ রতিতে যাঁহারা আনন্দ পান, বা রতি ভিন্নে যাঁহারা আনন্দ পান না, তাঁহারাই রতি করিয়া থাকেন। কিন্তু ঈশ্বর যে কেন রতি করিবেন তাহা বুঝিতে পারা যায় না। তিনি নিজের বিভূতি খ্যাপন করিবার জন্য যে সৃষ্টি করেন তাহাও বলা যায় না। কারণ, বিভূতি খ্যাপনের দ্বারা তাঁহার কোনও মর্যাদা বাড়িবার কথা ভাবাও যায় না। উপরন্তু, বিভূতি খ্যাপনও বিনা প্রয়োজনে কোথাও হইয়াছে বলিয়া আমরা শুনি নাই। সুতরাং ঈশ্বরের বিভূতি খ্যাপনের কি প্রয়োজন থাকে তাহা বুঝিতে পারা যায় না বলিয়া, এইজন্যও যে তিনি বিশ্ব নির্মাণ করিয়া থাকেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না। অতএব, আমাদের উদ্দ্যোৎকরের মত বলিতে হয় যে সৃষ্টি করা তাঁহার স্বভাব বলিয়াই তিনি সৃষ্টি করেন।

ভূমির স্বভাব যেমন ধারণ করা, দার্শনিকের স্বভাব যেমন তর্ক বিতর্ক করা, তোমার আমার স্বভাব যেমন কুঁড়েমি করা, ঈশ্বরের স্বভাবও তেমনই সৃষ্টি করা। ইহাই উদ্দ্যোৎকরের অভিপ্রায়। কিন্তু আমাদের আরও বলিতে হয় যে অশুভ কর্মের অবশ্যম্ভাবী ফল দুঃখ ভোগ; দুঃখ ভোগ হইলেই তাহা নাশ পায়। তাই ঈশ্বর পর দুঃখ বিনাশ করিবার জন্যই সৃষ্টি করিয়া থাকেন। অতএব, ঈশ্বর যে করুণাময়, তাহা এই ভাবেই বুঝা যাইতে পারে। ইহার জন্য বিন্যাস হেতুক কোনও অনুমান উপস্থিত করিবার তেমন কোনও প্রয়োজন নাই।

এইবার আমরা পাশ্চাত্ত্য দর্শনের প্রত্যয় হেতুক অনুমানটির কথা আলোচনা করিতে পারি। এই অনুমানটির মত কোনও অনুমান ন্যায় দর্শনে নাই। শুধু তাহাই নহে। ভারতীয় দর্শনেই এইরূপ কোনও অনুমান দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার প্রধান কারণ বোধ হয় পাশ্চাত্ত্য দর্শনে যাহাকে Rationalism বা বিশুদ্ধ বুদ্ধি-বাদ বলে, সেইরূপ কোন মত ভারতীয় দর্শনে নাই। এই মত অনুযায়ী বিশুদ্ধ বুদ্ধি, reason, ইন্দ্রিয় সংবেদনের sensation-এর কোন অপেক্ষা না করিয়াই সদ্‌বস্তুর স্বরূপ গ্রহণ করিতে পারে। প্লেটো, এরিষ্টটল, হেগেল প্রভৃতি দার্শনিকগণ এই মতের সমর্থক। ভারতীয় দর্শনে এইরূপ কোনও মতের সাক্ষাৎ মিলে না। তাহার ঐতিহাসিক কারণ রহিয়াছে। ভারতে গণিত শাস্ত্রের বিশেষ বিকাশ হইলেও, ভারতীয় দার্শনিকগণ এই শাস্ত্রের দার্শনিক তাৎপর্য লইয়া তেমন কোন বিচার করেন নাই। অন্ততঃ পক্ষে পাশ্চাত্ত্য দর্শনে গাণিতিক জ্ঞানের তাৎপর্য নির্ণয়ের জন্য যেরূপ বিচার দেখা যায় ভারতীয় দর্শনে সেইরূপ কোন বিচার দেখা যায় না। উপরন্তু পাশ্চাত্ত্যদেশে যাহাকে Logic বলে, সেইরূপ কোনও শাস্ত্র আমাদের এদেশে হয় নাই। আমাদের ন্যায়শাস্ত্র Formal Logic নহে। বিশুদ্ধ বুদ্ধিবাদের মূলে রহিয়াছে গণিত এবং Formal Logic। এই দুইটি শাস্ত্র, পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকগণের মতে সকল বিজ্ঞানেরই মূলে। ইহাদের বাক্যগুলি অনিবার্য সত্যতার অধিকারী। গণিতের কোনও বাক্যের বিরোধী বাক্যের কল্পনা করাও যায় না। Logic-এর ক্ষেত্রেও এই কথা খাটে। সংবেদনের উপর নির্ভর করিয়া আমরা যে সকল বাক্য রচনা করি, তাহারা কেহই এইরূপ নহে। আমি যখন বলি যে গোলাপটি লাল, তখন একটি সত্য বাক্য হয়ত বলিতে পারি। কিন্তু দুই ও দুই যোগ করিলে চার হয়, ত্রিভুজের তিন কোণ দুই সমকোণের সমান, ইত্যাদি বাক্য যেরূপ সত্য ইহা সেইরূপ সত্য নহে। গণিতের বাক্যগুলি অনিবার্য সত্য। শুধু তাহাই নহে বাস্তব জগতে ইহাদের প্রয়োগও হয়। এই দুইটি ধর্ম থাকার জন্য, গণিতের বাক্য লইয়া পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকগণ অনেক কথা বলিয়া থাকেন। অর্থাৎ এই বাক্যগুলি

যদি কেবল অনিবার্য সত্যতার অধিকারীই হইত, তাহা হইলে তেমন কোন সমস্যা ছিল না। আবার ইহারা যদি কেবল বাস্তব জগতে প্রযোজ্য হইত তাহা হইলেও তেমন কোন সমস্যা ছিল না। কিন্তু ইহাদের এই দুইটি ধর্মই আছে। তাই বিশুদ্ধ বুদ্ধিবাদীগণ বলিয়া থাকেন যে আমাদের বিশুদ্ধ বুদ্ধি স্বতন্ত্রভাবে সদ্‌বস্তুর স্বরূপ বুদ্ধিস্থ করিতে পারে। এবং বিশুদ্ধ বুদ্ধিস্থ প্রত্যয় মাত্রই সত্য, তাহার বিষয় বাস্তব। ঈশ্বরের প্রত্যয় এইরূপ একটি প্রত্যয়, অতএব, ঈশ্বর আছেন।

ইহাই প্রত্যয় হেতুক অনুমানটির মূল কথা। এইরূপ কোনও অনুমান ন্যায় দর্শনে যে নাই তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। তবে ন্যায়াচার্যগণ যে বলেন যে ঈশ্বর নাই, এই কথার কোন প্রমাণ নাই, ইহার সহিত এই অনুমানের অভিপ্রায়ের কিছুটা সাদৃশ্য খুঁজিয়া পাওয়া যায়। ঈশ্বরের প্রত্যয়টি একটি বিশুদ্ধ বুদ্ধিস্থ প্রত্যয়, অতএব ঈশ্বর নাই, ইহা আমরা বলিতে পারি না – ইহাই যে পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকগণের বক্তব্য তাহা আমরা বলিতে পারি। এইরূপ ঈশ্বর শব্দটি শশকবিষাণের মত কোনও শব্দ নহে, অতএব ঈশ্বর নাই, ইহা বলিতে পারি না,—ইহাই যে ন্যায়াচার্যগণের বক্তব্য তাহাও আমরা বলিতে পারি। উপরন্তু পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকগণ বলিয়া থাকেন যে এই অনুমানের গূঢ় অর্থ এই যে আমার ব্যক্তি বুদ্ধি, আর সমষ্টি বুদ্ধির মধ্যে ঐক্য রহিয়াছে, ঈশ্বরই আমার হৃদয়স্থিত হৃষীকেশ। এইরূপ কথা ভারতীয় দর্শনেও আছে। সোঽহং, তত্ত্বমসি প্রভৃতি কথা ভারতীয় দর্শনে স্বীকৃত। তবে এই সকল মন্ত্রের তাৎপর্য বিভিন্ন দর্শনে বিভিন্ন ভাবে নির্ণয় করা হয়। ন্যায়াচার্যগণও ইহাদের স্বীকার করেন; তাঁহারা বলেন যে আত্মা এবং ঈশ্বর এক জাতীয় পদার্থ, এবং আমাদের সকল কর্মেরই কারয়িতা ঈশ্বর। এইরূপ কথা ঈশ্বর চেতনার মূলে রহিয়াছে এবং প্রত্যয় হেতুক অনুমানটি যদি এই চেতনারই বাণীরূপমাত্র হয়, তাহা হইলে ভারতীয় দর্শনে ইহা একান্ত দুর্লভ নহে, যদিও যে ভাবে বিশুদ্ধ বুদ্ধিবাদের মধ্য দিয়া ইহাকে উপস্থিত করা হয়, সেইভাবে ভারতীয় দর্শনে ইহা নাই।

এইবার আমরা প্রবৃত্তি হেতুক অনুমানটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে পারি। সাধু ব্যক্তি সুখী হইবে এবং অসাধু ব্যক্তি দুঃখ ভোগ করিবে এই রকম কথায় আমরা অনেকেই বিশ্বাস করিয়া থাকি। বস্তুতঃ এইরূপ বিশ্বাস আমাদের নৈতিক আচরণ নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। পাপীর শাস্তি হয় না, পুণ্যের পুরস্কার নাই, যতদিন আছি ঋণ করিয়া ঘৃত পান করিয়া লই, এইরূপ কথায় যদি আমরা বিশ্বাস করি, তাহা হইলে আমাদের নৈতিক জীবন ধ্বংস হইয়া যায়। অতএব, আমরা বলিতে পারি যে সুখ-দুঃখ, এবং ধর্মাধর্মের সামানাধিকরণ্যের স্বীকৃতি পূর্বক নৈতিক জীবন গড়িয়া উঠে। কেবল তাহাই নহে, কোনও ব্যক্তিকে যখন আমরা সাধু চরিত্রের

বলি, কোন কার্যকে যখন আমরা পুণ্য কার্য বলি, তখন কি আমরা আমাদের জ্ঞানের বিষয়ের কোনও বাস্তব ধর্মকেই স্বীকৃতি দিই না? কথাটিকে একটু খুলিয়া বিচার করিবার চেষ্টা করা যাউক। আমরা দেখিতেছি যে আমার সম্মুখে একটি ঘট রহিয়াছে, এবং ধরিয়া লওয়া হউক যে আমার এই জ্ঞানটি সত্য। এখন প্রশ্ন এই যে, এই জ্ঞানটি কি এইজন্য সত্য নহে. যে আমি যাহাকে ঘট বলিয়া বুঝিতেছি, তাহাকে ঘট বলিয়াই বুঝিতে হইবে, অন্যরূপে বুঝা চলিবে না। এই প্রশ্নের উত্তরে অবশ্যই হাঁ বলিতে হইবে। এই জ্ঞানের বিষয় যেন দুর্দম, নিশ্চিত, নিষ্ঠুর। ফল যেমন জীর্ণ পুষ্পদলকে ধ্বংস করিয়া ভ্রংশ করিয়া পরিপূর্ণ আকারে নিজেকে প্রকাশ করে, ইহাও ঠিক তেমনই বিজয়ী রাজসম নিজেকে সবলে প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহাকে স্বীকৃতি না দিয়া উপায় নাই। কিন্তু কোনও কিছুকে পাপ বা পুণ্য ইত্যাদি আখ্যায় যখন ভূষিত করা হয়, তখনও কি এইরূপ কথা বলা যায়? প্রথমে এই প্রশ্নের উত্তরে হাঁ বলিতে মন যায় না। কারণ একজন যাহাকে পাপ বলিয়া মনে করেন, অন্যজন ঠিক তাহাকেই পুণ্য বলিয়া মনে কবিতে পারেন, এক দেশে যাহাকে আদর্শ কার্য বলিয়া মনে করা হয়, অন্য দেশে তাহাকেই ঘৃণ্য কার্য বলা হয়, এক যুগে যাহা পুণ্য অন্য যুগে তাহাই পাপ। ব্যক্তিভেদে, দেশভেদে, কালভেদে পাপ বা পুণ্য সম্পর্কে ধারণা পরিবর্তিত হয়। অতএব, পাপ এবং পুণ্যকে বিষয়ের বাস্তব ধর্ম বলিব কেমন করিয়া? প্রথমেই এই প্রশ্নের উত্তরে হাঁ বলিতে মন যায় না। কিন্তু কিছু বিবেচনা করিলে হাঁ-ই বলিতে হয়। ভাল এবং মন্দ, পাপ এবং পুণ্য যদি বিষয়গত না হয়, তাহা হইলে কোন কিছুকে ভাল মন্দ বলার কোনও অর্থ থাকে না। ইহার অনিবার্য পরিণতি দুঃখবাদ। জীবনের যে কোন মূল্য আছে, ইহা যে পবিত্র এই কথা অস্বীকার করা। কিন্তু এই অস্বীকৃতি অসম্ভব। তাই ভাল মন্দ প্রভৃতিকে আমরা বিষয়গত বলিতে বাধ্য। আরও দেখ, ঘটকে যখন আমরা ঘট বলিয়া দেখি তখন যেমন এইরূপ দেখিতে, ঘটকে স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হই, সেইরূপ পাপ পুণ্য প্রভৃতির ক্ষেত্রেও আমরা এইরূপ স্বীকৃতি দিতে বাধ্য। শিক্ষার দোষে প্রবৃত্তির পীড়নে বা অন্য কোনরূপ দোষের জন্য, আমাদের নীতি নয়ন হয়ত রজ্জুতে সর্প দেখিতে পারে, যাহা পাপ তাহাকেই পুণ্য বলিয়া বুঝিতে পারে। কিন্তু ইহাতে কিছু আসিয়া যায় না। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, দেশে দেশে, যুগে যুগে যে পাপপুণ্যের ধারণা বিষয়ে বৈষম্য দেখা যায় তাহার একমাত্র অর্থ হইল এই যে নীতিবোধ আমাদের সর্বত্র সমানভাবে পুষ্ট হয় নাই। পাপাদি যে বিষয়গত নহে, এমন কথা ইহা প্রমাণ করে না। বস্তুতঃ পাপাদি যদি বিষয়গত না হইত, যিনি অভিমত প্রকাশ করিতেছেন তাঁহার রুচি মর্জি প্রভৃতির উপরই যদি একান্তভাবে

নির্ভর করিত, তাহা হইলে, আর যুক্তি করিয়া বিচার করিয়া, কি ভাল এবং কি মন্দ তাহা বুঝা চলিত না। অতএব, আমাদের পাপ পুণ্য প্রভৃতিকে বিষয়গত বলিতে হয়। তাহার পর আরও বলিতে হয় যে বিশ্ব আমাদের নৈতিক জীবনের প্রতি উদাসীন নহে। আমাদের নৈতিক জীবন বিশ্বেরই অঙ্গ। আমাদের নীতি-বোধের মধ্য দিয়া বিশ্ব যেন কথা কহিয়া উঠে, স্থূল দৃষ্টির নিকট যাহা অগোচর তাহা সংগোপনে বলিয়া যায়। আমরা বুঝিতে পারি যে পাপী শাস্তিলাভ করে, এবং পুণ্যাত্মা সুখী হয়। ঈশ্ববের বিচার কখনও ভুল হয় না। অশুভ কর্ম করিলে দুঃখ ফল, এবং শুভকর্ম করিলে তিনি সুখ ফল দান করেন। তাই আমাদের মধ্যে শুভকার্য করিবার প্রবৃত্তি জাগে। আমরা শুভকর্ম করিতে এবং অশুভ কর্ম পরিহার করিতে যত্ন করি। সংক্ষেপে, শুভকর্মে প্রবৃত্তি এই কর্ম যে পরিণামে সুখের জনক এই বোধ সাপেক্ষ, এবং এই বোধের বিশ্লেষণ বরিলে বুঝিতে পারা যায় যে ঈশ্বর আছেন। তিনিই পাপীকে শাস্তি এবং পুণ্যাত্মাকে পুরস্কার দিয়া থাকেন। ইহাই পাশ্চাত্ত্যদর্শনে প্রবৃত্তি হেতুক অনুমান। ন্যায় দর্শনে ঈশ্বর, কর্মের অধিষ্ঠাতা বলিয়া কর্ম ফল প্রসব করিতে পারে বলিয়া যাহা বলা হয়, তাহাব সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে। তবে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ জন্মান্তরবাদ স্বীকার কবেন না। সুতরাং তাঁহাদের কথা ঠিক ভারতীয় দার্শনিকগণের মত নহে, যদিও জন্মান্তরবাদ না মানিলে যে কি করিয়া দুঃখ-সুখের বিচিত্র ব্যবস্থার, এবং পাপপুণ্য ও দুঃখ-সুখের সমীকরণের উপপত্তি করা যায় তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

পাশ্চাত্ত্য দর্শনের চারিটি অনুমানের কথা বলিলাম। আরও একটি অনুমান দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার নাম E. Consentu Genitum. ইহার মর্ম কথা হইল এই যে সকলেই বলিয়া থাকেন ঈশ্বর আছেন অতএব, ঈশ্বর আছেন। এই ভাবে যখন এই অনুমানটিকে সাজান হয়, তখন ইহাকে নির্দোষ বলিতে পারা যায় না। এক সময় সকলেই বলিত যে পৃথিবী স্থির আছে এবং সূর্য ঘুরিতেছে। কিন্তু সেইজন্য আমরা বলিতে পারি না যে পৃথিবী স্থির থাকে এবং সূর্য তাহাকে প্রদক্ষিণ করে। এইরূপ এমনও হইতে পারে যে আজিকার দিন পর্যন্ত অনেকেই ভাবিতেছেন যে ঈশ্বর আছেন। কিন্তু কালি হয়ত এমন হইতে পারে যে অনেকেই বলিবেন যে ঈশ্বর নাই। অতএব, বহুলোকে বলিয়া থাকেন ঈশ্বর আছেন, সুতরাং ঈশ্বর আছেন, এই অনুমানটি কোন কাজের নহে। তথাপি অনেক আধুনিক লেখক এই অনুমানটি যে বিশেষ মূল্যবান, এইরূপ কথা বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এমনও বলেন যে, আগের চারিটি অনুমান অপেক্ষা, ইহা উৎকৃষ্ট। এই নবীন লেখকদের কথা কিছু বলিতে হয়। তাঁহারা বলেন যে যে ভাবে আমরা উপরে এই অনুমানটিকে

সাজাইয়াছি, তাহাতে ইহার গূঢ়ার্থ প্রকাশিত হয় নাই। অনেকে বলে ঈশ্বর আছেন অতএব, ঈশ্বর আছেন, ইহা কোন যুক্তিই নহে। ইহা অবশ্য সত্য যে দুই চারিজনে যাহা বলে, এবং অনেকে যাহা অস্বীকার করে, তাহা সত্য হওয়ার সম্ভাবনা যত বেশী, তাহাপেক্ষা অনেকে যাহা বলে এবং দুই চারিজনে যাহা অস্বীকার করে, তাহা সত্য হওয়ার সম্ভাবনা আরও অনেক বেশী। কিন্তু তথাপি ইহার দ্বারা কিছুই প্রমাণিত হয় না। কারণ, এমনও দেখা গিয়াছে যে দুই চারিজনে যাহা স্বীকার করিয়াছেন, এবং প্রায় সকলেই যাহা অস্বীকার করিয়াছেন, তাহাই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। অতএব, কোন বাক্য সত্য কিনা তাহা অনেকেই ইহা স্বীকার করেন কিনা তাহা দেখিয়া নির্ণয় করা যায় না। সুতরাং আলোচ্য অনুমানটিকে যে ভাবে প্রকাশ করা হয়, বাণীবদ্ধ করা হয়, তাহা হইতে কিছুই লাভ করা যায় না। বস্তুতঃ ইহাতে তাহার অভিপ্রায়ই প্রকাশ পায় না। ইহার প্রকৃত অভিপ্রায় নিম্নরূপ। প্রত্যক্ষই সর্বাপেক্ষা বলবান প্রমাণ। অনুভবকে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। ঈশ্বরানুভূতি অনেকের আছে। অনেকেই আমরা যেমন ঘট দেখি, পট দেখি, সেইরূপ ঈশ্বর প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের এই দেখাকে খেয়াল দেখা বলে না। তুমি, আমি দেখিতে পাই না, কারণ আমাদের দৃষ্টিশক্তি নাই। ঈশ্বর যে নাই তাহা নহে। ঈশ্বর অপরোক্ষ অনুভব গম্য। তাঁহাকে অনেকে অনুভব করিয়াছেন। এই সকল মহাপুরুষগণকে আমরা উন্মাদ, বর্বর, বঞ্চক ইত্যাদি বলিয়া মনে করিতে পারি না। ইহা অবশ্য সত্য যে অনেক বিরিঞ্চি বাবা আমাদের মধ্যে আছে, এবং পারলৌকিক পন্থায় ইহলৌকিক অর্থ অর্জন করিতেছেন। কিন্তু সেইজন্য শ্রীরামকৃষ্ণ যে নাই তাহা নহে। ঘট, পটানুভবের মত ঈশ্বরানুভবও অনুভব। তাহাকে পরিত্যাগ করা যায় না। আপ্তে বিশ্বাস করিতে হয়। সেইজন্য অনেকে অর্থাৎ আপ্তগণ, এবং তাঁহাদের কথায় বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ, ঈশ্বর আছেন বলিয়া থাকেন বলিয়া ঈশ্বর আছেন।

ইহাই এই পঞ্চমানুমানটির মর্মার্থ। ন্যায় দর্শনে যে শ্রুতি প্রমাণের কথা বলা হয় তাহার সহিত ইহার বিশেষ সাদৃশ্য আছে। এবং আমাদের মনে হয় যে ঈশ্বরানুকূল প্রমাণসমূহের মধ্যে এই প্রমাণটিই সর্বাপেক্ষা বলবান্ প্রমাণ।

পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ঈশ্বরানুমান লইয়া কিছু আলোচনা করা হইল। এইবার আমরা ঈশ্বর সম্পর্কে ন্যায়দর্শনের আরও দুই একটি কথা বলিয়া এই খণ্ডের উপসংহার করিতে পারি। ন্যায়মতে ঈশ্বর আত্মান্তর। পতঞ্জলি যেমন পুরুষ বিশেষকেই ঈশ্বর বলিয়াছেন, ন্যায় দর্শনেও ঠিক তেমনই আত্মাবিশেষকেই পুরুষ বলা হয়। ঈশ্বরকে আত্মাবিশেষ বলার অভিপ্রায় বোধ হয় এই যে তাঁহাকে আত্মার বিজাতীয় পদার্থ বলা যায় না। বোধ হয় বলিতেছি এই জন্য, যে আত্মত্ব বলিয়া

কোন জাতি স্বীকার্য কিনা, ইহা লইয়া ন্যায়াচার্যগণের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। এই জাতি যে ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি জাতির ন্যায় প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু জাতি সাধনে প্রত্যক্ষ প্রমাণই একমাত্র প্রমাণ নহে। কোনও বাধক না থাকিলে অনুমানের সাহায্যেও আমরা জাতির সাধন করিতে পারি। দ্রব্যত্বাদি জাতি অনুমানের দ্বারাই স্থাপন করা হয়। আত্মত্ব জাতিও অনুমানের সাহায্যে স্থাপন করা যাইতে পারে। মুক্তাবলী প্রভৃতি গ্রন্থে এই অনুমান প্রদর্শন করা হয়। কিন্তু গদাধর ভট্টাচার্যের মত মহানৈয়ায়িক বলিয়া থাকেন যে আত্মত্ব জাতির পক্ষে প্রমাণ দুর্লভ। এই বিষয়ে আমরা কিছু আলোচনা তৃতীয় খণ্ডে করিব। এখানে কেবল ইহাই বলিতে চাহি যে ঈশ্বরকে আত্মাজাতীয় বলিতে সকল ন্যায়াচার্যই যে তাঁহাকে আত্মত্ব জাতির আশ্রয় বলিয়া বুঝেন তাহা ঠিক নহে। কিন্তু তাহা হইলে তাঁহাকে আত্মাজাতীয় বলার অর্থ কি? বলিতেছি। একমাত্র আত্মাই চেতন পদার্থ। ইহাই বুদ্ধি বা জ্ঞানের আশ্রয়। ঘট, পট প্রভৃতি পদার্থ চেতন নহে। তাহারা কেহই জ্ঞানের আশ্রয় নহে। সুতরাং যাহাই জ্ঞানের আশ্রয়, যাহাই চেতন তাহাকেই আমরা আত্মার সজাতীয় বলিতে পারি। ঈশ্বর যে জ্ঞানের আশ্রয় তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। যে কার্যত্বাদি হেতুর সাহায্যে ঈশ্বর সাধন করা হয়, তাহারাই ইহা সাধন করিয়া থাকে। অতএব ঈশ্বরকে জ্ঞানাশ্রয়, চেতন, সুতরাং আত্মজাতীয় বলা যায়। তোমার আমার আত্মা জীবাত্মা,

এই প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনার জন্য তর্কবাগীশ মহাশয়ের ন্যায়দর্শন চতুর্থ খণ্ড পৃ. ৬৩-৭১ দ্রষ্টব্য। অসামান্য পাণ্ডিত্য এবং নৈপুণ্যের সহিত, ঈশ্বর সগুণ, কি নির্গুণ তাঁহার কি কি গুণ আছে ন্যায় বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বিষয়ে কিরূপ মতভেদ দেখা যায় ইত্যাদি আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং আমি আর এই বিষয়ে কিছু লিখিলাম না। বস্তুতঃ আমি ঈশ্বর সগুণ কি নির্গুণ ইত্যাদি বিচারে বিশেষ রস পাই না। বাদী প্রতিবাদীর বিচারে মধ্যস্থ হইবার যোগ্যতাও আমার নাই। আমার কথা হইল এই যে নির্গুণ ব্রহ্মবাদীরা অন্ততঃ আমার মত প্রাণীর জন্য সগুণ ঈশ্বর অস্বীকার করেন না। ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আমি নারদের মত বলিতে চাহি অরূপা বহুরূপা ত্বং সুরূপা, কামরূপিণী। অথবা গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণী নমোঽস্তুতে। সত্য কথা বলিতে কি উদরের তাড়নায় প্রতিদিন তাহাদের সহিতই ঈশ্বরালোচনা করি, যাহারা তাঁহাকে পরীক্ষার জন্য পাঠ্য একটি পদার্থমাত্র বলিয়া মনে করে। সুতরাং আমার পক্ষে এই বিষয়ে কিছু বলা অসম্ভব। সান্ত্বনা এই যে কয়জনই বা কিছু বলিতে পারেন। বয়মুচ্চৈর্জড়ধিয়ো, ন ধাতা নাপীশোহরিরপি নতেবেত্তি পরমং তথাপি ত্বদ্ভক্তির্মুখরয়তি। প্রার্থনা এই যে স্তুতিঃ কাতে মাতস্তব করুণয়া মামগতিকং প্রসন্না ত্বং ভূয়া ভবমনু ন ভূয়ান্ মমজনুঃ।

তন্নাথ ত্বরিতং বিধেহি করুণাং যেন ত্বদেকাগ্রতাং
যাতে চেতসি নাপ্নুয়ামঃ শতশো যাম্যাঃ পুর্যাতনাঃ।

ঈশ্বর পরমাত্মা। তুমি আমি বিনাশী জ্ঞানের আশ্রয়, ঈশ্বর নিত্য জ্ঞানের আশ্রয়। ঈশ্বর অন্তকল্প নহেন, আত্মকল্পই।

ঈশ্বরকে জ্ঞান নামক গুণের আশ্রয় বলা হইল। কিন্তু তিনি কি নির্গুণ নহেন? অনেক শাস্ত্রে তাহাকে নির্গুণ বলিয়াই অভিহিত করা হয় বটে, কিন্তু ন্যায়াচার্য-গণের মতে তিনি সগুণ। তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে বুদ্ধি প্রভৃতি গুণের দ্বারা যে ঈশ্বর বিশেষিত নহেন, তিনি প্রমাণাতীত। প্রত্যক্ষ তাঁহার হইতে পারে না। কারণ যাহা নির্বিশেষ তাহার প্রত্যক্ষ হইবে কেমন করিয়া। অনুমানের দ্বারা তাঁহাকে সাধন করা যাইবে না। কারণ কার্যত্বাদি হেতুর দ্বারা বুদ্ধি প্রভৃতি বিশিষ্ট ঈশ্বরকেই সাধন করা হইয়া থাকে। আগমেও এইরূপ ঈশ্বরের কথা বলে না। শ্রুতি প্রভৃতিতে যে ব্রহ্মকে নির্গুণ বলা হয় তাহার প্রকৃত তাৎপর্য এই যে মুমুক্ষু তাঁহাকে নির্গুণ বলিয়াই ধ্যান করিবেন, তাঁহার ঐশ্বর্য, কামদাতৃত্ব প্রভৃতির কথা চিন্তা করিলে বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে, তাঁহার মনে নানা কামনার উদয় হইতে পারে। তিনি নির্গুণ নহেন, তাঁহার বুদ্ধি প্রভৃতি অনেক গুণ আছে।

ন্যায় দর্শনে সংসার মহীরুহের বীজ প্রসঙ্গে কি বলা হয় তাহা আমরা দেখি-লাম। যেরূপ অনুভবকে অবলম্বন করিয়া লোকযাত্রা, লোকব্যবহার প্রভৃতি নির্বাহ করা হয়, ন্যায় দর্শনে সেই অনুভবকেই অবলম্বন করা হয়। ইংরাজীতে এইরূপ দর্শনকে commonsense realism বলা হয়। ইহার স্বরূপ বিশ্লেষণ করিবার সময় এখনও আসে নাই। তৃতীয় খণ্ডের শেষ অধ্যায়ে উপসংহার প্রসঙ্গে ইহা করিবার আশা রাখি।

—